তফসীরে নূরুল কোরআন

সপ্তম পারা

৭

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

সপ্তম খণ্ড

তফসীরে নূরুল কোরআন

সপ্তম পারা

৭

সপ্তম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

তৃতীয় প্রকাশ ঃ জিলক্বদ ১৪৩১ হিঃ
কার্তিক ১৪১৭ বাং
নভেম্বর ২০১০ইং

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৩-০১৪৮৮৯

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V) 7, Published by Al-Balag Publications.12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A, Dhaka-1207

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি নিতান্ত দয়া করে তফসীরে নূরুল কোরআনের সপ্তম খন্ড রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত তথা তাঁর বিশেষ দানে ধন্য হওয়া ব্যতীত এ মহান কাজ কোন অবস্থাতেই সম্ভব হতোনা। তাই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আদায় করি সেজদায়ে শোকরানা এবং অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত অহরহ লাভ করছি এবং তফসীরে নূরুল কোরআনের সপ্তম খন্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের মহান বাণী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন বিশ্ব গ্রন্থ। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। এ পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের পদচারণা হবে, সকলের কল্যাণের কথাই রয়েছে পবিত্র কোরআনে। কেননা, আল্লাহ পাক বিশ্ব প্রতিপালক। আর তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী। ভাগ্যবান তারা, যারা পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেদেরকে আলোকিত করেন। আর ভাগ্যাহত তারা যারা পবিত্র কোরআনের আলো থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। এ যুগের মানুষ বিশেষতঃ বাংলা ভাষী মানুষের নিকট পবিত্র কোরআনের আলো পৌঁছানোর কর্মসূচী হিসেবে তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা শুরু হয় প্রায় দু' যুগ পূর্বে। ১৯৮৪ সাল থেকে এর প্রকাশনা আরম্ভ হয়েছিল।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের কত বড় দয়া এবং মেহেরবানী যে, তিনি বর্তমানে এই মহান গ্রন্থের সপ্তম খন্ড রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দিয়েছেন।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

এ হলো আল্লাহ পাকের দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর দানে ধন্য করেন।

পবিত্র কোরআনের তফসীর যুগে যুগে

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে যুগে যুগে। তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে আজীবন অক্লান্ত সাধনা করেছেন এবং মহান অবদান রেখেছেন। এ পর্যায়ে বিভিন্ন যুগে যে সাধনা করা হয়েছে এবং যে সব মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় থেকে পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুমহান কাজ শুরু হয়েছে। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন আয়াতের তফসীর করেছেন। আর তাঁর প্রতিটি কথা এবং কাজই হতো পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা। তিনি ছিলেন জীবন্ত কোরআন। এজন্যেই একজন সাহাবী যখন উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে বলুন। তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

তাঁর মহান জীবন-চরিত ছিলো পবিত্র কোরআন। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে যা রয়েছে তারই সঠিক বাস্তবায়ন হয়েছে তাঁর জীবন সাধনায়, স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۝

(সূরা আল-এমরান)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুসলমানদের বিরাট উপকার সাধন করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্য হতেই তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং তাদের সংশোধন করেন আর তাদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করেন অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট মূর্খতা এবং পথভ্রষ্ঠতায় পড়েছিল"।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু যে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন তাই নয়, বরং মানুষকে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তাদেরকে পবিত্র কোরআনের আলোকে গড়ে তুলেছেন এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার আলোকে মানুষকে আত্ম সংশোধনে সাহায্য করেছেন। এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়ামত কবে আসবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।

উক্ত সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমানত কিভাবে বিনষ্ট করা হবে? তিনি এরশাদ করলেন, যখন অযোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পিত হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের মর্মবাণী।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

(সূরা নেসা)

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক আদেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমানতের হক্বদারকে আমানত পৌঁছে দাও।) এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন আর কোন সময় তিনি নিজের আমলের মাধ্যমেও পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগ

সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কেননা, যারা নিজের অভিমত অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের তফসীর করে তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছেন। যাহোক, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা পবিত্র কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে খ্যাতি অর্জন করেছেন তারা হলেন খোলাফায়ে রাশেদ্বীন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ), হযরত এবনে সাবেত (রাঃ), হযরত এবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ عِلْمَ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! তাকে কোরআনের এলম দান করো। বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত উবাই এবনে কাব (রাঃ) রচিত দু' খানি তফসীরই সে যুগে লিপিবদ্ধ হয়। এই তফসীর সমূহে বিশেষতঃ কোন শব্দ বা বাক্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। অথবা কোন আয়াত সম্পর্কে যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু বলে থাকেন, তার উল্লেখ রয়েছে। এ পর্যায়ে দু' একটি দৃষ্টান্ত দেয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমনঃ সূরা বাকারায় হারাম খাদ্যের উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

مَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

এর তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ

مَاذُبِحَ لِلطَّوَاغِيْتِ

অর্থাৎ যা শয়তানের নামে জবেহ করা হয়েছে। এমনিভাবে ওসিয়তের আয়াতের (اِنْ تَرَكَ خَيْرًا) তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে মৃত ব্যক্তি অনেক ধন-সম্পদ রেখে যায়।

তাবেঈনের যুগ

এ যুগের তফসীরকারগণ সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করেছেন। সে যুগে যে সব ফেতনা দেখা দিয়েছিল সেগুলোর মোকাবেলাও তাঁরা করেছেন। যেমন খারেজী এবং কাদরিয়া ফেতনার উদ্ভব তখনই হয়েছিল। তবে তাঁরা বাতিল-পন্থীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে তাদেরকে সরল সঠিক পথে নিয়ে আসার অধিকতর চেষ্টা করতেন, যেমন সে যুগের বিখ্যাত আলেম আল্লামা এবনে সিরীনের সঙ্গে যবর এবং কদর সম্পর্কে কিছু লোক বিতর্কে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করে। তখন তিনি তাদেরকে

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ........

এ আয়াত খানি শুনিয়ে দিলেন। এর তাৎপর্য হলো, তোমরা যে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও তাতে সময় নষ্ট করা ছাড়া কোন লাভ হবে না। তাই তোমরা নেক আমল করতে সচেষ্ট হও। যার নির্দেশ এ আয়াতে রয়েছে। তাবেঈনদের যুগের বিখ্যাত তফসীরকারগণ হলেন আলকামা, আমর এবনে শারযীল, সাঈদ এবনে যোবায়ের, ইব্রাহীম নখয়ী, শা'বী, মুজাহেদ, একরামা, হাসান বসরী, কাতাদা প্রমুখ তাবেঈগণ। তাঁদের মধ্যে যারা তফসীর সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা হলেন হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের, আবুল আলীয়া, মোহাম্মদ এবনে কা'ব কুরতবী, আতা এবনে আবি রুবাহ, হাসান বসরী, একরামা (রঃ) প্রমুখ।

তাবে তাবেঈনের যুগ

এ যুগে হাদীস, তফসীর, ফেকাহ প্রভৃতি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেয়া হতো। এদিকে ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীর এক বিশাল এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে ইসলামের দুশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। সে যুগের ওলামায়ে কেরাম যথাযথভাবে তার মোকাবেলা করেন। তাঁরা পবিত্র কোরআনের এমন তফসীর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন যাতে যুগ-বিজ্ঞাসার জবাব থাকত, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের যে ব্যাখ্যা স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন অথবা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন যা বলেছেন তা তাঁরা সংকলন করেছেন। যাঁরা এ মহান কাজ সুসম্পন্ন করেছেন তাঁরা হলেন আবু আমর এবনুল আলা (রহঃ), শোবা এবনুল হাজ্জাজ (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইউনুস এবনে হাবীব (রহঃ) এবং ওকী এবনুল যাররা (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ। তাঁরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ যুগ শেষ হওয়ার পূর্বে মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শনের আমদানী শুরু হয়।

এতদ্ব্যতীত, ইরান এবং রুম বিজয়ের পর মুসলিম জাহানে ইরানী এবং রুমী চিন্তা ধারার অনুপবেশ শুরু হয়। পরিণামে বাতিল আকীদা ও বিশ্বাস ইসলামী আকীদা

ও বিশ্বাসের উপর আঘাত হানা অস্বাভাবিক ছিল না। তাই সে যুগের তফসীরকারগণকে নূতন নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং ইহুদী, খৃষ্টান ও গ্রীক দর্শনের সকল হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হয়েছে। এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন অবকাশ এখানে নেই। তাই তখন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে সব তফসীর গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিত এখানে পেশ করা সমীচিন মনে করি।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী

১. আল্লামা আবু ওবায়েদ কাসেম এবনে সালাম (রঃ) (মৃত্যু- ২২৩হিঃ)। তাঁর রচিত তফসীর গ্রন্থ মাআনিল কোরআন ও গরীবুল কোরআন সে যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য তফসীর গ্রন্থ।

২. বাকী এবনে মোখাল্লাদ কুরতবী (রঃ) (মৃত্যু-২৭৬হিঃ)। আল্লামা এবনে হজম (রঃ) তাঁর রচিত তফসীর গ্রন্থকে অতুলনীয় বলেছেন।

৩. আবু মোহাম্মদ সাহাল এবনে আবদুল্লাহ্ আত্তসতরী (রঃ) (মৃত্যু-২৮৩ হিজরী)। তাঁর রচিত তফসীর গ্রন্থ সুফীবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ঃ

১. এবনে জরীর তাবারী (রঃ) (মৃত্যু-৩১০ হিঃ)। তাঁর তফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২. আবুল হাসান আশআরী (রঃ) (মৃত্যু-৩২৪ হিঃ)। তাঁর গ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

৩. আবু মনসুর মাতুরিদী (রঃ) (মৃত্যু-৩৩৩ হিঃ)। তাঁর রচিত তাবীরুল কোরআন বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী

১. আবু আবদুর রহমান মোহাম্মদ এবনে হোসাইন, মাওয়ালাজদী আস সালামী (রঃ) (মৃত্যু-৪১২ হিঃ)। তাঁর রচিত 'হাকায়েকুত তাফাসীর' বেশ খ্যাতি লাভ করে। তিনি সূফী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই সূফীবাদের প্রভাব তাতে পরিলক্ষিত হয়।

২. আবু এসহাক আহমদ এবনে মোহাম্মদ ইব্রাহীম আসসালবী (রঃ) (মৃত্যু-৪২৭ হিজরী)। তাঁর রচিত গ্রন্থ ছিল "আল কাশফ ওয়াল বয়ান ফি তফসীরীল কোরআন"।

আভিধাণিক এবং ফেকাহর দিক থেকে এ গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচিত হয়েছে।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী

১. আবু মোহাম্মদ হোসাইন এবনে মাসউদুল কোররা আল বগবী (রঃ) (মৃত্যু-৫১৬ হিজরী)। তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো মআলেমুত তানজীল। এ গ্রন্থটি আট খন্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

২. মাহমুদ এবনে ওমর জমখশরী। তাঁর বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থটির নাম হলো "তফসীরে কাশ্যাফ"। বিভিন্ন দিক থেকে এই তফসীরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কিন্তু তিনি মুতাজিলা ছিলেন তাই মুতাজিলা মতবাদের প্রভাব তাঁর গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।

হিজরী সপ্তম শতাব্দী

১. ইমাম ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ এবনে ওমর রাজী (রঃ) (মৃত্যু-৬০৬ হিজরী)। তাঁর তফসীর গ্রন্থের নাম 'মাফাতিহুল গায়ব'। তবে 'তফসীরে কবীর" হিসেবে এ গ্রন্থটি খ্যাতি লাভ করেছে। এ তফসীর গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।

২. আবু বকর মহিউদ্দিন এবনে আরবী (রঃ) (মৃত্যু ৬৩৬ হিজরী)। তিনি বিখ্যাত সুফী বুজর্গ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩. আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে আবি বকর এবনে ফরহুল আনসারী আল খাজরাজী, আল কুর্তবী (রঃ) (মৃত্যু-৬৭১)। তাঁর জামে আহকামেল কোরআন 'তফসীরে কুর্তবী' নামে খ্যাতি লাভ করে। এটি একটি মহান তফসীর গ্রন্থ। এলমে ফেকাহর দিক থেকে এ গ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক। এই শতাব্দীর আরো একজন তফসীরকার কাজী নাসের উদ্দিন, আবু সাঈদ আবদুল্লাহ এবনে ওমর আল বায়জাবী (রঃ) (মৃত্যু-৬৮২)। তাঁর গ্রন্থের নাম 'আনওয়ারুত তানজীল' ও 'আসরারুত তাবীল' যা তফসীরে বায়জাবী নামে বিখ্যাত। এতে অনেক তফসীরের নির্যাস রয়েছে।

হিজরী অষ্টম শতাব্দী

১. হাফেজ আবদুল্লাহ এবনে আহমদ আন নসফী (রঃ) (মৃত্যু-৭০১ হিজরী)। 'মাদারেকুত তানজীল' নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মতবাদের প্রতিনিধিত্বকারী এ গ্রন্থটিও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

২. হাফেজ আবুল ফেদা ইসলামঈল এমাদুদ্দীন এবনে কাসীর (রঃ) তাঁর রচিত গ্রন্থ তফসীরে এবনে কাসীর নামে বিখ্যত। তাঁর তফসীরে তিনি অনেক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হিজরী নবম শতাব্দী

১. আবু যায়েদ আবদুর রহমান এবনে মোহাম্মদ আত তাআবী (রঃ) (মৃত্যু-৮৭৬ হিজরী)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম হলো আল জাওয়াহেরুল হেসান ফি তফসীরিল কোরআন। তিনি প্রায় একশতটি গ্রন্থ থেকে বাছাই করা তথ্য এতে সংযোজন করেছেন।

২. শেখ বোরহানউদ্দিন ইব্রাহীম আল বাকারী (রঃ) (মৃত্যু-৮৮৩ হিজরী)। তাঁর রচিত তফসীর গ্রন্থের নাম- 'নাজমুদ দোরার ফি তানাসুবিল আয়ে ওয়াসসুয়ার'। গ্রন্থের নামেই এর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। বিভিন্ন আয়াত ও সূরা সমূহে যে সম্পর্ক এবং রহস্য রয়েছে লেখক তা উদ্ঘাটন করেছেন এ গ্রন্থে।

হিজরী দশম শতাব্দী

১. আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ুতী (রহঃ) (মৃত্যু-৯১১ হিজরী)। তিনি কোরআনে করীমের এলমের উপর ৩২ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২. আবু সউদ এবনে মোহাম্মদ আল এবাদী (রঃ) (মৃত্যু-৯৮২ হিজরী)। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তফসীরে আবুস সউদ' বিখ্যাত।

হিজরী একাদশ শতাব্দী

১. আবুল ফায়েজ ফয়জী (রঃ) (মৃত্যু-১০০৪ হিজরী)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম সাওয়াতুল এলহাম। তাঁর এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থটি নোকতা বিহীন।

২. মোল্লা আলী কারী, তাঁর পুরো নাম হলো নূরুদ্দীন আলী এবনে সুলতান মুহাম্মদ (রঃ) (মৃত্যু-১০১০ হিজরী)। তিনি বিখ্যাত মোহাদ্দেস ছিলেন। তাঁর তফসীরেও এর প্রভাব রয়েছে।

হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী

এই শতাব্দীতে পূর্ব কালে রচিত তফসীর সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তবে যারা এই শতাব্দীতে তফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সাইয়েদ হাশেম বোহরানী (রঃ) (মৃত্যু-১১০৭ হিজরী) এবং শেখ ইসমাঈল হাক্কী (রঃ) (মৃত্যু-১১২৭ হিজরী) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী

১. আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) (মৃত্যু-১২২৫ হিজরী)। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তফসীরে মাজহারী' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এতে শব্দের আভিধাণিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে। এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উপকারী এবং অতীব মূল্যবান।

২. কাজী মোহাম্মদ এবনে আলী এবনে মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ আশ্ শওকানী (রঃ) (মৃত্যু-১২৫০ হিজরী)। তাঁর রচিত তফসীর গ্রন্থ "ফাতহুল কাদীর" ৫ খন্ডে সমাপ্ত।

৩. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আলুসী (রঃ) (মৃত্যু-১২৭০ হিজরী)। তাঁর রচিত তফসীর গ্রন্থ "রুহুল মাআনী" দশ খন্ডে সমাপ্ত, পবিত্র কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করার জন্যে এ গ্রন্থটি বিশেষভাবে উপকারী।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী

১. তাফসীরুল জাওয়াহের। আল্লামা জাওহারী তান্তাবী (রঃ) (মৃত্যু-১৩৬৯ হিজরী)। ২৫ খন্ডে সমাপ্ত।

২. ফি জেলালিল কোরআন। আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রঃ) (মৃত্যু- ১৩৮৬ হিজরী)। ১০ খন্ডে সমাপ্ত। এই শতাব্দীতে উর্দু ভাষায়ও অনেক তফসীর গ্রন্থ রচিত

হয়েছে। যেমন হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) রচিত 'তফসীরে বয়ানুল কোরআন' ১২ খন্ডে সমাপ্ত। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত মুফতী মোহাম্মদ শফী (রঃ)। খোলাসাতুত তাফসীর, ৩ খন্ডে সমাপ্ত। কৃত মওলানা মোহাম্মদ তায়েব লখনবী (রঃ)। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, কৃত হযরত মওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ)। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ)। তফসীরে মাওয়াহেবুর রহমান, কৃত মওলানা আমীর আলী মলিহাবাদী (রহঃ)। ৩০ খন্ডে সমাপ্ত। তফসীরে ফাতহুল মান্নান বা তফসীরে হাক্কানী, কৃত মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী (রহঃ)। ৭ খন্ডে সমাপ্ত।

আমরা তফসীর গ্রন্থের এই ফিরিস্তি আর দীর্ঘায়িত করে পাঠক বৃন্দের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাইনা। তবে এ আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বিগত চৌদ্দশ' বছর যাবত প্রত্যেক যুগের ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান করে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এর অন্যতম কারণ ছিলো এই, প্রত্যেক যুগেই মানব মনে নব নব জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। সে জিজ্ঞাসার জবাব তাঁরা কোরআনে করীমে খুঁজেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

لَا يَخْلَقُ عَلٰى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا تَنْقَضِىْ عَجَائِبُه

এক. পবিত্র কোরআনকে তার পাঠক যতবারই পাঠ করুক না কেন, তা কোন সময়ই পুরাতন মনে হবে না।

দুই. তত্ত্বজ্ঞানী, অনুসন্ধানী আলেমগণ তার মর্মার্থ অনুসন্ধান করে তৃপ্তি লাভ করবেনা, বরং সর্বদাই তাদের অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে।

তিন. কোন দিনও পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব ও তথ্য শেষ হবে না; বরং নব নব যুগে যেসব নতুন নতুন প্রশ্ন দেখা দেবে তার সঠিক জবাব পবিত্র কোরআনে পাওয়া যাবে, এজন্যে প্রত্যেক যুগের একদল ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এ যুগের ওলামায়ে কেরামের প্রতিও এ দায়িত্ব অতি স্বাভাবিক ভাবেই বর্তায়। বস্তুতঃ এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই 'তফসীরে নূরুল কোরআন' রচনায় আত্মনিয়োগ করি। এ মহান গ্রন্থের সপ্তম খন্ড প্রকাশনার এ শুভ লগ্নে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ মুনাজাতই করছি।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! কবুল করো আমাদের তরফ থেকে এই সাধনা, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"।

হে আল্লাহ! এ মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান করো। এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা শুধু তোমার তওফিকেই হয়েছে। আর ভবিষ্যতে যা হবে তা-ও তোমার তওফিকেই হবে।

হে, আল্লাহ! এ মহান গ্রন্থকে মুসলমানদের নিকট পৌঁছানোর এবং এর দ্বারা তাদের উপকৃত হবার তওফিক দান করো।

হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনকে এই গুনাহগার বন্দার মাগফেরাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করো। এ গুনাহগারকে মাফ করে দিও এবং যারা এ গ্রন্থ পাঠ করবেন বা এর সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা করবেন তাদেরও মাফ করে দিও।

হে আল্লাহ! আমার আব্বাজান, আম্মাজান এবং সকল ওস্তাদকে জান্নাতে উচ্চ মর্তবা দান করো।

হে আল্লাহ! তোমার প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত আমাদেরকে নসীব করো এবং তাঁর উসিলায় আমাদের মুনাজাত কবুল করো। ইয়া আরহামার রাহিমীন, ইয়া জাল জালালে ওয়াল ইকরাম, ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাউয়্যুম, বিরাহমতিকা আসতাগিছ। আমীন।

وصلى الله تعالى على خيرخلقه محمدو على اله واصحابه

اجمعين۞

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহঃ)

৭/৩/১৯৯০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

সপ্তম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২
(২) নেপথ্য ঘটনা	২
(৩) মানব মনে পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া	৫
(৪) সংসার ত্যাগী হওয়া	১২
(৫) রিয্‌কের দু'টি গুণ	১৩
(৬) মাছআলা	১৭
(৭) কসম সম্পর্কে বিধান	২২
(৮) মান্নত মানার প্রসঙ্গে	২৩
(৯) পবিত্র কোরআনের সত্যতা নতুন	২৫
(১০) বিস্ময়কর শৃংখলা	২৭
(১১) মধ্যপায়ীর প্রতি লা'নত	২৮
(১২) শানে নুযুল	৩০
(১৩) মদ্যপানের ক্ষতিকর দিক	৩২
(১৪) মোমেনদের পরীক্ষা	৩৫
(১৫) এহরাম অবস্থায় যা হত্যা করা যায়	৩৭
(১৬) মাছআলা	৩৯
(১৭) সামুদ্রিক শিকারের ব্যাখ্যা	৪৬
(১৮) কা'বা নামকরণ	৫০
(১৯) পৃথিবী কত দিন টিকবে	৫০
(২০) কা'বা শরীফের সংরক্ষণ	৫১
(২১) ভাল মন্দ এক সমান নয়	৫৫
(২২) শানে নুযুল	৫৭
(২৩) আয়াতের মর্মকথা	৬৫
(২৪) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর অভিমত	৬৫
(২৫) আত্ম সংশোধনে সচেষ্ট হও	৬৬
(২৬) অন্য একটি ব্যাখ্যা	৬৮
(২৭) শানে নুযুল	৭০
(২৮) আয়াতের মর্মকথা	৭২

বিষয় পৃষ্ঠা

(২৯) ইমাম রাজীর (রঃ) বক্তব্য..৭৪
(৩০) হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের দান....................৮২
(৩১) সার কথা...৮৩
(৩২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া......................৮৭
(৩৩) মায়েদার বিবরণ..৮৭
(৩৪) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আয়াত
খানি সারা রাত পাঠ করেছেন...৯৪
(৩৫) সূরা আনআ'ম প্রসঙ্গে..৯৭
(৩৬) জাগতিক উন্নতি ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনা.......................১১১
(৩৭) ফেরেশতাকে দেখা কি সম্ভব?...১১৩
(৩৮) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা........................১১৪
(৩৯) আয়াতের শিক্ষা...১২৪
(৪০) কাফেরদের ধ্বংস হওয়ার কয়েকটি কারণ...................................১৩০
(৪১) আয়াতের মর্মকথা...১৩৮
(৪২) আবু তালেবকে ইসলামের দাওয়াত ও তার জবাব.........................১৪০
(৪৩) ইসলামের তিনটি মৌলিক নীতি..১৪২
(৪৪) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা........................১৫২
(৪৫) একটি বিস্ময়কর ঘটনা..১৫২
(৪৬) অবিশ্বাসীদের ধ্বংস অনিবার্য..১৬৫
(৪৭) তিনটি কথার ঘোষণা..১৭৩
(৪৮) "আমি আল্লাহর রসূল"...১৭৪
(৪৯) আয়াতের মর্মবাণী...১৮১
(৫০) এবাদত কবুল হওয়ার জন্য এখলাস পূর্বশর্ত..............................১৮৫
(৫১) আয়াতের মর্মবাণী...১৯১
(৫২) গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত...১৯৩
(৫৩) গায়ব কি?..১৯৯
(৫৪) আমালুল কোরআন..২০৩
(৫৫) সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক..........................২০৫
(৫৬) মানুষের যাবতীয় কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ.................................২০৬
(৫৭) রক্ষাকর্তা কে?..২১৩
(৫৮) শোকরের তাৎপর্য..২১৪

বিষয় পৃষ্ঠা

(৫৯) তিন প্রকার আযাব ২১৫
(৬০) জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব ২১৯
(৬১) বাতিল পন্থীদের মজলিস বর্জনীয় ২২১
(৬২) শানে নুযুল ২২৩
(৬৩) এ জীবন ও জগৎ ক্ষণস্থায়ী ২২৫
(৬৪) মন্দ সংসর্গ বর্জনীয় ২২৬
(৬৫) শিংগায় ফুঁক দেয়া প্রসঙ্গে ২৩৩
(৬৬) কেয়ামতের পূর্বে যা ঘটবে ২৩৫
(৬৭) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ২৪৪
(৬৮) পবিত্র কোরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রসঙ্গ ২৪৯
(৬৯) দু'টি কথা ২৫৩
(৭০) ঈমান ও তার শুভ পরিণতি ২৬৬
(৭১) এহসানের তাৎপর্য ২৭২
(৭২) নবীগণকে যে ফজিলত প্রদান করা হয়েছে ২৭৪
(৭৩) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৮০
(৭৪) আয়াতের মর্মবাণী ২৮১
(৭৫) কাফেররা ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে ২৮২
(৭৬) মক্কা পল্লী জগতের জননী ২৮৩
(৭৭) শানে নুযুল সম্পর্কে আরও কথা ২৮৭
(৭৮) আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ ২৯৩
(৭৯) আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কৌশল একাধিক ৩০৫
(৮০) এক আল্লাহর বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ কর ৩০৬
(৮১) আল্লাহ পাকের দীদার ৩০৭
(৮২) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ৩০৭
(৮৩) শবে মে'রাজে আল্লাহ পাকের দীদার ৩০৭
(৮৪) শানে নুযুল ৩১৭
(৮৫) শানে নুযুল সম্পর্কে আরও কথা ৩১৭
(৮৬) গুনাহর কারণ হওয়াও গুনাহ ৩২০
(৮৭) শানে নুযুল ৩১১
(৮৮) মানুষ যখন গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় ৩২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

সপ্তম খণ্ড　　　　　　　　　　　　সপ্তম পারা

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

তরজমা

(৮৩) আর রসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তারা যখন তা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্যের পরিচয় পায় তার জন্যে তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখতে পাবে, তারা (মোনাজাত করে) বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব, আমাদেরকেও সে সব লোকদের তালিকাভুক্ত করুন যারা (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও কোরআন সত্য হওয়া) স্বীকার করেন।

(৮৪) (তারা আরও বলে যে) আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তার প্রতি আমরা কেন ঈমান আনবনা? যখন আমরা আশা করি আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(৮৫) আর তাদের একথার জন্যে আল্লাহ্ পাক তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। যারা সৎ কাজ করে, এটি তাদেরই পুরস্কার।

(৮৬) আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে নাসারাদের একটি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা আলেম, দরবেশ, অহংকারী নয়। আর এ আয়াতেও নাসারাদেরই একটি দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে, যারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করার কারণে তাদের অন্তরে ইসলাম আপন স্থান করে নেয়, তাদের চোখে অশ্রুর ফোয়ারা উদ্বেলিত হয়।

শানে নুযুল

এ আয়াত আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যখন হযরত জাফর (রাঃ) তাদের সম্মুখে সূরা মরয়ম তেলাওয়াত করেন তখন বাদশাহ্র দরবারে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম, দরবেশগণ উপবিষ্ট ছিলেন, সকলেই ক্রন্দণ করতে লাগলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীও ক্রন্দণ করলেন। তিনি মুসলমানদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কি বলেন? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, তিনি ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র বন্দা এবং রসূল বলেন। তাঁর মাতা মরয়ম ছিলেন আল্লাহ্র ওলী, দুনিয়াত্যাগী। আল্লাহ্র হুকুমে জীব্রাঈল (আঃ)-এর ফুঁক দেয়ায় মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেন। তখন নাজ্জাশী বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ, তাই সত্য এবং তার চেয়ে একটুও অধিক নয়। এরপর আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীগণ ইসলাম কবুল করেন এবং এ সাক্ষ্য দেন যে, ইনিই সেই সত্য নবী, যাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন হযরত ঈসা (আঃ)।[১]

নেপথ্য ঘটনা

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় মুশরেকরা তাঁর সাথে সর্বাধিক শত্রুতা করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত সবর বা ধৈর্যের সঙ্গে তাদের অমানুষিক জুলুম-অত্যাচারের মোকাবেলা করতে হয়। মক্কায়ে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৬-৯৭

মোয়াজ্জমায় তখনকার দিনে মুসলমানদের প্রতি যে জুলুম-অত্যাচার করা হয়, তার দৃষ্টান্ত জুলুমের ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সুদীর্ঘ তেরটি বছর নির্যাতিত, উৎপীড়িত অবস্থায় অতিবাহিত করার পর আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করতে হয়। স্বীয় মাতৃ-ভূমি তথা ভিটামাটি যথাসর্বস্ব ছেড়ে আসতে হয়।

মদীনা মোনাওয়্যারায় ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা বাস করত, এদের মধ্যে ইহুদীরা হল ইসলামের ঘোর শত্রু, ইহুদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় মক্কার পৌত্তলিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাবারে বিষ মিশ্রিত করে, তাঁকে যাদুটোনা করে, অতর্কিতে তাঁর প্রতি শিলা খন্ড নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে। তাঁর প্রতি শ্রত্রুতা এবং বিদ্বেষ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সর্বপ্রকার অপচেষ্টা চালায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আহলে কেতাবদের অন্য দল খৃষ্টানরাও ইসলামের শত্রু ছিলো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা চলে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলেন যারা সত্য উপলব্ধি করতে প্রয়াসী ছিলেন, যারা সংসারত্যাগী, আত্মোৎসর্গকারী ছিলেন, যারা বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও উদারতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। হিংসা-বিদ্বেষ-অহংকার ছিলো ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য। এসব চারিত্রিক দুর্বলতা নাসারাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ছিলো।

মক্কার কাফেরদের অমানবিক আচরণের কারণে সাহাবায়ে কেরামের একটি ক্ষুদ্র দল যখন আবিসিনিয়া হিজরত করেন, তখন কাফেররা আবিসিনিয়া হাযির হয়ে তদানীন্তন বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট মুসলমানদেরকে তার দেশ থেকে বহিস্কার করার আবেদন জানায়। বাদশাহ তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ সময় হযরত জাফর (রাঃ) বাদশাহ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে সূরা মরয়ম পাঠ করে শোনান। পরবর্তীতে নাজ্জাশী ২০ জন নও মুসলিমের একটি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইলে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। তাঁরা আল্লাহ্র কালামের অপূর্ব মহিমায় মুগ্ধ হন এবং বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১]

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ

অর্থাৎ– যখন তারা শ্রবণ করে সেই মহান বাণী যা আল্লাহ্র রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট নাযিল করা হয়েছে, তখন তুমি দেখবে তাদের চক্ষু

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৫৭

থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। যদিও এ আয়াত নাজ্জাশী অথবা তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কিন্তু এর হুকুম শুধু তাদের ব্যাপারে নয় কেননা, বর্ণনা-শৈলী এর ব্যাপকতার দাবীদার।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে তাদের ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ায় কথা বলা, তাদের অন্তরে আল্লাহ্র যে ভয় রয়েছে তা প্রকাশ করা।

مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج

এজন্যে যে, তারা সত্যের পরিচয় পেয়েছে, তাই তারা ক্রন্দন করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে আতা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শ্রবণকারীগণ হলেন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী এবং তাঁর সাথীগণ। যখন তাঁর দরবারে হযরত জাফর (রাঃ) সূরা মরয়ম তেলাওয়াত করছিলেন তখন তারা ক্রন্দন করেছিলেন।

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

তারা তখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে মোনাজাত করে বলেছিলেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার প্রতি, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব, আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে লও যারা এর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

নও মুসলিম ঈসায়ীগণ এজন্যে একথাটি বলেছেন যে, তারা ইঞ্জিল পাঠ করে জানতে পেরেছেন যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়া অন্য পয়গম্বরদের পক্ষ থেকে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দান করবে। অথবা

الشّٰهِدِيْنَ

শব্দটির অর্থ হলো হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাঁরা সাথী তথা মুসলমান। আর শাহাদাতের অর্থ হলো কোন কিছুর সত্যায়ন করা, আর প্রকৃত শাহাদাত তাই, যাতে মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত কথা থাকে। মুনাফেকরা যদিও প্রকাশ্যে ইসলামের কথা স্বীকার করে কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

১ : তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দান করেন যে, নিশ্চয় মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী। তাই "আশ শাহেদীন" শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, আমাদের ঈমান মুনাফেকদের ন্যায় মৌখিক নয়; বরং সম্পূর্ণ আন্তরিক। এর দলিল হিসেবে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ

সে যুগে কোন কোন ব্যক্তি নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তারা না দেখে কিভাবে ইসলাম কবুল করেছে? তারই জবাবে বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীরা যা বলেছেন তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের কি হল যে, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং যে সত্য আমাদের নিকট এসেছে তার প্রতি ঈমান আনবোনা; অথচ আমরা এ আকাঙ্ক্ষা করি যে, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। বস্তুতঃ যদি নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সত্য গ্রহণ তথা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নে বিলম্ব করার কোন যুক্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে "কওমে সালেহ" বলতে ঈমানদার মুসলমানদেরকে বোঝানো হয়েছে। মূলতঃ মানব অন্তরে যখন আল্লাহর রহমত লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন সে আল্লাহর পছন্দনীয় হতে চায়। এজন্যে সে প্রথম সুযোগেই আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন ঈমান আনে বা বিশ্বাস স্থাপন করে তখন ইহুদীরা তাদের সমালোচনা করেছিল। এ সমালোচনার জবাবে তারা যা বলেছিলেন তা এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আর একথাও বলা হয়েছে যে, ঈমান আনয়নের পর যখন তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট গমন করেন, তখন অন্যান্য খৃষ্টানরা তাদের সমালোচনা করেছিল। তাদের জবাবে নও মুসলিমগণ যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

মানব মনে পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া

মানুষের মনে পবিত্র কোরআনের আছর বা প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে এ আয়াতে। হযরত জাফর (রাঃ) যখন সূরা মরয়ম তেলাওয়াত শুরু করেন, বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীরা এ পবিত্র কালাম শ্রবণ করা মাত্র তাদের হৃদয় বিগলিত হয়। তাদের মনো-জগতে এক বিপ্লব আসে, তাদের নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়, তারা ক্রন্দন করতে শুরু করেন। তাদের অন্তর পবিত্র

কোরআনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। ক্ষণিকের মধ্যেই মনের সকল কালিমা, পথভ্রষ্টতার সকল অমানিষা কেটে যায় এবং সত্য-অসত্যের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে আত্ম প্রকাশ করে। তাই সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁদের ঈমানের কথা ঘোষণা করেন। পবিত্র কোরআনের এমনি প্রতিক্রিয়া সকল যুগেই হয়।

একবার বাগদাদের উপকণ্ঠে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তখন গভীর রাতে এক ব্যক্তি চলমান উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বসে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। তদানীন্তনকালের দুর্ধর্ষ ডাকাত ফোযায়েল এবনে ইয়াজ ব্যবসায়ী কাফেলার উপর হামলায় উদ্দত হয়েছিল। এমনি সময় তার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করলো পবিত্র কোরআনের এ আয়াত–

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(যারা মোমেন তাদের কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র জিকরের জন্যে ভীত সন্ত্রস্ত হবে?) এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র ফোজায়েল এবনে ইয়াজের জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব আসলো। সঙ্গে সঙ্গে হাতের তলোয়ারটি ছুড়ে মারলো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে নব জীবন লাভ করলো। পরবর্তীতে তিনি ওলী আল্লাহদের মধ্যে শামিল হয়েছিলেন।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

যেহেতু তারা বলেছিলেন যে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাই আল্লাহ পাক তাদের একথার সওয়াব স্বরূপ তাদেরকে জান্নাত দান করবেন যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে আর তাতে তারা চিরদিন থাকবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে যে জান্নাত দান করার কথা ঘোষণা করেছেন, তা আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের পূর্ণ আকীদা ও বিশ্বাসের কারণে কেননা, তারা ঈমানের কথা প্রকাশ করেছে, পবিত্র কোরআন শ্রবণে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়েছে, তাদের নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হওয়ার মাধ্যমেই তাদের মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, শুধু তাদের মুখের কথায় জান্নাত লাভ করা বা সওয়াব পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু যেহেতু তাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে,

مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯

তারা সত্যের পরিচয় পেয়েছে তথা আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করেছে এবং খাঁটি মোমেন হয়েছে, তাই তাদের জন্যে জান্নাতের খোশখবরী প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) আতা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে- بِمَا قَالُوْا শব্দটির অর্থ হলো- بِمَا سَأَلُوْا

অর্থাৎ- তারা যেহেতু নেককার মোমেনদের দলভুক্ত হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেছে তাই তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।[১] আলোচ্য আয়াতের অর্থ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি বর্ণনাও রয়েছে।

(فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ) فَأَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُمْ (بِمَا قَالُوْا) بِتَوْحِيْدِهِمْ بِالطَّوْعِ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে বলেই আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে, কেউ যদি আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতার কথা উপলব্ধি করে তথা মা'রেফাত হাসিল করে এবং মৌখিক স্বীকারও করে, তবে জান্নাত তার জন্যে ওয়াজিব হয় যদিও সে পাপী ব্যক্তি হয়। আর একথাও প্রমাণিত হয় যে, পাপী মোমেন চিরদিন দোযখে থাকবে না; বরং ঈমানের বরকতে অবশেষে দোযখ থেকে নাজাত পাবে। আর এতে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তৌহিদ ও রেসালতে বিশ্বাসের কথা স্বীকার করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অর্থাৎ- নেককারদের এটিই বিনিময়।

وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ইতিপূর্বে একটি বিশেষ দলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে সাধারণ ভাবে ইসলামের যে মূলনীতি তা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের এটিই বিধান যে, তিনি নেককার মাত্রকে তার উত্তম

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৯
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১০০

বিনিময় বা সওয়াব দান করে থাকেন। কোন বন্দার ঈমান, এখলাস, নেক আমল তথা কোন সত্য-সাধনা আল্লাহ্ পাকের দরবারে ব্যর্থ হয় না।[১]

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই, যখনই মোমেনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয় তখন যারা অবাধ্য কাফের তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

অর্থাৎ যারা অবাধ্য হয়েছে, নাফরমানী করেছে, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারাই হবে দোযখের অধিবাসী। আর তাতে তারা চিরদিন থাকবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

তরজমা

(৮৭) হে মোমেনগণ! যে সব সুখাদ্য আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করোনা আর সীমা লজ্ঘন করোনা, যারা সীমা লজ্ঘন করে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না।

(৮৮) আর আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত রিযক থেকে হালাল উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহ আহার কর এবং যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ তাঁকে তোমরা ভয় করে চল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

এ সূরার শুরুতে অঙ্গীকার পালনের নির্দেশ এবং হালাল হারামের বর্ণনা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাড়াবাড়ি এবং তাদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতে পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গ তথা হালাল হারাম সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড–১, পৃষ্ঠা-২৬৭
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৮

শানে নুযুল

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে যে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো যে, আমি যখন গোশ্ত খাই তখন আমার যৌনভাব অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়, এ কারণে আমি গোশ্তকে আমার জন্যে হারাম করে নিয়েছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এবনে আসাকের কালবীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের একটি দল সম্পর্কে। এ দলে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত মেকদাদ এবনে আসওয়াদ (রাঃ) এবং হযরত হোযায়ফা (রাঃ) -এর আজাদকৃত সালেম (রাঃ)।

তাঁরা সকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাবেন। গোশ্ত খাওয়া পরিহার করবেন, নারীদের থেকে দূরে থাকবেন, কম্বল জাতীয় পোষাক পরিধান করবেন এবং জীবন রক্ষায় যা একান্ত জরুরী– এমন সামান্য পরিমাণ খাবার গ্রহণ করবেন আর সাধুদের ন্যায় ঘুরে ফিরে জীবন অতিবাহিত করবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে নছিহত করলেন। তিনি সেদিন কেয়ামতের দিনের আলোচনা করলেন। তাঁর ভাষণ শ্রবণ করে পরকালীন জীবনের চিন্তায় সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় বিগলিত হল। তাঁরা ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ)-এর বাড়ীতে দশজন একত্রিত হলেন।

তাঁরা ছিলেন হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ), হযরত আবুজর গাফফারী (রাঃ), হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-এর আজাদ করা সালেম (রাঃ), মেকদাদ এবনে আসওয়াদ (রাঃ), সালমান ফার্সী (রাঃ), মা'কল এবনে মাকরান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শের পর সর্ব সম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, তাঁরা সকলে দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাবেন, উলের পোষাক পরিধান করবেন, স্ত্রী সম্ভোগ বর্জন করবেন, সর্বদা রোজা রাখবেন, সারারাত নামায আদায় করবেন, বিছানায় ঘুমাবেন না, গোশ্ত এবং চর্বি খাবেন না, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না। সারা জীবন ঘুরে ফিরে অতিবাহিত করবেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন তাঁদের এ সংকল্পের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি স্বয়ং হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ)-এর বাড়ীতে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯

আগমন করলেন। কিন্তু ওসমান (রাঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী খাওলা উম্মে হাকীম বিনতে আবু উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমার স্বামীর সম্পর্কে যে সংবাদ পেয়েছি তা কি সত্য?

তিনি বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি ওসমান আপনার নিকট একথা বলে থাকেন তবে তা সত্যই। মূলতঃ খাওলা মিথ্যা বলতে পারেন না অথচ স্বামীর রহস্যও উদ্‌ঘাটন করতে চান না। তাই তিনি এ জবাব দিয়েছেন।

হযরত এবনে মাজউন (রাঃ) যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীগণ সঙ্গে সঙ্গে দরবারে নববীতে হাযির হলে তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা অমুক অমুক একথার উপর একমত হয়েছ– এ কথা কি সত্য নয়?

এবনে মাজউন (রাঃ) আরজ করলেন ঃ অবশ্যই সত্য। কিন্তু ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের উদ্দেশ্য সৎ, তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমাকে এর হুকুম দেয়া হয়নি। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রাণেরও হক্ব রয়েছে। তোমরা রোজা রাখ (নফল) আর কোন কোন সময় বাদও দাও। রাতে আল্লাহর এবাদত কর কিন্তু কিছু সময় নিদ্রিত হও। আমি রাতের কিছু অংশ উঠি (অর্থাৎ নামায আদায় করি) আর কিছু অংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করি। আমি রোজা রাখি (নফল) আর কোন সময় নফল রোজা বাদ দেই। গোশ্‌ত ও চর্বি আমি খাই। স্ত্রীদের সান্নিধ্যও আমি লাভ করি।

অতএব, যে আমার তরিকত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত থাকবে না। অতঃপর তিনি লোকদেরকে একত্রিত করে ভাষণ দিলেন, তাতে এরশাদ করলেন ঃ কিছু লোক স্ত্রীদেরকে এবং পানাহারকে, সুগন্ধি গ্রহণকে, নিদ্রাকে এবং জাগতিক সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে হারাম করে ফেলেছে। অথচ আমি তোমাদেরকে সন্নাশি বা সাধু হওয়ার আদেশ প্রদান করি নাই। আমার দ্বীনে গোশ্‌ত খাওয়া, স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করা এবং দুনিয়াত্যাগী হয়ে বসে থাকার আদেশ নেই।

আমার উম্মতের সংসার ত্যাগ হলো রোজা, আর বৈরাগ্য হলো জেহাদ। তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করোনা। হজ্ব কর, ওমরাহ কর। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর। রমজানের রোজা রাখ, সোজা সরল পথে চল, তোমাদের সব কাজ সঠিক হবে। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা চরম পন্থা অবলম্বনের জন্যেই ধ্বংস হয়েছে, তারা নিজেরাই নিজেদের জন্যে কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছে। তাই আল্লাহ্ পাকও তাদের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দান করেছেন,

গির্জায় উপবিষ্ট খৃষ্টানরা এবং বাড়ীতে অপেক্ষমান ইহুদীরা তাদেরই স্মারণিক। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। তিন ব্যক্তি উম্মাহাতুল মোমেনীনদের খেদমতে হাযির হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন তাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবাদত সম্পর্কে বলা হল, তখন মনে হল যে, তারা এ এবাদতকে কম মনে করলেন এবং বললেন ঃ

আমাদের সঙ্গে কি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন মোকাবেলা হতে পারে? তাঁর পূর্বাপর সমস্ত দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তখন এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমি সর্বদা সারা রাত নামায আদায় করবো। আর একজন বললেনঃ আমি সর্বদা রোজা রাখবো, কোন সময় বাদ দেব না। আর তৃতীয় ব্যক্তি বললেন ঃ আমি কোন সময় বিয়ে-শাদী করবো না। এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং এরশাদ করলেন ঃ তোমরা এসব কথা বলেছ? তবে শ্রবণ কর, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্ পাককে অধিক ভয় করি, তবে আমি রোজা রাখি (নফল) আর কোন সময় বাদও দেই। (রাত্রে) নামায আদায় করি এবং নিদ্রিত হই। আমি বিয়ে শাদিও করি। যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা নিজেদের জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করোনা, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দান করবেন। যারা নিজেদের জন্যে নিজেরা চরম পন্থা অবলম্বন করেছে আল্লাহ্ পাকও তাদেরকে কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তারই স্মারণিক। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ ِۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

"কিন্তু তারা নিজেরাই বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তন করে, যার বিধান আমি তাদেরকে দেইনি"।

এবনে আবি হাতেম যায়েদ এবনে আসলামের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) তাঁর বাড়ীতে কিছু মেহমান দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং মেহমানদের খাবারের ব্যবস্থার জন্যে বাড়ীর লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে চলে গেছেন। তিনি যখন রাতে বাড়ী ফিরলেন, তখন দেখলেন তাঁর অপেক্ষায় বাড়ীর লোকেরা

মেহমানদেরকে খাবার দেয়নি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমার মেহমানদেরকে আমার জন্যে খাবার দিলে না? এখন এ খাবার আমার জন্যে হারাম।

তখন স্ত্রীও বললেন ঃ তুমিও আমার জন্যে হারাম। হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) যখন অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে দেখলেন, তখন (কছম ভেঙ্গে) খাবারে হাত রাখলেন এবং মেহমানদেরকে বললেন, বিস্মিল্লাহ পাঠ করে খাওয়া শুরু করুন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! আল্লাহ পাক যে সব সুখাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করোনা, আর যারা সীমা লঙ্ঘন করে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না।

সংসার-ত্যাগী হওয়া

আলোচ্য আয়াতে একটি কথার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তাহলো– রোহবানিয়্যত তথা সংসার-ত্যাগী হওয়া বা বৈরাগ্য নীতি অবলম্বন করা। ইসলাম এ নীতি আদৌ পছন্দ করে না। ইসলাম নির্লিপ্ত জীবনের শিক্ষা দেয়না; বরং কর্মময় এবং সংগ্রামী জীবনের আদর্শ পেশ করে। খৃষ্টানরা রোহবানিয়ত বা বৈরাগ্য নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় এর নিন্দা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ ۣ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

(আর সংসার ত্যাগী হওয়া তথা বৈরাগ্য নীতি অবলম্বন করা তাদেরই আবিষ্কার। আল্লাহ পাক তাদেরকে এর নির্দেশ প্রদান করেননি।) কেননা, বৈরাগ্য প্রথা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাই তা চির নিন্দনীয় ও চির বর্জনীয়। ইসলাম কর্মের ধর্ম, কর্ম বিমুখতার কোন সুয়োগ ইসলামে নেই।

বৈরাগ্য প্রথা সর্বনাশা প্রথা। তাই ইসলাম এর অনুমতি দেয়না। যা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর, অকল্যাণকর ইসলাম এমন কাজের অনুমতি দেয় না, যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পরিপন্থী, ইসলাম এমন নীতি বরদাশ্ত করেনা। এজন্যে সংসার ত্যাগ বা বৈরাগ্য চির নিন্দনীয়। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান পূত-পবিত্র জীবন সর্বকালের মানুষের জন্যে উজ্জলতম আদর্শ। তিনি মক্কার বুকে ইসলাম প্রচার করেছেন। কিন্তু মক্কাবাসী তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি; বরং তাঁর প্রতি অকথ্য জুলুম অত্যাচার করেছে।

তিনি সুদীর্ঘ ১৩টি বছর পর্যন্ত সবর অবলম্বন করেছেন। অবশেষে আল্লাহ পাকের হুকুমে প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে মদীনা শরীফ হিজরত করেছেন। এখানে আসার পরও তারা মুসলমানদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি; বরং প্রাণের মদীনা বার বার আক্রমণ করেছে। ১০ বছরে ৮০টি যুদ্ধ হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে তাদেরকে মোকাবেলা করেছেন এবং দুশমনদেরকে পরাজিত করেছেন। ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সারা আরবে এবং সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছেন। এভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট তিনি ইসলাম পৌঁছিয়েছেন। এরই মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যাতে করে তাঁরা পরবর্তীতে নিখিল বিশ্বে ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

এর পাশাপাশি তিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। মানুষের মনোজগতে ইনকিলাব সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব এনেছেন। তাই তাঁর আদর্শ কর্মের, বৈরাগ্যের নয়। তাঁর আদর্শ মানুষের কল্যাণের জন্যে, মানুষের স্বভাব মোতাবেক, সুন্দরতম, মহান, চির অনুসরণীয়, চির অনুকরণীয়। আলোচ্য আয়াতে একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। "হে মোমেনগণ!" তোমরা হালাল সুখাদ্যকে হারাম মনে করোনা, তবে এর জন্যে দু'টি শর্তারোপ করা হয়েছে–

১. কোন অবস্থাতেই যেন সীমা লঙ্ঘন করা না হয়,

২. পরহেযগারী অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

ইহুদীরা ভোগ-বিলাসে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং হারাম রুজিতে অভ্যস্ত হয়েছে; পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করে জীবন বিমুখ হয়েছে, সংসার ত্যাগী হয়েছে। বলা বাহুল্য উভয় পথই ভ্রান্ত, স্বভাব বিরুদ্ধ। ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হওয়া মানবতা বিরোরী কাজ। তাই তা ইসলাম সমর্থন করেনা। অন্যদিকে আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে যা হালাল বা বৈধ ঘোষণা করেছেন, এমন সুখাদ্যকে বর্জন করা আল্লাহর নেয়ামত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো বা সংসার-ত্যাগী হওয়া যেমন অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক তেমনি অনৈসলামিকও। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক আরো সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا

আর আল্লাহ পাক তোমাদের যে রিয্ক দান করেছেন, তন্মধ্যে উত্তম হালাল বস্তু সমূহ খাও।

রিয্কের দু' টি গুণ

আলোচ্য আয়াতে গ্রহণযোগ্য রিয্কের দু'টি গুণ বর্ণিত হয়েছে–

(১) হালাল (২) উত্তম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) বলেছেন, হালাল হলো সেই রিয্ক যা শরীয়ত মোতাবেক অর্জন করা হয়। আর উত্তম হলো সেই রিয্ক যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী, বলকারক, শক্তিবর্ধক।[১]

لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

(১) আল্লাহ পাক যা তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন এমন বস্তুকে হারাম মনে করোনা।

(২) আল্লাহ পাক যা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন তা গ্রহণ করোনা।

(৩) আল্লাহ পাক যা তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তা থেকে এমনভাবে দূরে থেকোনা যেমন হারাম বস্তু থেকে দূরে থাক।

এ তিনটি অর্থে বিশ্বাস, কথা এবং কাজ অন্তর্ভুক্ত।

(৪) আল্লাহ পাক যা তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তা অন্যদেরকে ফতোয়ার মাধ্যমে হারাম বলে প্রচার করোনা।

(৫) আল্লাহ পাক যা কিছু তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তাকে মান্নত বা শপথের মাধ্যমে নিজের উপর হারাম করে নিওনা।

وَلَا تَعْتَدُوْا

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক যখন উত্তম বস্তু সমূহকে হালাল ঘোষণা করেছেন, তাই অপচয় এবং বাড়াবাড়িকে হারাম ঘোষণা করেছেন।[২] এ পর্যায়ে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, হালালকে হারাম করার একটি পন্থা হলো কোন বৈধ বস্তুর স্বাদ গ্রহণ থেকে এজন্যে বিরত থাকা যে, এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হবে। আর ইতিপূর্বে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বহু ব্যাপারে এ পন্থা অবলম্বন করেছে। কোন মুসলমানের পক্ষে এমন দুঃসাহস করা অচিন্তনীয়।

কেননা, এ কাজটির তাৎপর্য হচ্ছে এই, যে হালাল বস্তুকে হারাম মনে করে সে যেন তার মনে এই ভাব প্রকাশ করে যে, শরীয়ত কোন কোন জিনিস থেকে মানুষকে বিরত রাখার ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা পালন করেনি। এজন্যে আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে সে বস্তু সমূহকে হারাম মনে করছি। এ চিন্তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কেননা, এতে ইসলামী শরীয়তকে অপূর্ণ মনে করা হয় যা আদৌ সত্য নয়। অতএব, এর অনুমতি দেয়া যায় না। কোন বস্তুকে নিজের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৭১-৭২

চিকিৎসার প্রয়োজনে বর্জন করা অন্যায় নয়; কিন্তু ইসলামী শরীয়ত সাধারণভাবে যে বস্তুকে হালাল ঘোষণা করেছে, তাকে হারাম মনে করা কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করা যায় না।[১]

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের দাবী হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা। যদি ঈমান আনার পর তথা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহকে ভয় না করা হয় তবে ঈমানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ উপস্থাপিত হয় না। তাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমরা যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছ, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকে ভয় করে চল। আর এটিই হবে তোমাদের ঈমানের প্রমাণ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۖ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۖ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

তরজমা

(৮৯) তোমাদের বাজে শপথের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে তোমরা যা সুদৃঢ় ভাবে বাঁধ তাতে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। এর কাফ্ফারা হল দশজন মিসকিনকে খাবার দান, যা তোমাদের পরিবারবর্গকে তোমরা দিয়ে থাক এর মধ্যম পর্যায়ের খাবার, অথবা দশজন মিসকিনকে পোষাক দান অথবা একটি গোলাম আজাদ করা। যদি কেউ কাফ্কারা আদায়ে সক্ষম না হয় তবে সে তিন দিন রোজা রাখবে। তোমরা যদি শপথ কর তবে তাই হবে তোমাদের শপথের কাফ্ফারা আর তোমাদের শপথ সযত্নে হেফাজত করো। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর বিধি-নিষেধ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা শোকর গুজার হও।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৮

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে যা আল্লাহ্ পাক হালাল করেছেন এমন উত্তম বস্তু হারাম না করার নির্দেশ ছিল। আর এ আয়াতে হালাল বস্তুকে গ্রহণ না করার শপথ যারা করে তথা যারা কসম খেয়ে বলে, "অমুক বস্তু আমি আর খাবনা" এমন কসমের ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াত সাহাবায়ে কেরামের সেই দলের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাদের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, তাঁরা কসম খেয়েছিলেন যে, সম্পূর্ণভাবে দুনিয়া ত্যাগ করবেন। যখন পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হয়,

لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা আমাদের কসম সমূহ সম্পর্কে কি করি? কেননা আমরা হালাল বস্তু সমূহকে হারাম করার শপথ গ্রহণ করেছি এবং পরস্পর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের বাজে শপথের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যে সব শপথ তোমরা সুদৃঢ় ভাবে গ্রহণ কর, সেগুলোর কথা আলাদা।

তফসীরকারগণ লিখেছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে পাকড়াও করার যে কথা রয়েছে তা আখেরাতের ব্যাপারে (যা তোমরা শক্ত করে বাঁধ)।

عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ

অর্থাৎ– সে সব কসম যা পূর্ণ করার শপথ গ্রহণ করা হয় এমন শপথ পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। যেমন অন্য আয়াতেও এ সম্পর্কে তাগিদ হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৪

আবদ এবনে হোমায়েদ সাঈদ এবনে যোবায়েরের (রঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যদি হালালকে হারাম করার শপথ গ্রহণ করা হয় তথা কসম করে বলা হয় অমুক হালাল বস্তু আমার জন্যে হারাম তবে এমন কসম বা শপথকে বাজে শপথ বলা হবে। এমন শপথ ভেঙ্গে কাফ্ফারা দেয়া কর্তব্য। এমন শপথের জন্যে আখেরাতে পাকড়াও করা হবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, চার ইমাম এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে কসম শুদ্ধ হওয়ার জন্যে কসম শব্দটি আল্লাহ্ পাকের নামের সাথে ব্যবহার করাও জরুরী। অথবা এমন ভাষা ব্যবহার করার দ্বারা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, যেমন তাঁর কসম করে বলছি যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ অথবা কসম তাঁর, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, অথবা যদি কেউ বলে আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের কসম, এ সমস্ত ভাষায় কসম করা হলে তা সত্যিই কসম হয়।

আল্লাহ্ পাকের কোন স্বীকৃত নামের সঙ্গেও যদি কসম খাওয়া হয় তবে তাও কসম হয়ে যায়।

মাসআলা

কোরআনে করীমের কসম যদি করা হয় তবে ইমামে আযম (রঃ) ব্যতীত অবশিষ্ট তিনজন ইমামের মতেই কসম হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম সাহেব বলেন, যেহেতু সাধারণত কোরআনের কসম খাওয়া হয় না সেজন্যে কোরআনের কসম বললে তা কসম হবে না। কিন্তু যদি কেউ (লা আমরুল্লাহ্) অথবা আইমুল্লাহ্ বলে তবে কসম হয়ে যাবে। এমনকি, কসমের নিয়ত করুক বা না করুক ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, এ শব্দগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে কসম হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ

যদি কেউ কা'বা শরীফ অথবা কোন নবীর নামে কসম খায় তবে ইমাম আহমদ (রঃ) ব্যতীত অন্য তিন জন ইমামের মতে কসম হবে না এবং কাফ্ফারাও হবে না। আর ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, নবীর নামে কসম করলে কসম হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং অন্যান্য ইমামের দলিল হলো, হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ যদি কসম করতেই হয় তবে আল্লাহর নামে কসম কর অথবা নীরব থাক। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর শপথ করল, সে শেরক করল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন হালাল বস্তুকে শপথ করে নিজের জন্যে হারাম বলে, তবে তা শপথ বা কসম হবে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, হালাল বস্তুকে হারাম বলে কসম করলে কসম হয় না। আমাদের দলিল হল এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের জন্যে মধুকে হারাম বলে কসম করেছিলেন, তার জবাব আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেনঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

অর্থাৎ– হে নবী! আল্লাহ পাক আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, তাকে আপনি কেন হারাম করে নিয়েছেন?

মাছআলা

যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাম অথবা তাঁর কোন গুণের উল্লেখ করে কসম করে আর এভাবে বলে যে আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছি তবে সর্বসম্মতি ক্রমে তা কসম হবে, যেমন কেউ বলল اَقْسَمْتُ بِاللّٰه অথবা বলল حَلَفْتُ بِاللّٰه এ দু'টি বাক্যেই অতীত কাল বোঝানো হয়েছে। আর যদি কেউ কসমের জন্যে এমন বাক্য ব্যবহার করে যা ভবিষ্যত কাল বোঝায়, এমন অবস্থায়ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে কসম হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ্‌র নাম বা কোন ছেফাত উল্লেখ করেনি কিন্তু কসম করেছে যেমন বলেছে, আমি কসম করছি বা আমি কসম খেয়ে বলছি, এমন অবস্থায় হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে কসম হয়ে যাবে। সে কসমের নিয়ত করুক বা না করুক।

ইমাম জাফর (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, যদি কেউ কসম শব্দটি বলে আল্লাহ্‌র কসমের নিয়ত করে, তবে কসম হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ্‌র কসমের নিয়ত না করে তবে ইসলামী কসম হবে না। কেননা, কসমের জন্যে ব্যবহৃত বাক্যে শরীয়ত বিরোধী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আর শরীয়ত বিরোধী কসম, কসম নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, শুধু কসম শব্দটি ব্যবহার করলে কসম হয় না। কসমের নিয়ত করুক বা না করুক। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্‌র নামে কসম করাই মুসলমানদের নিয়ম। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর কসম করা অবৈধ। এর একটি প্রমাণ হাদীস শরীফে আছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল এবং তা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি এ স্বপ্নটির তা'বীর করে

দেই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দান করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করলেন এবং আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি কি সঠিক তা'বীর দিয়েছি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ কিছু সঠিক, কিছু ভুল। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্র কসম করে বলি, আমার কি ভুল হয়েছে, তা আমাকে বলে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ এভাবে কসম করোনা।

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, এই হাদীসের ভাষা এভাবে রয়েছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাকে অবশ্যই বলুন, আমি কি ভুল বলেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ কসম খেয়োনা।

فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ

অর্থাৎ– এই কসমের কাফ্ফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

আলোচ্য আয়াতে "এতআম" শব্দটির অর্থ হল কোন ব্যক্তিকে খাবারের উপর অধিকার প্রদান করা। অর্থাৎ তাকে খাবারের মালিক বানিয়ে দেয়া। অথবা এভাবে যে, কোন ব্যক্তিকে খাবারের অনুমতি দেয়া। এজন্যে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন ঃ যদি সকাল সন্ধ্যা দু' বেলা পেট ভরে খাবার খাইয়ে দেয়া হয় আর মালিক না বানায় অর্থাৎ খাবার এভাবে দেয়নি যে, গ্রহীতা ইচ্ছা করলে সে বাড়ী নিয়ে যেতে পারে অথবা সেখানেই খেতে পারে তবে তা বৈধ যদি সে সামান্যও খায়।

ইমাম কারখী (রঃ) হাসান এবনে জেয়াদের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এমনি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন ঃ এ পর্যায়ে খাবারের মালিক বানিয়ে দেয়া জরুরী। ইচ্ছা করলে সে ব্যক্তি সমস্ত খাবার নিয়ে যাবে, অথবা কিছু অংশ খাবে, কিছু অংশ নিয়ে যাবে। কেননা, যাকাত এবং ফেতরায় মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত আর যাকাত এবং ফেতরার পরিমাণ সুনিদৃষ্ট যা মিসকীনকে প্রদান করা হয়। অতঃপর মিসকীন সে অর্থ দ্বারা যা ইচ্ছা করতে পারে। অতএব, কাফ্ফারার জন্যে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা–ও মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী যেন সে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে।

এতদ্ব্যতীত, কাফ্ফারা বাবদ দেয় অর্থের মালিক বানিয়ে তথা মিসকীনকে তা প্রদান করলে তার প্রয়োজন অধিক পরিমাণে পূরণ করা যেতে পারে। শুধু খাবার অনুমতি দিলে তার সকল প্রয়োজন পূরণ হয় না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ পবিত্র কোরআনে যাকাতের ব্যাপারে। اتو। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর সদকায়ে ফেতরের ব্যাপারে ।ادا। শব্দ ব্যবহার

করা হয়েছে। আর উভয়ের অর্থ হল যাকে যাকাত বা ফেতরা প্রদান করা হবে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। আর কাফ্ফারার ব্যপারে "এতআম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ খাবার দিয়ে দেয়া নয়; বরং খাবার গ্রহণের অধিকারী করা।

মাছআলা

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, একই মিসকীনকে দশ দিন খাবার প্রদান করা বৈধ। কিন্তু একদিনে একই ব্যক্তিকে দশবার খাবার দেয়া বৈধ নয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন যে, একই ব্যক্তিকে একই দিনে দশবার দেয়া কাফ্ফারা আদায়ের জন্যে যথেষ্ট নয়। কিন্তু একদিনে দশবার খাবার দেয়া হয় অর্থাৎ দশবার দশ ব্যক্তিকে যা খাবার দেয়া হয়, তার মালিক বানিয়ে দেয়া বৈধ।

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

অর্থাৎ কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ দশ দিন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে। তোমাদের পরিবারবর্গকে যে প্রকার খাবার দিয়ে থাক, ঠিক সে প্রকার খাবার দিতে হবে মিসকীনদেরকে। কিংবা দশ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের পোষাক দিতে হবে।

ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন ঃ যদি কাফ্ফারা স্বরূপ পোষাক প্রদান করা হয় তবে তা এতখানি হতে হবে যে, ঐ পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করলে, নামায সহীহ্ হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ এমনি অবস্থায় পুরুষের জন্যে একটি পায়জামা বা লুঙ্গী এবং একটি কোর্তা যথেষ্ট হবে। আর মেয়েদের জন্যে দু'টি পোষাক জরুরী হবে। একটি লম্বা কোর্তা আর একটি ওড়না।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, কাফ্ফারার পোষাক এমন হওয়া উচিত যা দ্বারা শরীরের অধিকাংশ স্থান ঢেকে রাখা যায়।

এবনে মরদবিয়া লিখেছেন ঃ হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি পবিত্র কোরআনে কাফ্ফারার পোষাক প্রদানের যে নির্দেশ রয়েছে, তার তাৎপর্য কি? তখন তিনি এরশাদ করেছেন, 'আবা' অর্থাৎ জুব্বা।

তেবরানী এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফরমানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কাফ্ফারা স্বরূপ প্রত্যেক মিসকীনের জন্যে একটি জুব্বা হওয়া উচিত।[১]

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২

অর্থাৎ কসমের কাফ্ফারার আরেকটি পন্থা হল গোলাম আজাদ করা। 'রাকাবা' শব্দটির অর্থ হল ঘাড়। "তাহরীরু রাকাবাতিন" শব্দের অর্থ হল ঘাড়-মুক্তি তথা গোলাম আযাদ করা। নারী হোক অথবা পুরুষ, মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম। কোন প্রকার গোলামকে আযাদ করলেই কাফ্ফারা আদায় হবে। এটি আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মাজহাব। ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে কাফেরকে আযাদ করা যথেষ্ট নয়; বরং যাকে আযাদ করা হবে সে মোমেন হতে হবে।

اَوْ অর্থাৎ অথবা

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে কাফ্ফারার বিবরণের ক্ষেত্রে اَوْ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, কাফ্ফারার যে তিনটি পন্থা বর্ণিত হয়েছে, তার যে কোন একটি নির্বাচন করার অধিকার কাফ্ফারা প্রদানকারীর রয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ যখন কাফ্ফারা সম্পর্কীয় এ আয়াত নাযিল হয় তখন হযরত হোজায়ফা (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ তিনটি পন্থার মধ্যে যে কোন একটি নির্দিষ্ট করার অধিকার কি আমাদের রয়েছে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমাদের অধিকার রয়েছে তোমরা পোষাক দিতে পার, খাবার খাওয়াতে পার আর যার এসব কিছুর সাধ্য না থাকে, তার জন্যে রয়েছে তিনটি রোজা রাখার ব্যবস্থা।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط

অর্থাৎ– কাফ্ফরা আদায়ের যে তিনটি পন্থা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তার কোন একটিও আদায়ের সামর্থ যদি কারো না থাকে, তবে তাকে তিনটি রোযা রাখতে হবে।

ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আবুশ শায়খ (রঃ)। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তির নিকট পঞ্চাশ দেরহাম থাকে, তাকে সামর্থ্যবান মনে করা হবে। অতএব, তার কর্তব্য হবে কাফ্ফারা আদায় করা। রোযা রাখা যথেষ্ট হবে না।

আর ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ)-এর মতে, যার নিকট বিশ দেরহাম থাকবে তাকেও সামর্থ্যবান মনে করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, গোলামের জন্যে কসমের কাফ্ফারা হল ৩ রোজা কেননা, সে সামর্থ্যবান নয়। তবে যদি ৩ রোজা শেষ হবার পূর্বেই তাকে মুক্ত করা হয় এবং তার নিকট সম্পদও আসে, তবে তার কাফ্ফারা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ন্যায় অর্থ সম্পদ দ্বারাই আদায় করতে হবে।

ঠিক এমনিভাবে যে দারিদ্র্য-পীড়িত, সে তার কসমের কাফ্ফারা দেবে তিনটি রোজা রাখার মাধ্যমে। কিন্তু রোজাব্রত পালন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি তার নিকট অর্থ সম্পদ আসে, তবে তাকে অর্থ সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমেই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ কাফ্‌ফারার জন্যে যারা রোজা রাখবে, তাদেরকে তিনদিন একাধারে রোজা রাখতে হবে এটি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর অভিমত। তবে ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, তিন দিন একাধারে রোজা রাখা জরুরী নয়।[১]

ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط

অর্থাৎ এটিই তোমাদের শপথের কাফ্‌ফারা জানবে, যখন তোমরা শপথ কর।

কসম সম্পর্কে বিধান

এখানে উল্লেখ্য, কোন ব্যাপারে কসম বা শপথ করলে যদি কসম ভঙ্গ করা হয়, তাহলেই কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হবে কিন্তু যদি কসম ভঙ্গ না করা হয়, তবে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নয়।

وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ

আর তোমরা তোমাদের শপথ সমূহের হেফাজত কর অর্থাৎ শপথকে ভঙ্গ করোনা। কসম বা শপথ মোতাবেক আমল কর যে বিষয়ে শপথ করা হয়েছে, তা যদি এবাদত বন্দেগী সম্পর্কীয় হয়, তবে তা আদায় করা কর্তব্য। কিন্তু কসম ভেঙ্গে দিয়ে কাফ্‌ফারা আদায় করা বৈধ কি না সে সম্পর্কে ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর অভিমত হল এই, কসম ভঙ্গ করা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হুকুমের বর খেলাফ। তাই কসম ভেঙ্গে কাফ্‌ফারা আদায় করা বৈধ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন ঃ কসমের বরখেলাফ কাজ না করা উত্তম কিন্তু যদি কসম ভেঙ্গেই ফেলা হয়, তবে কাফ্‌ফারা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হবে।

পক্ষান্তরে, যদি কোন পাপকার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কসম করা হয়, তবে কসম ভেঙ্গে কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, কসম ভেঙ্গে দেয়ার যে গুনাহ তা কাফ্‌ফারা আদায়ের মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু যদি গুনাহ করা হয় তবে তার পরিণতি দূরীভূত করার কোন পথ নেই। আর যদি কোন বৈধ বিষয় পরিত্যাগ করার কসম করা হয়, তবে কসম ভেঙ্গে কাফ্‌ফারা আদায় করা উত্তম। কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ– নিজেদের কসম সমূহকে নেক কাজের পথে বাধা স্বরূপ করোনা। এজন্যে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি কসম করে বলি কোন লোককে কিছু দেবনা। পরে আমার মত পরিবর্তন হয়, আমি দিয়ে দেই এবং কাফ্‌ফারায় ১০ জন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪

মিসকীনকে খাবার প্রদান করি যা খেজুর বা গম হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) কসম করে কোন সময় তা ভঙ্গ করতেন না কিন্তু যখন কাফ্‌ফারা সম্পর্কীয় এ আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অনুমতি কবুল করলাম। এখন যদি কোন ব্যাপারে কসম করি, আর কসম বিরোধী কোন বিষয় উত্তম মনে হয়, তবে তাই করব যা উত্তম হয়।[১]

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি কসমের সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ্ বলে, তবে তার কসম হবেনা, যদি সে কসমের বরখেলাফ কাজ করে, তবে তাতে কসম ভঙ্গ করা হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কসম করল এবং ইনশাআল্লাহ বলল তার উপর কসমের দায়িত্বও অর্পিত হবে না।

মান্নত মানার প্রসঙ্গ

যদি শর্তের সাথে মান্নত মানা হয়, আর তা পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সে মান্নত পূর্ণ করা একান্ত কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন ব্যক্তি বললঃ যদি রোগী সুস্থ হয় তবে আমি একটি রোজা রাখব। যখন রোগী সুস্থ হয়ে যাবে তখন একটি রোজা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি মান্নতের সঙ্গে এমন শর্ত পেশ করে যা পূর্ণ না করার ইচ্ছা থাকে, যেমন কেউ যদি বলেঃ যদি আমার এ কাজটি হয়ে যায়– তবে হজ্ব করা আমার কর্তব্য হবে। আমাদের ইমাম ছাহেবের মতে, যদি তার কাজ হয়ে যায় তবে হজ্ব করা কর্তব্য হবে।

অবশ্য ইমাম ছাহেবের তরফ থেকে অন্য একটি অভিমতও বর্ণিত আছে তা হল মান্নত পূর্ণ করে কাফ্‌ফারা আদায় করা যথেষ্ট হবে।

ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে এ ব্যক্তি মান্নত পূর্ণ ও করতে পারে অথবা কাফ্‌ফারাও আদায় করতে পারে। হযরত এমরান এবনে হোছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রোধের সময় মান্নত মানা হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন মান্নতের কাফ্‌ফারা কসমের কাফ্‌ফারা। (আহমদ ও নেছায়ী)

যদি এমন মান্নত মানা হয় যা পূর্ণ করা সম্ভব নয় যেমন কেউ বলল, আমি পদব্রজে হজ্ব করব অথবা বলল, আমি সর্বদা রোজা রাখব কিংবা মান্নত পুরো করা হলে গুনাহ হবে যেমন বলল, আমি আত্মীয়-স্বজনকে আর সাহায্য করব না অথবা রমজানে রোজা রাখব না। এসব মান্নতের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে এবং কসমের যে কাফ্‌ফারা, তা-ই হল এমন মান্নতের কাফ্‌ফারা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন অনিদৃষ্ট মান্নত মানল, অথবা কোন পাপ কার্যের মান্নত মানল, এসব কিছুর কাফ্‌ফারা হবে কসমের কাফ্‌ফারা।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াত সমূহ তথা শরীয়তের বিধান সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা তাঁর প্রদত্ত এ নেয়ামতের শোকর আদায় কর। আল্লাহ্ পাক এ আয়াত সমূহে যে এলম দান করেছেন, নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত। আর এ নেয়ামতের শোকর আদায় করা একান্ত কর্তব্য।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا
يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾ وَاَطِيْعُوا
اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

তরজমা

(৯০) হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী এবং পাশা (ভাগ্য নির্ণায়ক শর) অত্যন্ত ঘৃণ্য, মন্দ শয়তানী কাজ। অতএব, তোমরা এসব কাজ বর্জন কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

(৯১) শয়তানতো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের জিকর এবং নামায থেকে বিরত রাখতে চায়, তোমরা কি (এসব মন্দ কাজ থেকে) এখনও বিরত থাকবে না?

(৯২) আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি অনুগত হও এবং রসূলের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ কর এবং সতর্কতা অবলম্বন কর, যদি তোমরা ফিরে যাও তবে জেনে রেখ, সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়াই আমার রসূলের কর্তব্য।

(৯৩) যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তারা ইতিপূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্যে তাদের কোন অপরাধ নাই। যদি তারা ভবিষ্যতের জন্যে পরহেযগারী অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। পুনরায় ভয় করে এবং ঈমান আনে, আবার ভয় করে নেক আমল করে। আর আল্লাহ্ পাক নেককারদেরকে পছন্দ করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হালালকে হারাম মনে না করার নির্দেশ ছিল, আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, যেভাবে হালাল বস্তুকে হারাম মনে করা গুনাহ, ঠিক তেমনি হারাম বস্তুকে হালাল মনে করাও গুনাহ এবং হারাম। যেমন, মদ, জুয়া প্রভৃতি। মূলতঃ তদানীন্তন কালের আরবরা মদ এবং জুয়াকে হালাল এবং উত্তম মনে করত। এমনকি মদ, জুয়া ব্যতীত তাদের জীবন যাত্রা ছিল কল্পনাতীত। তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ এগুলো অত্যন্ত মন্দ, ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কাজ।[১]

বর্বরতার যুগে যে সব শয়তানী কাজ মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ করে রাখত, সে সব কাজকে আলোচ্য আয়াতে নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মদ্য পানের কারণে মানুষ মাতাল হয়, জ্ঞান বুদ্ধির ন্যায় নেয়ামত দূরে সরে যায় অথচ ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার একমাত্র পন্থা হল মানুষের বিবেক বুদ্ধি আর মদ্য পানের কারণে মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। জুয়া অর্থ সম্পদকে ধ্বংস করে। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে।

যখন কোন লোক জুয়ার কারণে তার অর্থ সম্পদ হারিয়ে ফেলে এবং তার অর্থ সম্পদ অন্যের কাছে দেখতে পায়, তখন শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে বর্বরতার যুগে আরবরা তীর নিক্ষেপ করে কাজ কর্মের ভাল-মন্দ বিচার করত শুভ-অশুভ হওয়ার কথা সিদ্ধান্ত করত, আর তারা প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলোকে পূজা করত। এসব মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শয়তান মানুষকে এসব মন্দ এবং নিন্দনীয় কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই আল্লাহ্ পাক এসব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার তাগিদ করেছেন।

পবিত্র কোরআনের সত্যতা নতুন করে অনুভূত হচ্ছে–

মদ্য পান এবং জুয়া সম্পর্কে হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব এমনকি, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্য ধ্বংস হয়। পবিত্র কোরআন সুদীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার

১। মদ ও জুয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৩০৬-১২

বছর পূর্বে এ সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছে, আজকের পৃথিবীর মানুষ এর সত্যতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এজন্যে চন্দ্র বিজয়ী সভ্যতার এ যুগে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, আধুনিক কালে পবিত্র কোরআনের সত্যতা নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। মদ্যপান এবং জুয়া যে মানুষের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, একথা পবিত্র কোরআন বহু পূর্বেই ঘোষণা করেছে। আজকের মানুষ এ ঘোষণার সত্যতা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এতদ্ব্যতীত আরো দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা হল– মদ্যপান এবং জুয়া মানুষকে আল্লাহর জিকর এবং নামায থেকে বঞ্চিত রাখে। আল্লাহ্র জিকর এবং নামাযই হল মানব জীবনের সাফল্যের সঠিক কর্মপন্থা। একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহ্র জিকর করে সে যেন জীবিত আর যে জিকর করেনা, সে যেন মৃত। ফলে মদ্যপান ও জুয়ার কারণে যারা আল্লাহর জিকর থেকে বঞ্চিত হয়, তারা যেন জীবন-মৃত। এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

(নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সে সব মোমেনগণ, যারা তাদের নামাযে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাযির হয়েছে।) অতএব, যারা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছে তাদের জীবনই সার্থক এবং সফলকাম হয়েছে।

পক্ষান্তরে, যারা নামায থেকে গাফেল হয়েছে, তাদের জীবন-সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মদ্যপান এবং জুয়া থেকে বিরত থাকার আদেশ প্রদানের পর এরশাদ করেছেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ মদ্যপান, জুয়া এবং অন্যান্য মন্দ কাজ থেকে তোমরা বিরত থাক, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। অতএব, এসব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই জীবন-সাধনা সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম হবে।

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ মদ্যপান, জুয়া, মূর্তিপূজা এবং পাশার ন্যায় ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ থেকে তোমরা কি বিরত হবে? এ আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন ঃ

انتهينا انتهينا

অর্থাৎ আমরা বিরত হয়েছি, বিরত হয়েছি।

বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন এ আয়াত শুনিয়ে দিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-কে, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন যে, আমরা এসব নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত হলাম। যারা ইতিপূর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, তারা এ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মদ্যপান থেকে বিরত হলেন এবং এ আদেশ শ্রবণ করা মাত্র মদের পাত্রগুলো ভেঙ্গে পথে ফেলে দেয়া হল এবং মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম জাতি মদের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেল।

বিস্ময়কর শৃংখলা

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবার কারণে মুসলিম জাতির মধ্যে বিস্ময়কর শৃংখলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টি হয়েছিলো। যারা সারা জীবন মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল, তারা মুহূর্তের মধ্যে নিন্দনীয় কাজ পরিহার করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করলেন এবং আল্লাহ্ পাক যে আদেশ দিয়েছেন, তা পালনে এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না।

এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিখ্যাত উর্দু কবি আকবর এলাহাবাদী বলেছেন ঃ

درفشاں نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
جو نہ تھے خود راہ پر غیروں کو ھادی بن گے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার মুক্তো ছড়ানোর মাধ্যমে বিন্দুকে সমুদ্রে পরিণত করেছেন, অন্তরকে করেছেন আলোকিত। আর বন্ধ চোখগুলোকে দিয়েছেন খুলে, ফলে যারা ছিল দিশেহারা তাদেরকে করেছেন দিশারী। সে দৃষ্টি কত শক্তিশালী ছিল, যার বরকতে মৃত শুধু জীবিতই হয়নি; বরং অন্য মৃতকে জীবিত করার শক্তিও পেয়েছে।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন ঃ যারা জুয়ায় অংশ গ্রহণ করত, তারা নিজেদের সমস্ত সম্পদ কখনো কখনো হারিয়ে ফেলত, তখন পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হত।

এখানে মূর্তি পূজা এবং পাশার কথা এজন্যে বলা হয়েছে যে, এগুলো মদ্যপানের ন্যায়ই হারাম বা অবৈধ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ "মদ্যপায়ী ব্যক্তি মূর্তি পূজকের ন্যায়"।

এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে মদ্যপায়ীর স্থলে "সর্বদা যে মর্দপান করে"– একথাটি রয়েছে।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

মদ্যপান, জুয়া এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং আল্লাহ্র রসূলের অনুগত হও। তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালন কর এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা কর এবং নাফরমানীর পরিণামকে ভয় কর। বাস্তব অবস্থা এই যে, যতক্ষণ মানব অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি যথাযথভাবে আনুগত্য প্রকাশ করাও সম্ভব হয় না।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

অর্থাৎ– যদি তোমরা আল্লাহ্ পাক এবং আল্লাহ পাকের রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হও তবে জেনে রেখ, আমার রসূলের কর্তব্য হল আমার বিধি-নিষেধ তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ্র বিধান মানা না মানা তোমাদের কাজ। তোমরা যদি আল্লাহ্র বিধান অমান্য কর, তবে তার শোচনীয় পরিণাম তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নেশা উদ্রেককারী বস্তু মাত্রই হারাম। যে বন্দা দুনিয়াতে নেশাকর বস্তু পান করবে, আল্লাহ্ পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, কেয়ামতের দিন তাকে "তিনাতুল খেবাল" পান করাবেন। আর তোমরা কি জান তিনাতুল খেবাল কি? তা হল দোযখীদের ঘাম। (বগভী)

মদ্যপায়ীর প্রতি লা'নত

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর লা'নত মদের ওপর, মদ্যপায়ীর ওপর, যে পান করায় তার উপর, যে বিক্রি করে তার ওপর এবং যে ক্রয় করে তার ওপর, যে ফলের রস বের করে তার ওপর, যে মদ তৈরী করে তার ওপর। আর যে মদ বহন করে তার ওপর। আর সে ব্যক্তির ওপর যার জন্যে মদ বহন করা হয়, আর যে এর মূল্য ভোগ করে তার ওপর।[১] (এবনে মাজা শরীফ)

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, আল্লাহ্ পাক ৪০ দিন তার নামায কবুল করেন না, যদি এরপর সে তওবা করে, তবে আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন, কিন্তু এরপরও যদি সে পুনরায় মদ্যপান করে, তবে ৪০ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক তার নামায কবুল করেন না, যদি এরপর সে তওবা করে, তবে আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন। যদি তৃতীয় বারও সে এ অন্যায় কাজ করে, তবে ৪০ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক তার নামায কবুল করেন না। কিন্তু এরপরও যদি সে তওবা করে, তবে তওবা কবুল করেন। চতুর্থ বারও যদি সে এমন অন্যায় কাজ করে, তবে ৪০ দিন তার নামায কবুল করেন না, এরপরও যদি সে তওবা করে, তবে তওবাও কবুল করেন না। আর খেবাল নামক নহরের পানি তাকে পান করাবেন। (নহরে খেবাল হল দোজখীদের দেহের ঘাম) (তিরমিযী নেসায়ী)

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ জান্নাতে যাবেনা পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়ারী, সর্বদা মদ্যপায়ী। (দারমী)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমতরূপে এবং পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন। আমার প্রতিপালক আমাকে গান-বাজনার সাজ-সরঞ্জাম, মূর্তি, ক্রুশ চিহ্ন এবং বর্বরতার যুগের যাবতীয় অন্যায় অনচারের মূলোৎপাটনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক তাঁর ইজ্জতের শপথ করে এরশাদ করেছেন ঃ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর যে মদ্যপান করবে, আমি তাকে কেয়ামতের দিন তৃষ্ণার্ত রাখব আর যে মদ্যপান বর্জন করবে, আমি তাকে জান্নাতের পবিত্র ঝর্ণা থেকে পান করাব।[১]

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সর্বদা মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্টকারী এবং যাদু টোনায় বিশ্বাস স্থাপনকারী বেহেশতে যাবেনা।

নেসায়ী এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আনসারদের দু'টি গোত্রের ব্যাপারে মদ্যপান হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তারা মদ্যপান করেছিলেন এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে পরস্পর ঘুষাঘুষি করেছিলেন। যখন নেশা দূর হল তখন নিজেদের অবস্থা দেখে বললেন, এটি অমুক ভাইয়ের কীর্তি অথচ ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-ভাব ছিলো, মদ্য পানের কারণেই নিজেদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব ও ধস্তাধস্তিতে মেতে ওঠেন। পরস্পরের মধ্যে মমত্ববোধের স্থলে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[২]

ইমাম রাযী (রঃ) লিখেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে মদ্যপান ও জুয়া সহ অন্যান্য পাপাচার থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূল

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু যারা এ আদেশ অমান্য করে তথা মদ্যপান ও জুয়া থেকে বিরত না হয়, তাদের জন্যে রয়েছে পরবর্তী বাক্যে বিশেষ সতর্কবাণী। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا

যদি তোমরা আল্লাহ্র আদেশ অমান্য কর, তবে জেনে রেখ রসূলের কর্তব্য হল তোমাদেরকে আল্লাহ্র হুকুম জানিয়ে দেয়া, তাঁর এ কর্তব্য পালনের পরও যদি তোমরা অবাধ্য হও, তবে তার ভয়াবহ পরিণাম তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ইমাম রাযী (রঃ)–এর ভাষায়–

هذا تهديد عظيم ووعيد شديد فى حق من خالف

অর্থাৎ যে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে এতে বিরাট এবং কঠিন সতর্কবাণী।[১]

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

শানে নুযুল

যখন মদ্যপান এবং জুয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হল, তখন সাহাবায়ে কেরামের মনে একটি প্রশ্ন জাগল, যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ইতিপূর্বে মদ্যপান করতেন এবং মদ্যপান হারাম হওয়া সংক্রান্ত এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই তারা এন্তেকাল করেছেন এমনকি, তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ওহোদের যুদ্ধে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ মদ্যপান করতেন, তাদের কি অবস্থা হবে? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন।[২] এরশাদ হয়েছে ঃ

জীবিত কিংবা মৃত যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখে এবং নেক আমল করে, কোন বস্তু নিষিদ্ধ হবার পূর্বে তথা জায়েয থাকা অবস্থায় যদি তারা তা ব্যবহার করে থাকে তবে তাদের কোন পাপ হবে না।

শরীয়তের বিধান একই দিনে এক সঙ্গে নাযিল হয়নি; বরং ২৩ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় শরীয়তের বিধান সমূহ নাযিল হয়েছে যুগে যুগে। যখন যে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮২
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড–১, পৃষ্ঠা-২৬৯
তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড–৪, পৃষ্ঠা-৪৫

অবস্থায় যে আদেশ জারী হয়েছে অথবা যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তখন সে অবস্থায় তা মেনে নেয়াই হলো মুসলমানের কর্তব্য। যারা এভাবে শরীয়তের বিধান যথাযথ ভাবে মেনে চলে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে আর আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, তারাই সত্যিকার পরহেযগার।

অতএব, শরীয়তের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে যদি কেউ কোন বস্তু ব্যবহার করে আর পরবর্তীতে তা হারাম ঘোষিত হয়, আর ঘোষণার পর সে তা মেনে চলে, তবে পূর্বের কর্মের জন্যে অপরাধ নেয়া হবে না। তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ

আলোচ্য আয়াতে تَقْوٰى (তাকওয়া) শব্দটি তিন বার ব্যবহৃত হয়েছে আর প্রত্যেক বারই স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বার অতীতের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বার ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তৃতীয় বার আল্লাহর বন্দাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন ঃ মদ্যপান সম্পর্কীয় এ প্রশ্নটি ঠিক এমনই, যেমন কেবলা পরিবর্তনের সময় প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিলো, যারা কেবলা পরিবর্তনের আদেশ জারী হবার পূর্বেই এন্তেকাল করেছেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই নামায আদায় করেছেন, তাদের কি অবস্থা হবে এ প্রশ্নের জবাবও আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে দিয়েছেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

(সূরা বাকারাহ)
(আর আল্লাহ্ পাক এমন নন যে তোমাদের বিশ্বাস নষ্ট করবেন।)

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল, অতীব দয়াময়"।[২]

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি খায়বর থেকে মদীনা শরীফে বিক্রয়ের জন্যে কিছু মদ নিয়ে আসে, মদীনা শরীফ পৌঁছার পর একজন মুসলমান বললেন ঃ মদ হারাম হয়ে গেছে, সে তখন ওসব একটি পাহাড়ের টিলার ওপর রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ হুজুর! শরাব কি হারাম হয়ে গেছে?

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮৩
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৯

তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বললঃ আমি কি এ মাল ফেরত দিতে পারি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ মদের মধ্যে ফেরত দেয়ার যোগ্যতা নেই। তখন লোকটি বলল, আমি কি এগুলো এমন লোককে দিতে পারি যে কিছু বিনিময় দিতে পারে? তিনি এরশাদ করলেন, না এর অনুমতি নেই। তখন লোকটি বলল ঃ আমার আশ্রয়ে কিছু এতিম রয়েছে, যাদের কিছু অর্থ মদের এ ব্যবসায় লাগানো হয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেলেন ঃ বাহরায়েন থেকে যখন রাজস্ব আসবে তখন তুমি আমার নিকট হাযির হয়ো, আমি তা থেকে তোমার এতিমদের জন্যে কিছু বিনিময় দান করব।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আমার আশ্রয়ে কিছু এতিম রয়েছে, তারা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু মদ পেয়েছে, (এগুলো এখন কি করব?) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ মদগুলো ফেলে দাও, সব ফেলে দাও। হযরত আবু তালহা (রাঃ) আরজ করলেনঃ আমরা এগুলো দ্বারা সিরকা বানিয়ে নেই? তিনি এরশাদ করলেনঃ না।

মদ্যপানের ক্ষতিকর দিক

হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে এক ওয়াক্তের নামায হারাল, সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল এমন যে, কোন লোকের নিকট সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ছিল আর তা সে ব্যক্তি থেকে ছিনিয়ে নেয়া হল। আর যদি কেউ নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে চার ওয়াক্তের নামায হারাল, আল্লাহ্ পাকের হক্ব হল এই যে, তাকে, 'তিনাতুল খেবাল' পান করান। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলঃ তিনাতুল খেবাল কি? এরশাদ হলোঃ দোযখীদের দেহ থেকে নিঃসৃত ময়লা।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত ওসমান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মদ্য পান থেকে আত্মরক্ষা কর কেননা, মদ্যপান হলো সমস্ত মন্দ কাজের মূল উৎস।

পূর্ব কালে একজন অত্যন্ত বড় এবাদত গুজার ব্যক্তি ছিলেন। একটি চরিত্রহীন নারী তার প্রেমে পড়লো। সে তার বাঁদীকে উক্ত আবেদ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করলো। বাঁদী এসে বললো, আমি আপনার নিকট এসেছি একটি বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আহবান করতে, আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন। আবেদ ব্যক্তি বাঁদীর সঙ্গে রওয়ানা হলো। বাঁদীটি একটি বড় মহলে প্রবেশ করল এবং একটির পর একটি দ্বার অতিক্রম করতে লাগলো এবং প্রত্যেকটি দ্বার রুদ্ধ করে সম্মুখে অগ্রসর হলো। অবশেষে একটি কক্ষে এসে দাঁড়ালো যেখানে একজন সুন্দরী মহিলা ছিল। ঐ মহিলার নিকট একটি ছোট শিশু ছিল। আর ছিল মদ। ঐ মহিলা বললঃ

আপনাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আনা হয়নি; বরং তিনটি কাজের যে কোন একটি কাজ আপনাকে অবশ্যই করতে হবে–

১. আমার সঙ্গে রাত্রি যাপন কর অথবা ২. মদ্যপান কর। অথবা ৩. এ শিশুটিকে হত্যা কর। আবেদ ব্যক্তিটি বলল ঃ যদি তোমার কাছে থেকে মুক্তি লাভের কোন পথ না থাক, তবে আমাকে মদ্যপান করিয়ে দাও (সে মদ্য পানকে অবশিষ্ট কাজ দু'টি থেকে কম ক্ষতিকর মনে করেছে) তাই তাকে মদ্য পান করানো হল। সে নেশাগ্রস্ত হলো, ঐ মহিলার সঙ্গে রাত্রি যাপন করলো, ঐ শিশুটিকেও হত্যা করল। তাই তোমরা মদ্যপান থেকে আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর শপথ! ঈমান এবং মদ একত্রিত হতে পারেনা। একটি আসলে দ্বিতীয়টি বিদায় নিতে বাধ্য। (নেসায়ী শরীফ)

وَّاَحْسِنُوْاؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"এবং তোমরা নেক কাজ করতে থাক, আর আল্লাহ্ পাক নেককারদেরকে ভালবাসেন"।

শুধু কোন কাজ করা আর অত্যন্ত ভালভাবে কাজটি করা তথা মনযোগ সহকারে, যত্ন সহকারে কাজ করা এক কথা নয়, আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ হলো ভাল কাজ করো, আর অত্যন্ত ভাল ভাবে করো। আর অত্যন্ত ভাল ভাবে সৎ কাজ করার একটি মানদন্ড হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ এহসানের তাৎপর্য কি? তিনি এরশাদ করেছিলেন,

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

এহসানের তাৎপর্য হলো এই, তুমি এভাবে আল্লাহ্ পাকের এবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি এমন অবস্থা হয় যে, তুমি দেখতে পাওনা, তবে একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। মনের এ অবস্থা নিয়ে তথা তন্ময় চিত্তে যে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করবে, তাকেই আল্লাহ্ পাক ভালবাসেন।

বস্তুতঃ সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাক ও তার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতে হয়। এ ঈমানের পরিপূর্ণতা আসে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে। এ ব্যপারে পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করে এহসানের উচ্চ স্তরে পৌঁছতে হয়, আর এ স্তরে যারা পৌঁছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর নৈকট্য-ধন্য করেন, তাই তাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তাঁরা হন আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বন্দা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ
قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًاۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ
ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

তরজমা

(৯৪) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ পাক একটি বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবেন, ঐ শিকারের ব্যাপারে যা তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক অবগত হতে চান, কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে? অতঃপর এরপরও যে সীমা লংঘন করবে, তার জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৯৫) হে মোমেনগণ! এহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার বধ করোনা, আর যে ইচ্ছাকৃত ভাবে তা বধ করবে, অনুরূপ জন্তু বদলা স্বরূপ তাকে দিতে হবে। তোমাদের দু' জন ন্যায়বান ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে, উক্ত জন্তু নিয়ায স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, অথবা এর কাফ্ফারা স্বরূপ ঐ শিকারীকে কয়েকজন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে। অথবা সমান সংখ্যক রোজাব্রত পালন করতে হবে। যেন সে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে, যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ্ পাক সে অপরাধ ক্ষমা করেছেন, আর যে সে অপরাধ পুনরায় করবে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতিশোধ নেবেন, আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মদ্যপান, জুয়া প্রভৃতি পরিহার করার নির্দেশ ছিল, আর এ আয়াতে বিশেষ সময়ে তথা হজ্জ্ব এবং ওমরার জন্যে এহ্রাম অবস্থায় হালাল জন্তু শিকার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হালাল জানোয়ারকে

শিকার না করার এ নির্দেশ সব সময়ের জন্যে নয়; বরং শুধু এহরাম অবস্থার জন্যে। কা'বা শরীফের প্রতি বিশেষ সম্মানার্থে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির এহরাম অবস্থায় এবং হরম শরীফ এলাকায় শিকার করা অবৈধ।

মোমেনদের পরীক্ষা

ষষ্ঠ হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ' সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। মক্কা শরীফ থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেররা তাঁকে বাঁধা দেয়, সেজন্যে কয়েকদিন তাঁকে সেখানে অবস্থান করতে হয়, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে মুসলমানদের পরীক্ষা করার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয় যে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা পশুগুলো মুসলমানদের হাতের নাগালে এসে, পড়ে। ইচ্ছা করলে ছোট ছোট জন্তুগুলোকে তাঁরা হাতেই ধরতে পারতেন এবং বড় জন্তুগুলোকে বর্ষা দিয়ে শিকার করতে পারতেন, কিন্তু পূর্বেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তোমরা এহরাম অবস্থায় কোন জন্তু শিকার করোনা। এটি ছিলো সে মুহূর্তে মুসলমানদের জন্যে সত্যিই এক কঠিন পরীক্ষা।

এ পরীক্ষায় আল্লাহ্ পাকের রহমতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের বরকতে সাহাবায়ে কেরাম উত্তীর্ণ হন। এ পরীক্ষার দৃষ্টান্ত হল– বনী ইসরাঈলের শনিবারে মৎস্য শিকারের ঘটনার অনুরূপ। আইলাবাসী বনী ইসরাঈলের জন্যে প্রতি শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে মৎস্য গুলো শনিবার তাদের হাতের নাগালে এসে পড়ত, তারা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ্ পাকের এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, যার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা আল্লাহ্ পাকের কোপগ্রস্ত হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।[১]

যাহোক, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে এহরাম অবস্থায় শিকার না করার নির্দেশ দিয়েছেন। পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের উপরে বিশেষ দয়া করে এ পরীক্ষা সম্পর্কে পূর্বেই এ আয়াত দ্বারা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-(১)।

(হে মোমেনগণ! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান শিকারের ব্যাপারে, যখন তোমাদের হাত এবং বর্শার নাগালে রয়েছে শিকারের জন্তু।)

বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে প্রচুর পরিমাণ শিকার মওজুদ ছিল, ইচ্ছা করলেই ধরা যায় বা বর্ষার আঘাতে বধ করা যায়, কিন্তু আল্লাহ্-ভীরু সাহাবায়ে কেরাম আত্মসংযমের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁরা যথাযথভাবে পালন করেছেন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ। পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক এ পরীক্ষার কারণ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ج

অর্থাৎ আল্লাহ পাক জানতে চান তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। এতে কোন সন্দেহ নেই, পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবই আল্লাহ্ পাকের জানা, সবই তাঁর নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই, প্রশ্ন হল, "আল্লাহ্ পাক জানতে চান কে তাঁকে না দেখে ভয় করে"-একথার তাৎপর্য কি? তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ঃ এর অর্থ হল বন্দা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক যা জানেন, কার্যতঃ তার বহিঃপ্রকাশ হওয়া অর্থাৎ কোন ঘটনা ঘটার পূর্বে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ওয়াকেফহাল থাকেন, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের এই এলমের কারণে বন্দার প্রতি সওয়াব বা আযাব কিছুই হয় না। যখন বন্দার মাধ্যমে সে আমল কার্যকর হয়, শুধু তখনই ভাল কাজ হলে সওয়াব আর মন্দ কাজ হলে শাস্তি নির্ধারিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে 'গায়ব' শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে (১) আল্লাহ্ পাককে না দেখে কে ভয় করে। (২) আল্লাহ্র আযাবকে না দেখার পূর্বে কে তাঁকে ভয় করে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন এহ্রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে কে আত্মসংঘমের পরিচয় দিতে পারে আর কে পারে না।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন ঃ ছোট ছোট শিকারগুলোকে সেদিন মানুষ স্বহস্তেই ধরতে পারত আর বড়গুলোকে তীর ও বর্শা দিয়ে শিকার করা অতি সহজ ছিল। বস্তুতঃ হাতের কাছে লোভনীয় শিকার পেলে লোভ সংবরণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়। আল্লাহ্ ভক্ত সাহাবায়ে কেরাম এ কঠিন কাজটিই করেছেন। মোকাতেল এবনে হাইয়ান (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাহমের ওমরার সফরে এ আয়াত নাযিল হয়। যখন জংলী জন্তুগুলো এবং অনেক পাখী মুসলমানদের নিকট ভিড় জমিয়ে ছিলো, এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য ইতিপূর্বে আর কোন দিন দেখা যায়নি কিন্তু আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, এহ্রাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ, যাতে করে প্রকাশ্যে একথা প্রমাণিত হয় যে, কে আল্লাহ্ পাকের অনুগত আর কে অবাধ্য। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

(নিশ্চয় যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং উত্তম বিনিময়।)[১]

فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

অর্থাৎ এরপরও যে সীমা লংঘন করে, তার জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হবার পরও যারা তা অমান্য করবে এবং এ সামান্য জিনিসের প্রতি লোভ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে না পারবে, তাদের জন্যে রয়েছে এই শাস্তির ঘোষণা।

আল্লামা বগভী লিখেছেন ঃ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবুল ইয়াসর নামক এক ব্যক্তি একটি জংলী জন্তু শিকার করে মেরে ফেলেছিলো, তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ط

(হে মোমেনগণ! তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকারকে হত্যা করোনা, সেই শিকারের গোশ্ত হালাল হোক অথবা না হোক।)

এহরাম অবস্থায় যা হত্যা করা যায়

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) صيد শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। অবশ্য যে সব জন্তু এহরাম অবস্থায় হত্যা করা বৈধ, সেগুলোর কথা স্বতন্ত্র। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এবং বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি জিনিস ফাসেক, এহরাম অবস্থায়ও সেগুলো হত্যা করা যায়। কেননা, এ জন্তুগুলো মানুষের জন্যে কষ্টদায়ক।

(১) কাক (২) চিল (৩) বিচ্ছু (৪) ইঁদুর এবং (৫) যে কুকুর মানুষকে কাঁমড় দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এ পাঁচটি জন্তু হত্যা করলে মোহরেমের গুনাহ হবেনা।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৮

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা যেমন অবৈধ, ঠিক তেমনি শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করে অন্যকে শিকার করতে সাহায্য করাও বৈধ নয়।

কোন ব্যক্তি এহ্‌রাম অবস্থায় যদি শিকার করে তবে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মতে, তার গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ নয়। মোহ্‌রেম হোক বা গায়ের মোহ্‌রেম। কেননা, মোহরেম যে জন্তুকে জবেহ্‌ করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম মৃত জন্তুর ন্যায়।

এখানে আরো উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি এহ্‌রাম অবস্থায় নেই, সে যদি শিকার করে কিন্তু মোহরেম তাকে শিকার করতে বলেছিলো, অথবা আকার–ইঙ্গিতে শিকারীকে পথ প্রদর্শন করেছিলো, এমন অবস্থায় মোহ্‌রেমের জন্যে সেই শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া হারাম। কিন্তু যে এহ্‌রাম অবস্থায় নেই, তার জন্যে হালাল।

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا

আর তোমাদের মধ্যে যে এহ্‌রাম অবস্থায় জেনে শুনে শিকারকে বধ করবে; তবে অনুরূপ জন্তু তাকে বদলা স্বরূপ দিতে হবে। তোমাদের দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি তার ফয়সালা করে দেবে, আর এ জন্তুকে নেয়ায স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের, দাউদ, আবু সওর, আবু মুঞ্জের শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর কথা হল (জেনে শুনে) শব্দটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ ভুলে অথবা নিজের এহরামের কথা ভুলে গিয়ে কিংবা কারো দ্বারা বাধ্য হয়ে এহরাম অবস্থায় শিকারকে হত্যা করে, তবে আয়াতে উল্লেখিত কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

মুজাহেদ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে বদলা দেয়ার যে আদেশ রয়েছে তা তখন ওয়াজিব হবে, যখন কেউ ইচ্ছা করে জেনে শুনে শিকারকে হত্যা না করে, আর যখন নিজের এহ্‌রামের কথা ভুলে যায়, তখন বদলা হিসেবে জন্তুকে কা'বা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। কিন্তু যদি এহ্‌রামের কথা কারো মনে থাকে, তবে এর কোন কাফ্‌ফারা নেই। বদলা হিসেবে কোন জন্তুকে কা'বা শরীফ পর্যন্ত প্রেরণ করলেও অপরাধের ক্ষতিপূরণ হবে না; বরং এ ব্যক্তির ব্যাপার আল্লাহ্‌ পাকের হাতে সোপর্দ থাকবে। আল্লাহ্‌ পাক ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর রহমতে ক্ষমাও করতে পারেন।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এবং চার ইমামের মতে, যদি এহ্‌রাম অবস্থায় শিকারকে হত্যা করে, জেনে শুনে হত্যা করুক অথবা নিজের এহ্‌রামের কথা ভুলে গিয়ে হত্যা করুক– যে কোন অবস্থায় নিয়ায স্বরূপ কা'বা শরীফ পর্যন্ত একটি জন্তু অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

ইমাম জুহরী (রঃ) বলেছেন ঃ যে ইচ্ছা করে জেনে শুনে শিকার হত্যা করে, তার উপর বদলা প্রেরণ যে ওয়াজিব, তা পবিত্র কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। আর যে এহ্‌রামের কথা ভুলে গিয়ে শিকারকে হত্যা করে, তার উপর বদলা হিসেবে জন্তু প্রেরণ করা ওয়াজিব– একথা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

মাছ্‌আলা

কোন ব্যক্তি শিকার করতে চায় এমন অবস্থায় কোন মোহরেম মুখে অথবা হাতে ইশারা করে শিকার দেখিয়ে দিল আর যাকে দেখানো হল, সে শিকারকে হত্যা করল। এমন অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর নিকট সেই মোহরেমের কর্তব্য হবে এর বদলা স্বরূপ কা'বা শরীফ পর্যন্ত কোন জন্তু প্রেরণ করা। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, এহরাম অবস্থায় শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে, তবে বদলা প্রেরণ করা তার কর্তব্য হবেনা।

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

অর্থাৎ (যে জেনে শুনে ইচ্ছা করে এহরাম অবস্থায় কোন শিকার বধ করে) তাকে অনুরূপ জন্তু বদলা স্বরূপ দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য, যদি এহরাম অবস্থায় কেউ শিকার ধরে তবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে তা ছেড়ে দেয়া ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। আর যদি তা সে বধ করে ফেলে, তবে দু'জন অভিজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য, ন্যায়বান ব্যক্তি নিহত শিকারের যে মূল্য নির্ধারণ করবেন, সে মূল্যের জন্তু কা'বা শরীফের নিকট হারাম শরীফের সীমার মধ্যে পৌঁছিয়ে জবেহ করতে হবে। কেউ কোরবানী করলে সে নিজেই তার গোশ্‌ত খেতে পারে, কিন্তু কাফ্‌ফারার উদ্দেশ্যে যে জন্তু প্রেরিত হয়, তার গোশ্‌ত প্রেরণকারী খেতে পারবেনা। অথবা ঐ জন্তুর মূল্যের পরিমাণ খাদ্য–শস্য অনাথ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করবে, অথবা দারিদ্র্য–পীড়িত মানুষকে দেয় ঐ পরিমাণ দানের অনুপাতে ততদিনের রোজা রাখবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের مثل এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল শিকারের যে জন্তুটিকে বধ করা হয়েছে তার মূল্যের সমান হতে হবে কোররানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত জন্তুর মূল্য।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতাংশে ব্যবহৃত مثل শব্দটির অর্থ হল গৃহপালিত পশু যা সৃষ্টিগত ভাবে শিকার করা জন্তুর ন্যায় হবে যথা– ছাগল, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি।

ইমাম বায়হাকী একরামার সূত্রে লিখেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল, এহরামের অবস্থায় আমি

একটি খরগোষ মেরে ফেলেছি, এ অবস্থায় আপনি আমাকে কি আদেশ দিচ্ছেন? হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, খরগোষ চারটি হাত পা দিয়ে চলে, আর বকরীর ছানাও চারটি হাত পা দিয়ে চলে, খরগোষ গাছের পাতা খায়, আর বকরীর ছানাও সবুজ পাতা খেয়ে অভ্যস্ত। অতএব, তুমি খরগোষের বদলা বকরীর ছানা দিয়ে দাও।

এবনে আবি শায়বা আতা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এক ব্যক্তি একটি কবুতর আর কবুতরের দু'টি বাচ্চাকে ঘরে আবদ্ধ রেখে আরাফাত এবং মিনা গমন করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন, কবুতর ও তার দু'টি বাচ্চা মরে গেছে। সে ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) ঘটনা শ্রবণ করে বললেনঃ তিনটি বকরীর কোরবানী দিতে হবে।

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ কাফ্‌ফারার জন্তুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হবে দু'জন জ্ঞানী, ন্যায়বান মুসলমানের উপর। শিকারের যে জন্তু বধ করা হয়েছে, তার কাফ্‌ফারা স্বরূপ বয়তুল্লাহ শরীফে তথা হরম এলাকায় যে জন্তু প্রেরিত হবে তা কেমন হবে, কোন্ জন্তুর অনুরূপ হবে অথবা কত দামের জন্তু হওয়া উচিত- তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে দু'জন বুদ্ধিমান ন্যায়বান মুসলমানের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। শুধু এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তাদের অন্যতম ব্যক্তি কি স্বয়ং শিকারী হতে পারে?

এ পর্যায়ে ইমাম মালেক (রঃ)-এর অভিমত হল না, এজন্যে যে, যার ঘটনা তাকে বিচারক বানানো যায়না আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, স্বয়ং শিকারী অন্যতম বিচারক হতে পারে।

এবনে আবি হাতেম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন ঃ একবার একজন গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং বললেন, আমি এহরাম অবস্থায় একটি জন্তু শিকার করেছি, এখন এর কাফ্‌ফারা কি হবে? সে মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পাশে হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তাই হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে কি অভিমত? এ সময় গ্রাম্য ব্যক্তিটি বললেন ঃ আপনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খলিফা, এজন্যে আমি আপনার নিকট এসেছি, আপনি আমার ব্যাপারে অন্যের নিকট কেন জিজ্ঞাসা করেন?

হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি এতে আপত্তি কেন কর? আল্লাহ পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেনঃ দু'জন ন্যায়বান মুসলমান একত্রিত হয়ে কাফ্‌ফারার ব্যাপারে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তাই আমি আমার সাথীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। আমরা যে বিষয়ে একমত হব তা তোমাকে জানিয়ে দেব। হযরত আবু বকর (রাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, এ ব্যক্তি দু'জন ন্যায়বান বিচারকের উপর কাফ্ফারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে অবগত নয়, তাই সে এমন আপত্তি জানিয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত বিনম্র ভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলেন।

এবনে জরীর (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত এবনে যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা একবার হজ্জে রওয়ানা হই, ফজরের নামাযের পর আমরা একটু পদব্রজে চলতাম এবং পরস্পর কথা বলতাম। ঘটনাক্রমে একদিন একটা হরিন দেখা গেল। আমাদের এক সাথী হরিনটিকে লক্ষ্য করে একটি পাথর নিক্ষেপ করল, হরিনটি মারা গেল। এ ব্যক্তি হরিনটিকে মৃত অবস্থায় রেখে সওয়ারীর উপর আরোহন করে রওয়ানা হল। আমি আপত্তি করলাম, আমি মক্কা শরীফ পৌঁছে বিষয়টি খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট পেশ করলাম।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অন্য এক ব্যক্তি বসা ছিলেন, সুন্দর, সুপুরুষ। তিনি ছিলেন হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি যে হরিনটিকে মেরেছ, ইচ্ছা করে না ভুলে? সে বলল পাথরটি আমি ইচ্ছা করে মেরেছিলাম, কিন্তু তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলোনা। হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন, এর অর্থ হল ইচ্ছা এবং ভুল– এ দু'য়ের মাঝে তোমার কাজটি হয়েছে। অতএব, তুমি একটি বকরী জবেহ কর আর তার গোশ্‌ত সদকা কর এবং তার চামড়াটি তোমার ঘরের কাজে ব্যবহার করতে পার।

هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ

অর্থাৎ– শিকারের জন্তু হত্যা করার কারণে কাফ্ফারা হিসেবে যে জন্তু প্রেরিত হবে, তা কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এখন প্রশ্ন হল কাফ্ফারার জন্যে যে জন্তু প্রেরণ করা হবে তা কি মক্কা শরীফের বাইরে থেকে ক্রয় করা জরুরী? নাকি মক্কা শরীফ থেকেই ঐ জন্তু ক্রয় করে কোরবানী করা যথেষ্ট হবে? ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, বাইরে থেকে জন্তু ক্রয় করে প্রেরণ করতে হবে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, বাইরে থেকে জন্তু ক্রয় করে প্রেরণ করা জরুরী নয়; বরং জরুরী হল হরম শরীফ এলাকার ভেতর কোরবানী করা। হরম শরীফ এলাকার বাইরে কোরবানী করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

বিদায় হজ্জের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফে তশরীফ আনলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যারা পূর্বাহ্নে কোরবানীর জন্তু প্রেরণ করে দিয়েছে, তারা হজ্জের আরকান আহকাম পুরো করার পূর্বে এহরাম খুলবেনা।

আর যারা কোরবানীর জন্যে জন্তু প্রেরণ করেনি; তারা কা'বা শরীফে তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার দৌড়ের পর চুল কাটিয়ে এহ্রাম খুলে দেবে, এরপর হজ্জের এহ্রাম বাঁধবে এবং হজ্জের কাজ সুসম্পন্ন করে কোরবানী করবে। আর যে কোরবানীর জন্যে জন্তু না পায়, সে রোজা রাখবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য, কোরবানীর জন্তুর গোশ্‌ত শুধু মক্কা শরীফের অধিবাসী ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, নাকি অন্য স্থানেও তা বিতরণ করা যাবে? অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, মক্কা শরীফের অধিবাসী ফকির-মিসকীনদের মধ্যেই বিতরণ করতে হবে। অবশ্য আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এ মতে, মক্কা শরীফের মধ্যেই কাফ্‌ফারার গোশ্‌ত বিতরণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই; বরং মক্কার ভেতরের এবং বাইরের ফকীরদের মধ্যেও বিতরণ করা যেতে পারে।

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ

অর্থাৎ পূর্বে যে কাফ্‌ফারার কথা এরশাদ হয়েছে তা দেয়া যেতে পারে অথবা মিসকীনদের মধ্যে খাবারও বিতরণ করা যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতাংশের শুরুতে أَوْ রয়েছে, এর অর্থ হল অথবা। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এহ্রাম অবস্থায় শিকার বধ করার অপরাধে যে কাফ্‌ফারা দিতে হবে তা তিন প্রকার হতে পারে-

১. মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অনুরূপ পশু কোরবান করা,

২. মিসকীনদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করা অথবা

৩. রোজা রাখা।

لِّيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ ط

অর্থাৎ কাফ্‌ফারার এ বিধান এজন্যে প্রবর্তন করা হয়েছে, যেন অপরাধী তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে।

عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط

অর্থাৎ- অতীতে এ পর্যায়ে যে অপরাধ হয়েছে তা আল্লাহ্ পাক মাফ করলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অথবা ইসলাম গ্রহণের পর। কিন্তু-

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط

কেউ যদি পুনরায় এ অপরাধ করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে শাস্তি দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিয়ম ছিলো, কোন ব্যক্তি এহরাম

অবস্থায় শিকার করলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেনঃ এই প্রথম এমন অন্যায় করেছ? যদি সে বলত এই প্রথম এ অন্যায় হয়েছে, তখন তিনি উপরোক্ত তিনটি পন্থার যে কোন পন্থায় কাফ্ফারা আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আর যদি সে বলত, ইতিপূর্বেও এমন অন্যায় সে করেছে, তবে তিনি কাফ্ফারা আদায়ের কোন আদেশ দিতেন না; বরং আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ মোতাবেক বলতেন, আল্লাহ্ পাক তোমার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবেন। এরপর তার পৃষ্ঠদেশে অথবা বক্ষদেশে স্বহস্তে আঘাত দিতেন। (বগভী)

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করতে থাকবে, আল্লাহ্ পাক তাকে শাস্তি দেবেন, প্রতিশোধ নেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় একটি শিকার করলো, তাকে কাফ্ফারা আদায়ের শাস্তি দেয়া হল। লোকটি পুনরায় একই অপরাধ করল, তখন আসমান থেকে অগ্নি অবতরণ করল, তার প্রতি বিদ্যুৎ নিক্ষিপ্ত হল, তাকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল। বস্তুতঃ এটিই ছিলো আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রতিশোধ এবং পবিত্র কোরআনের ঘোষণার বাস্তবায়ন।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۚ
ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّٰهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾ إِعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾

তরজমা

(৯৬) তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার এবং খাবার হালাল করা হলো। তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্যে, আর তোমরা যতক্ষণ এহরাম অবস্থায়

থাকবে, ততক্ষণ স্থলভাগের শিকার তোমাদের জন্যে হারাম করা হলো। আর সেই আল্লাহকে ভয় করে চল, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

(৯৭) পবিত্র কা'বা গৃহ, পবিত্র মাস, কোরবানীর জন্তু যা কা'বা শরীফে নেয়াজ স্বরূপ প্রেরিত হয় ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্ পাক মানুষের কল্যাণের জন্যে নির্ধারিত করেছেন, যেন তোমরা জানতে পার যা কিছু আসমান এবং জমীনে রয়েছে, সবই আল্লাহ্ পাক জানেন এবং আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

(৯৮) জেনে রেখো, আল্লাহ্ পাক শাস্তি প্রদানে যেমন অত্যন্ত কঠোর, তেমনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

(৯৯) আল্লাহ্ পাকের বাণী পৌঁছানোই রসূলের কর্তব্য। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর ও গোপন কর, আল্লাহ্ পাক তা সবই জানেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে সামুদ্রিক জীব মোহরেমের জন্যে হালাল।

এহরাম অবস্থায় তোমাদের জন্যে সাগরের শিকার তথা মৎস্য শিকার হালাল করা হয়েছে, শুধু শিকার করাই নয়; বরং তা খাওয়াও মোহরেমের জন্যে হালাল করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এখানে صَيْدُ الْبَحْرِ শব্দের অর্থ হল সমুদ্র থেকে যা জীবিত অবস্থায় ধরা হয়েছে। আর যে মাছ ধরা হয়নি, শিকার করা হয়নি; বরং সাগর তাকে ডাঙ্গায় ফেলে দিয়েছে, আলোচ্য আয়াতে তাকেই طَعَامُ الْبَحْرِ বলা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেনঃ এ শব্দটির অর্থ হল– যা কিছু সমুদ্র বক্ষে রয়েছে তাকেই 'তোয়ামুল বাহর' বলা হয়েছে। একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) ভাষণ দিলেন যে, সাগরের শিকার তথা মাছ তোমাদের জন্যে হালাল, আর যা শিকার করা হয়নি, সমুদ্র নিজেই যা মৃত অবস্থায় ডাঙ্গায় ফেলে দিয়েছে, তা-ও তোমাদের জন্যে হালাল।

একবার হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট আবদুর রহমান এ প্রশ্ন করলেন, সমুদ্র অনেক মৃত মাছ ডাঙ্গায় ফেল দেয়– আমরা কি তা খেতে পারি?

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন, 'না, খেয়োনা'। এরপর তিনি বাড়ী চলে গেলেন এবং পবিত্র কোরআন খুলে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج

অর্থাৎ– তোমাদের সুবিধার্থেই এবং ভ্রমণকারীদের প্রয়োজনেই এ অনুমতি প্রদান করা হল। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) প্রশ্নকারীকে বললেনঃ

সমুদ্রের নিক্ষিপ্ত মৃত মৎস্য গুলো তোমরা খেতে পার। কেননা, আল্লাহ্ পাক সমুদ্রের বস্তুকে 'তোয়াম' বা খাবার আখ্যা দিয়েছেন।

এবনে জরীর আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'তোয়াম' (খাবার) শব্দটির অর্থ বলেছেন– এর দ্বারা সমুদ্রের মৃত মৎস্য গুলোকে বোঝানো হয়েছে। একরামা (রঃ) বলেনঃ যারা সমুদ্রের তীরে থাকে, তারা এ মাছগুলোকে তাজা অবস্থায় শিকার করে, আর যেগুলো মরে যায় সেগুলোকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

ইমাম মালেক (রঃ) হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমুদ্র তীরের দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, তাঁদের সেনাপতি ছিলেন হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ)। তাঁদের সংখ্যা ছিলো তিনশ'।

বর্ণনাকারী বলেন যে, আমাদের রসদ শেষ হয়েছিলো, তখন আবু ওবায়দা (রাঃ) আদেশ দিলেন, রসদ হিসেবে যার কাছে যা আছে একত্রিত কর। এরপর প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর দেয়া হতো, অবশেষে তা-ও শেষ হয়ে গেল, আমরা সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছলাম। এদিকে খাদ্যের অভাবে মৃত্যু যেন ঘণিয়ে আসল, আমরা লক্ষ্য করলাম, সমুদ্রের তীরে বিরাট এক মাছ পাহাড়ের টিলার ন্যায় পড়ে আছে, আমরা (তিনশ' জন) তা থেকে সুদীর্ঘ তের দিন যাবত খেলাম। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ঐ মাছের পাঁজরের দু'টি হাড়কে এক সাথে করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার নীচ দিয়ে একজন মানুষ উষ্ট্রের ওপর আরোহন করে চলে গেল।

এ বৃহদাকার মৎস্যটির নাম 'আম্বর' বলা হয়েছে। এটি পাওয়ার পর আবু ওবায়দা (রাঃ) বললেন, এটি মৃত। তবে আমরা তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রেরিত লোক এবং ক্ষুধার কারণে অস্থির। অতএব, এর গোশ্‌ত তোমরা খাও। আমরা যখন সেখান থেকে রওয়ানা হই, তখন ঐ মাছের কিছু অংশ শুকিয়ে সঙ্গে নিয়েছিলাম।

মদীনা মোনাওয়্যারায় পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ বিষয়টি আরয করলাম। তিনি এরশাদ করলেন, এটি ছিলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে রিয্‌ক। যদি তোমাদের নিকট তার কিছু অংশ থাকে তবে আমাদেরকে খাবার হিসেবে দাও। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মাছের তোহ্‌ফা পেশ করলাম। তিনি তা আহার করলেন।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করল, আমরা সমুদ্রে সফর করি। আমাদের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২২
তফসীরে মাজহারী খন্ড–৪, পৃষ্ঠা-৪৬

সঙ্গে সামান্য পানি থাকে। যদি ঐ পানি দ্বারা অজু করি তবে পিপাসায় কষ্ট পাব। এমন অবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা অজু করতে পারি? তিনি এরশাদ করলেনঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র। সমুদ্রের মৃত মাছ হালাল। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সামুদ্রিক শিকারের ব্যাখ্যা

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'সাইদুল বাহার' (সমুদ্রের শিকার) শব্দের অর্থ হল, সমুদ্রের সেই প্রাণী যা সমুদ্রের বাইরে এসে জীবিত থাকেনা।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ 'সাইদুল বাহর' বা সামুদ্রিক শিকার বলতে সেই শিকারকে বলা হয়, যাকে সমুদ্রে শিকার করা হয়। আর 'তোয়ামুল বাহর' বা সামুদ্রিক খাবার বলতে তাকেই বোঝানো হয় যাকে সমুদ্র নিজেই ডাঙ্গায় ফেলে দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথা হল–'তোয়ামুল বাহর' বা সামুদ্রিক খাবার হল তা– যাকে সমুদ্রের পানি মৃত অবস্থায় ডাঙ্গায় নিক্ষেপ করে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), সাঈদ এবনে মুসাইয়াব (রঃ), একরামা, কাতাদা, নখঈ এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সামুদ্রিক শিকার হল যা তাজা ধরা হয়, আর সামুদ্রিক খাবার হল তা যাতে লবন দিয়ে দেয়া হয়।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

কেউ যেন একথা মনে না করে যে, শুধু হজ্বের জন্যেই হয়ত মৎস্য শিকারকে হালাল করা হয়েছে; বরং সকলের জন্যে তথা যারা কোন স্থানের অধিবাসী বা মুসাফির প্রবাসী সকলের জন্যেই এ অনুমতি, যাতে করে মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত ভোগ করতে পারে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যেভাবে সমুদ্রের মাছ শিকার করা, খাওয়া মুহরেম ও গায়ের মুহরেম-সকলের জন্যে হালাল, ঠিক তেমনি পুকুরের মাছও সকলের জন্যে হালাল। এহরাম অবস্থায় এর শিকার করা বা খাওয়াতে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই।

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

আর এহরাম অবস্থায় স্থল ভাগের শিকার তোমাদের জন্যে হারাম করা হল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, স্থল ভাগের শিকার খাওয়া মুহরেমের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। এমনকি, যদি এমন লোক শিকার করে যে মুহরেম নয়, আর মুহরেম শিকার করার আদেশ দেয়নি, শিকারের ব্যাপারে এহরাম অবস্থায় কোন সাহায্যও করেনি বা শিকারের প্রতি কোন প্রকার ইশারাও

করেনি, আর মুহরেমের উদ্দেশ্যেও শিকার করা হয়নি, সকল অবস্থায়ই মুহরেমের জন্যে শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া হারাম। এ অভিমত হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), তাউস (রঃ) এবং সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কিন্তু এ ব্যপারে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একমত যে, যে এহরামের অবস্থায় নেই, যদি এমন ব্যক্তি শিকার করে তবে মুহরেমের জন্যে সেই খাবার হালাল। হাদীস শরীফে এসেছে যে, স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এমন শিকারের গোশ্‌ত খেয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে খাবার অনুমতি দিয়েছেন।

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাও এরশাদ করেছেন, এই (শিকারের) গোশ্‌ত যা অবশিষ্ট রয়েছে তা তোমরা খেয়ে নাও। সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা নিজেও খেয়েছেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, মাআজ এবনে আবদুর রহমান এবনে ওসমান তাইমীর পিতা আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, আমরা এহরাম অবস্থায় হযরত তালহা এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। হযরত তালহা (রাঃ)-কে একটি শিকার করা পাখী হাদীয়া স্বরূপ পেশ করা হয়। তিনি তখন নিদ্রিত ছিলেন। আমাদের মধ্যে কেউ তা খেয়েছেন কেউ বিরত রয়েছেন, এমন সময় তালহা (রাঃ) জাগ্রত হলেন এবং যারা খেয়েছেন, তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন এবং বললেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়েও শিকার খেয়েছি।

আমর এবনে সালমা জামিরী বাহজীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে এহরাম অবস্থায় ছিলেন, রওহা নামক স্থানে পৌঁছে দেখলেন, একটি জবেহ্ করা জন্তু পড়ে আছে যা জখমী ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, জন্তুটিকে এভাবেই থাকতে দাও, হয়তো যে শিকার করেছে সে আসবে।

একটু পরেই বাহজী নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হল, সে-ই এ জন্তুটিকে শিকার করে। বাহজী আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ শিকারটির ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তা কার্যকর করুন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, এর গোশ্‌ত বিতরণ কর। আদেশ মোতাবেক হযরত আবু বকর (রাঃ) কাফেলার লোকদের মধ্যে গোশ্‌ত বিতরণ করে দিলেন।

মাছআলা

যদি মোহরেম ব্যক্তির জন্যে গায়ের মোহরেম ব্যক্তি শিকার করে, তবে কি করনীয়?

হযরত ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, গায়ের মোহরেম ব্যক্তির শিকার করা জন্তুর গোশ্‌ত সকলের জন্যে বৈধ। এমনকি, যার জন্যে শিকার করা হয়েছে সে

মোহরেমও খেতে পারে। ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, যদি মোহরেমের জন্যে গায়ের মোহরেম ব্যক্তি শিকার করে, তবে কারো জন্যেই হালাল নয় এমনকি, গায়ের মোহরেম ব্যক্তির জন্যেও নয়।

আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর অভিমত হল, যদি গায়ের মোহরেম ব্যক্তি মোহরেম ব্যক্তির জন্যে শিকার করে, এহরাম বাঁধার পূর্বে শিকার করুক বা পরে– কোন অবস্থাতেই মোহরেমের জন্যে তা খাওয়া বৈধ নয়। অবশ্য যে মোহরেম নয়, সে খেতে পারে। আর এমন মোহরেমও খেতে পারে যার উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়নি। হযরত ওসমান (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

এবনে আমর বর্ণনা করেন, আমি মোকামুল উরজ হযরত ওসমান এবনে আফফান (রাঃ)-কে দেখলাম, গরমকাল ছিলো, তিনি এহরাম অবস্থায় ছিলেন, চাঁদর দিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকা ছিলো। কিছুক্ষণ পর শিকারের গোশ্ত তাঁর সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি সাথীদেরকে বললেন, তোমরা খাও। আরজ করা হল, আপনি খাবেন না? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার জন্যে শিকার করা হয়েছে, এ কারণে আমার জন্যে হালাল নয়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, গায়ের মোহরেমকৃত শিকারের গোশ্ত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খেয়েছেন, আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি শিকারের গোশত খাননি এবং ফেরত দিয়েছেন। এ দু'টি পরস্পরবিরোধী মন্তব্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসেই গোশ্ত খেয়েছেন যা গায়ের মোহরেম ব্যক্তি নিজের জন্যে শিকার করেছিলো। তিনি সে গোশ্ত খাননি, যা তাঁর জন্যে অথবা অন্য কোন মোহরমের জন্যে শিকার করা হয়েছিলো।

আল্লমা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, যদি গায়ের মোহরেম শিকার করে থাকে, তবে তার গোশ্ত মোহরেম–গায়ের মোহরেম সকলের জন্যে বৈধ। কিন্তু উত্তম হল– মোহরেম যেন তা না খায়। তাই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সময় সেই গোশ্ত খেয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তা খাওয়া বৈধ, আর এক সময় না খেয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তা না খাওয়া উত্তম।[১]

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাঁর নিকট অবশেষে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। মানব মনে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড–৪, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

যখন এ ভয় জাগ্রত হয় তখনই তার পক্ষে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। ইমাম রাযী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল– প্রতিটি মানুষের জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা যেন সে সর্বদা আল্লাহ্ পাকের অনুগত থাকে, তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ

"আল্লাহ্ পাক পবিত্র কাবা গৃহ, পবিত্র মাস, কোরবানীর জন্যে কা'বা শরীফে প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এহরাম অবস্থায় শিকারকে এবং হরম শরীফ এলাকায় শিকার করা হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এতে হরম শরীফ এলাকায় পশু-পক্ষীর নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, হরম শরীফ শুধু পশু-পক্ষীর জন্যেই নিরাপদ স্থান নয়; বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যে রয়েছে এখানে নিরাপত্তা। আর এটি হল দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ লাভের নিদৃষ্ট স্থান। আর এর একমাত্র কারণ সেখানে রয়েছে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ।[১]

সারা বিশ্বের মুসলমানকে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে হয়। কেবলা সহীহ্ না হলে নামাযও সহীহ্ হয় না। হজ্ব ও ওমরা পালনের জন্যে হাযির হতে হয় পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে। হজ্ব ও ওমরার কারণে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ হাযির হয় পবিত্র মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়। এতদ্বারা মক্কাবাসী আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। এমনিভাবে, পবিত্র মক্কা শরীফে শুধু মানুষই নয়; বরং পশু–পক্ষী পর্যন্ত নিরাপদ জীবন যাপন করে।

এমনকি, বর্বরতার যুগেও যখন মারামারি হানাহানি অতি সাধারণ ব্যাপার ছিলো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি হরম শরীফে বা হরমের সীমায় কেউ তার পিতার হত্যাকারীকেও দেখতো, তবু তাকে কিছু বলা হতোনা। এটি ছিলো কা'বা শরীফের সর্বোচ্চ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ।[২]

মক্কা শরীফে আছে পাহাড়–পর্বত, আছে মরু প্রান্তর। কোন কিছু উৎপন্ন হয় না কিন্তু যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী, টাটকা ফল-মূল ও জীবন যাত্রার সর্বপ্রকার উপকরণ বিপুল পরিমাণে সেখানে সর্বদা পাওয়া যায়। কোথা থেকে কিভাবে এসব কিছু আসে তা কল্পনাতীত। মানুষের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্ পাক কি করেন তার এক জীবন্ত নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় পবিত্র মক্কা শরীফে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৯৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১০০

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এ পবিত্র স্থানকে আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের কেন্দ্র রূপে তৈরী করেছেন। আর এজন্যেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবও হয়েছে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়। অতএব, কা'বা শরীফের যে মহিমা এবং মর্যাদা রয়েছে তা বর্ণনাতীত।

কা'বা নামকরণ

কা'বা শরীফকে কা'বা এজন্যে বলা হয়, যে কোন চতুঃস্কোণ ঘরকে আরবরা কা'বা বলে।

মোকাতেল (রঃ) বলেন, যেহেতু কা'বা শরীফ পৃথিবীর অন্যান্য ঘর থেকে স্বতন্ত্র, তাই তাকে কা'বা বলা হয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উঁচু হওয়ার কারণে তাকে কা'বা বলা হয়। কেননা, কা'বা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, উঁচু হওয়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ পাক কা'বা শরীফকে অতি সম্মানিত এবং বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন এবং এখানে সকলের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।[১]

পৃথিবী কতদিন টিকে থাকবে

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কা'বা শরীফের অস্তিত্বই নিখিল বিশ্বের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। যতদিন পৃথিবীতে কা'বা শরীফ ও কা'বা শরীফের সম্মানকারী থাকবে, ততদিনই এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকে থাকবে। যখন আল্লাহ পাক বিশ্বের এ বিরাট কারখানা বন্ধ করার ইচ্ছা করবেন, তখন কা'বা শরীফকে সরিয়ে নেবেন। যেভাবে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করা হয়েছে, যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ–الاية

অর্থাৎ– সর্বপ্রথম ঘর যা মানব জাতির উপকারার্থে নির্মিত হয়েছে তা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবস্থিত।

ঠিক যেভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঠিক তেমনি বিলোপ সাধনের ব্যাপারও কা'বা শরীফ দ্বারাই শুরু করা হবে। অর্থাৎ কা'বা শরীফ তুলে নেয়ার পরই সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করা হবে। অতএব, যতদিন পৃথিবীতে কা'বা শরীফ আছে, ততদিন পৃথিবী আছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১০

কা'বা শরীফের সংরক্ষণ

এ পর্যায়ে আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেনঃ যেভাবে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রনায়ক বা সরকার নিজের রাজধানী ও রাজ প্রাসাদ সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করে এবং এ উদ্দেশ্যে হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, তবু রাজধানী ও রাজ প্রাসাদে দুশমনের প্রবেশাধিকার দেয়না; ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাক যতদিন ইচ্ছা করবেন, কা'বা শরীফ সংরক্ষিত থাকবে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না। কা'বা শরীফের কোন প্রকার ক্ষতি করার সাধ্য কারোই হবে না।

ইয়েমেনের আবরাহা বাদশাহ কা'বা শরীফ ধ্বংসের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো, আল্লাহ পাক কিভাবে আবাবিল পাখি দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন তা সর্বজন-বিদিত। এ ঘটনা ইতিহাস বিখ্যাত। পবিত্র কোরআনের সূরা ফীলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সর্বাধিক বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কা'বা শরীফের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু সর্বদা সকল শয়তানী চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এটি যে পবিত্র কা'বা শরীফের বিশেষ মহিমা এবং এক অলৌকিক ও জীবন্ত নিদর্শন– একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

যেভাবে কোন সরকার বা রাষ্ট্র প্রধান তার রাজ প্রসাদে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে চান, তখন সাধারণ শ্রমিক দ্বারাও এ কাজ নেয়া হয়। ঠিক তেমনি যেদিন আল্লাহ পাক পৃথিবীকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি কা'বা শরীফকে সরিয়ে নেবেন, আর এতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা। ইমাম বোখারী (রঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস সংকলন করেছেন যে, কেয়ামতের পূর্বে "যুচ্ছওয়ী কাতাইন" নামক এক ব্যক্তি কা'বা শরীফের একটি পাথর উঁপড়ে ফেলবে।

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ

অর্থাৎ সম্মানিত মাস সমূহ, তা হল চারটি, রজব, জিলক্বদ, জিলহজ্জ্ব এবং মহররম। আল্লাহ্ পাক এ চারটি মাসকে সম্মানিত মাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আরবরা এ চার মাস লড়াই করতো না। এ সময়কে নিরাপত্তার সময় মনে করা হতো। অন্য সময় ভ্রমণ নিরাপদ ছিলোনা, কিন্তু এসব মাসে লোকেরা নিরাপদে ভ্রমণ করতো, ব্যবসা-বাণিজ্য করতো এবং রুজী রোজগারে ব্যস্ত হতো। এমনিভাবে কোরবানীর উদ্দেশ্যে যে জন্তু প্রেরিত হত, সেগুলোরও সম্মান করা হত।

আর যে সব জন্তুকে কণ্ঠাভরণ পরিয়ে প্রেরণ করা হত, সেগুলোও শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হত, কেউ এগুলোর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করতো না। কেননা, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মানুষের অন্তরে কা'বা শরীফের যে মাহাত্ম সৃষ্টি হয়েছে,

তারই ফলশ্রুতিতে এসব কিছুর সম্মান এবং মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে আল্লাহর ঘরে হাযির হওয়ার ইচ্ছা করে, অথবা যা কিছু আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়, সবই নিরাপদ থাকে কেননা, পবিত্র কা'বা শরীফ হল নিরাপদ স্থান, আর ঐ চার মাস হল নিরাপদ সময়।

ذٰلِكَ

অর্থাৎ এহরাম সম্পর্কীয় যে বিধি-নিষেধ ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে, তা এজন্যে যেন তোমরা জান যে আল্লাহ্ পাক আসমান জমিন তথা নিখিল বিশ্বের একমাত্র অধিপতি, পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। মানুষের উপকারের প্রতি এবং মানুষের দুনিয়া আখেরাত–উভয় জাহানের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি এসব বিধি–নিষেধ জারী করেছেন। কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার পূর্বেই সতর্ক করা এবং সতর্কতামূলক বিধি-নিষেধ জারী করা মহান আল্লাহ্ পাকের অন্তহীন এলমের জীবন্ত নিদর্শন। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (রঃ) লিখেছেনঃ আরববাসীর অবস্থা এই ছিলো যে, তারা হত্যা লুটতরাজে অভ্যস্ত ছিলো। পরিণামে সাধারণ মানুষ তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্যে বের হতে পারত না। আল্লাহ্ পাক দয়া করে তাদের অন্তরে পবিত্র কা'বা শরীফের মাহাত্ম এবং আজমত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর সম্মানিত মাস সমূহের সম্মান ঘোষণা করেছেন। ফলে কা'বা শরীফ যে স্থানে রয়েছে সে স্থান নিরাপদ হয়েছে, আর যে সময়ের সম্মানের কথা ঘোষিত হয়েছে, সে সময়ও নিরাপদ হয়েছে এবং মানুষ তার রুজি রোজগারের সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। এটি আল্লাহ্ পাকের একান্ত দয়া মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেহেতু মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত, তাই তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

কিন্তু যারা এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। কেননা, আল্লাহ্ পাকের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আর একথাও তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা ১০১-১০২

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ্ পাক একই সঙ্গে তাঁর কঠিন শাস্তির কথা এবং তাঁর দয়া মায়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এর তাৎপর্য এই–

الايمان بين الخوف والرجاء

অর্থাৎ ঈমান হল ভয় এবং আশার মাঝে। আল্লাহ্ পাকের আযাবকে ভয় করে পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। আর তাঁর দয়া মায়ার কথা স্মরণ করে নেক আমল করতে হবে। এখানে নিরাশার কোন স্থান নেই। আল্লাহ্ পাক নিজেই এরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।) এর পাশাপাশি একথাও সত্য যে, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করবে এবং আল্লাহর নাফরমানী অব্যাহত রাখবে, তাদের জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তি রয়েছে।

আবুশ্ শেখ হযরত হাসান (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে শাস্তির আয়াতের সঙ্গে রহমতের আয়াত এবং রহমতের আয়াতের সঙ্গে শাস্তির আয়াতও নাযিল করেছেন, যাতে করে মোমেনের অন্তরে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি হয়।[১]

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্র রহমত এবং ভয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র রসূলের দায়িত্ব হল মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। তিনি তৌহিদের আহ্বান জানিয়ে তাঁর রেসালতে বিশ্বাস করার দাওয়াত দিয়ে তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন, তাঁর দায়িত্ব শেষ। তিনি দায়মুক্ত, এখন দায়িত্ব বর্তায় তোমাদের উপর। হে বিশ্ব মানব! তোমরা যদি আল্লাহর বিধান মেনে চল, তবে তাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। দুনিয়া ও আখেরাত– উভয় জাহানে তোমরা লাভ করবে শান্তি ও ও কল্যাণ। পক্ষান্তরে, তোমরা যদি আল্লাহর বিধান অমান্য কর, তবে তোমাদের জন্যে তাঁর শাস্তি অবধারিত। মনে রেখো, আল্লাহ পাক তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবগত। তাঁর নিকট সব কিছুই প্রকাশ্য। অতএব, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا
عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ
تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ
قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ
وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ
وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ
اِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

তরজমা

(১০০) (হে রসূল!) বলো ভাল ও মন্দ এক সমান নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

(১০১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করোনা যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। পবিত্র কোরআন অবতরণের সময় তোমরা যদি এমন বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করেছেন আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব সহনশীল।

(১০২) তোমাদের পূর্বেও একদল লোক তা জিজ্ঞাসা করেছিল, পরে কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

(১০৩) 'বহীরা', 'সায়েবা,' 'ওসীলা' এবং 'হাম' আল্লাহ পাক স্থির করেন নাই। কাফেররাই বরং আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা রটনা করেছে। তাদের অধিকাংশই বিবেক বুদ্ধি রাখেনা।

(১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ্ পাক যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে আস, তখন তারা বলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে যার উপর পেয়েছি আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা কিছুই জানত না এবং তারা হেদায়েতও লাভ করে নাই।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

ওয়াহেদী হযরত যাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদ্যপান হারাম হওয়ার কথা বললেন তখন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার ব্যবসাই হলো মদের। আমি এর দ্বারাই সম্পদ উপার্জন করেছি। যদি এ সম্পদ থেকে আমি কিছু আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করি তবে আখেরাতে আমি কি সওয়াব লাভ করবো?

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্ শুধু পবিত্র রোজগারই কবুল করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথার সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

ভাল মন্দ এক সমান নয়

উত্তম-অধম, পাক-নাপাক, হালাল-হারাম তথা ভাল ও মন্দ কোন অবস্থাতেই এক সমান নয়। যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সামান্য পরিমাণ হালাল বস্তু প্রচুর পরিমাণ হারাম বস্তু থেকে অতি উত্তম। একখানি হাদীসে রয়েছে, সামান্য বস্তু যা যথেষ্ট হয় তা অতি উত্তম এমন প্রচুর বস্তু থেকে যা মানব মনকে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে গাফলতের আবর্তে নিপতিত করে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে আরো একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সা'লাবা এবনে হাতেবোল আনসারী (রাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ পাক আমাকে অনেক ধন-সম্পদ দান করেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ সামান্য সম্পদ যার জন্যে তুমি আল্লাহ্র শোকর আদায় কর তা তোমার জন্যে উত্তম, সেই অধিক সম্পদ থেকে যার জন্যে শোকর আদায় না কর। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। হারাম ও অবৈধ সম্পদ থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও। হালাল রিয্ককে যথেষ্ট মনে কর। যদি এ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কর তবে হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, এ কথার মর্মার্থ এই, মানুষের কর্তব্য হলো নেক আমল করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, হালাল সম্পদ গ্রহণ করা এবং হারাম পরিত্যাগ করা। তিনি আরো বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে পাক নাপাক বা ভাল ও মন্দ কোন অবস্থাতেই এক সমান নয়;

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৪

যদিও মন্দের আধিক্য তোমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। এখলাস তথা আন্তরিকতার সঙ্গে সামান্য আমলও এখলাস ব্যতীত অনেক আমলের চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে প্রচুর হারাম অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেয়ে আল্লাহর রাহে সামান্য হালাল অর্থ ব্যয় করা অতি উত্তম।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি তার হালাল রোজগার থেকে একটি খেজুরের কিছু অংশ আল্লাহর রাহে দান করে, আল্লাহ্ পাক তার সে দান কবুল করেন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর ডান হস্তে তা গ্রহণ করেন এবং সে দানকে বাড়াতে থাকেন। যেভাবে তোমরা তোমাদের বকরী ছানার গায়ে হাত দিয়ে তাকে বাড়াতে থাক, অবশেষে সেই খেজুরের টুকরাটি বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের সমান হয়ে যায় (সমস্ত হাদীসের কিতাবে সংকলিত)।

হযরত সাহাল এবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্ব অতিক্রম করে গেল। অন্য একজন লোক তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে অতিক্রমকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? লোকটি জবাব দিল ইয়া রসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ ব্যক্তি শরীফ, যদি কোথাও সে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করে তবে তার পয়গাম গ্রহণ করা হবে, যদি কারো জন্যে সে সুপারিশ করে তবে তার সুপারিশ কবুল করা হবে। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন।

এরই মধ্যে আরেক ব্যক্তি সে পথ দিয়ে অতিক্রম করলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সেই সাহাবী আরজ করলেন ঃ হুজুর! ইনি একজন দরিদ্র মুসলমান। যদি কোথাও বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন, তবে কবুল করা হবে না। যদি কারো সুপারিশ করেন তবে গ্রহণ করা হবে না। যদি কিছু বলেন তবে শ্রবণ করা হবে না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ পূর্ববর্তী লোকদের দ্বারা যদি সারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে যায় তবু তাদের সকলের চেয়ে এ ব্যক্তি উত্তম।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক যেন তোমরা পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার। আর নেক আমল যত কমই হোক এবং পবিত্র সম্পদ যত সামান্যই হোক, অপবিত্র প্রচুর সম্পদ থেকে অতি উত্তম, তাই তা গ্রহণ কর।

يَاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানগণ! পরহেযগারী অবলম্বন কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ ভাল ও মন্দ এক সমান হতে পারেনা, এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম কাজ হলো স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, আর সবচেয়ে মন্দ কাজ হলো আল্লাহর মা'রেফাত থেকে মূর্খতা এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা বা আল্লাহর বিদ্রোহী হওয়া। যেভাবে আল্লাহ্ পাকের অনুগত হলে তার উপকার সর্বাধিক, ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হলে তার ক্ষতিও সর্বাধিক। অতএব, দু'টি বিষয় কোন অবস্থাতেই এক সমান হতে পারে না। তাই আয়াতের শেষাংশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, শুধু এভাবেই তোমাদের জীবন-সাধনা সার্থক হবে, তোমরা হবে সফলকাম।[২]

শানে নুযুল

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ

আহমদ, তিরমিযী এবং হাকেম হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে এবং এবনে জরীর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবু উমামার (রাঃ) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

(আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ্ব করা মানুষের কর্তব্য।)

তখন একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! হজ্জ্ব কি প্রত্যেক বছর ফরজ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তরে নীরব রইলেন। উক্ত সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! হজ্জ্ব কি প্রত্যেক বছর ফরজ? তিনি এরশাদ করলেন, না যদি আমি হ্যাঁ বলতাম তবে হজ্জ্ব প্রত্যেক বছর ওয়াজিব হয়ে যেত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ৭০-৭১
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১০৩-০৪

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমার কি আশংকা হলোনা যে তোমার প্রশ্নের জবাবে আমি "হ্যাঁ" বলে দিতে পারি। আর যদি আমি "হ্যাঁ" বলে দিতাম তবে প্রত্যেক বছর হজ্জ্ব ওয়াজিব হয়ে যেত, আর যদি প্রত্যেক বছর হজ্জ্ব ওয়াজিব হতো, তবে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। মনে রেখো, আমি যদি কোন বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু না বলি, তোমরাও সে বিষয়ে প্রশ্ন করোনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নিকট প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট অনেক বেশী প্রশ্ন করতো, আর তাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। আমি যদি কোন বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করি তবে যথাসাধ্য তা পালনের চেষ্টা কর। আর যদি আমি কোন বিষয়ে তোমাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি তবে তোমরা তা থেকে বিরত থাক। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী দু' রুকুতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধি-নিষেধে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ রয়েছে, আর এ আয়াতে অপ্রয়োজনীয়, অহেতুক প্রশ্ন না করার আদেশ রয়েছে। আয়াতের মর্মবাণী হলো এই, ইতিপূর্বে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহর দ্বীনের তবলীগ করাই রসূলের দায়িত্ব। শরীয়ত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা। অতএব, যে সব বিষয় শরীয়ত প্রকাশ্যে কোন আদেশ জারী করে নাই, সে সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয় নয়। যে ভাবে শরীয়তের প্রতিটি নির্দেশ হেদায়েতের কারণ হয়, ঠিক তেমনি কোন বিষয়ে শরীয়ত যদি নীরবতা পালন করে, তবে তা মানুষের জন্যে আল্লাহর রহমত এবং এর মধ্যে মানুষের জন্যে থাকে আসানী।

অতএব, যখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে বিধি-নিষেধ নাযিল হয়, তখন এমন অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা আদৌ সমীচীন নয়। কেননা, এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে এমন কোন জবাব যদি আসে যার উপর আমল করা তোমাদের জন্যে কঠিন হয়, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? অবশ্য একথা সত্য যে, রেসালতের যুগের পর যদি এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তবে তা হবে গবেষণা ও অনুসন্ধানের ব্যাপার, তাতে ক্ষতির আশংকা নেই।[২] পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবীগণকে অনেক অবান্তর প্রশ্ন করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আঃ)-কে গাভী সম্পর্কে অনেক অহেতুক প্রশ্ন করে কাজকে নিজেদের জন্যেই কঠিনতর করে দিয়েছে।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭২
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১১
৩। এ সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৫৫

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা জিজ্ঞাসা করোনা যার উপর আমল করা তোমাদের জন্যে কঠিন হয়। যেমন প্রত্যেক বছর হজ্জ্ব সম্পর্কীয় প্রশ্ন।

এবনে জরীর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এ প্রশ্নকারী ছিলেন আকাসা এবনে মোহসিন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এভাবে প্রশ্ন করোনা যে, এ বিষয়টি বৈধ কি অবৈধ? আর এ কাজটি করবো কি করবো না? বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেন তার উপর আমল কর। আর যা না বলেন তা মাফ হয়েছে মনে কর। আর যদি প্রত্যেক ব্যাপারে তোমরা প্রশ্ন কর এবং তার জবাব আসে তবে শরীয়ত সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং তোমরা আমলও করতে পারবে না।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন যে, এর অর্থ হলো হে ঈমানদারগণ! ঈমানের দাবী হলো এই, তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আদব রক্ষা কর এবং আল্লাহ্ পাকের বিধানের ব্যাপারে অগ্রগামী হয়োনা তথা এমন অহেতুক প্রশ্ন করোনা, যদি সে প্রশ্নের জবাব তোমাদেরকে দেয়া হয় তবে তোমাদের জন্যে তা ক্ষতিকর হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্যবিহীন অহেতুক প্রশ্ন করা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে আদবের খেলাফ। অতএব, তোমরা এমন প্রশ্ন করোনা, বিশেষতঃ যখন পবিত্র কোরআন নাযিল হচ্ছিল, তখন এমন প্রশ্ন করলে হয়তো যে জবাব আসবে তা কোন কঠিন আদেশ হবে, যার উপর আমল করার সাধ্য তোমাদের থাকবে না অতএব, এমন প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا

অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমরা যে অবান্তর প্রশ্ন করেছ আল্লাহ্ পাক তা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন প্রশ্ন আর করোনা।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

আর মনে রেখো, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব সহনশীল। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং যদি তোমাদের তরফ থেকে কোন বাড়াবাড়ি হয় তবে তার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি প্রদান করেন না।

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ

তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এমন প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু এ প্রশ্নের জবাবে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা অমান্য করার কারণে তারা কাফের হয়েছে। যেমন বনী

ইসরাঈলকে যখন গাভী জবেহ করার আদেশ দেয়া হয়, আদেশ মোতাবেক গাভী জবেহ করলেই কাজ হতো কিন্তু তারা গাভীর বিস্তারিত বিবরণ জানতে চেয়ে অনেক অবান্তর প্রশ্ন করলো। পরিণামে তাদের এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন হয়েছিল। সামুদ সম্প্রদায় হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট পাহাড় থেকে একটি উষ্ট্রী বের করার দরখাস্ত করেছিল।

এমনিভাবে কিছু লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট এ আবেদন করেছিল যে, আসমান থেকে যেন তাদের জন্যে খাবার অবতীর্ণ হয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে তখন যে নবী ছিলেন তাঁর নিকট বনী ইসরাঈল এ দাবী করেছিল যে, আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন। আমরা তার পতাকাতলে সমবেত হয়ে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যখন বাদশাহ নিযুক্ত করা হলো, তখন বনী ইসরাঈলের একদল জেহাদ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহ্ পাকের আদেশ অমান্য করে কাফের হলো।

হযরত আবু সালাবা খসনী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক কিছু ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং শরীয়তের বিধানের জন্যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমরা এমন প্রশ্ন করোনা, যা দ্বারা ঐ সীমা লঙ্ঘন করা হয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন। কিছু লোক একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এভাবে প্রশ্ন করেছে যে, তিনি এ কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন এবং ঐ অবস্থায় মিম্বরে তশরীফ নিয়েছেন এবং বলেছেন, আজ তোমরা যে বিষয় সম্পর্কেই আমার নিকট প্রশ্ন করবে আমি সকলের প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট ভাষায় দেব। একথা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মাথায় চাদর রেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এক ব্যক্তি যে তার বংশীয় সূত্র তার পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে যুক্ত করতো, সে আরজ করলো ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা কে? তিনি এরশাদ করলেন, হোজায়ফাহ। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেনঃ আল্লাহ পাক আমাদের পরওয়ারদেগার। ইসলাম আমাদের জীবন বিধান এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। আমরা এ কথার উপর সন্তুষ্ট। আমরা সকল ফেৎনা থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আজকের দিনের মত দিন ভাল ও মন্দ উভয় দিক থেকে আমি আর কোন দিন দেখিনি। আজকে আমার দৃষ্টি শক্তির সম্মুখে জান্নাত এবং দোযখ উভয়টিকে আনা

হয়। আমি এ দেয়ালের অপর দিকে জান্নাত এবং দোযখকে দেখেছি। হযরত কাতাদা (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা করার সময় আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে আসলেন। ক্রোধের কারণে তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়েছিল। তখন তিনি মিম্বরে তশরিফ রাখলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আমার পিতা মাতা কোথায়? তিনি এরশাদ করলেন, দোযখে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দন্ডায়মান হলো এবং আরজ করলো, আমার পিতা কে? তিনি এরশাদ করলেনঃ অমুক ব্যক্তি।

হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে ক্রোধের ভাব দেখে আরজ করলেন, আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতিপালক। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী, ইসলাম আমাদের জীবন বিধান, আমরা এসব বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জাহেলিয়্যাতের যুগ তথা শেরক ও পৌত্তলিকতার যুগ বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বেশী দিন হয়নি আমরা মাত্র সেদিন ইসলামে প্রবেশ করেছি, এজন্যে আমাদের বেয়াদবি ক্ষমার যোগ্য। আর আল্লাহ পাকই ভাল জানেন আমাদের পিতা কে, আর তাঁরা কোথায়? একথা শ্রবণ করার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্রোধ প্রশমিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিদ্রুপ করে প্রশ্ন করছিল, কেউ বলছিল আমার পিতা কে? আবার অন্য একজন বলছিল, আমার উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে বলুন কোথায় আছে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) লিখেছেন, উভয় ঘটনাই হতে পারে এবং উভয় ঘটনা সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার সনদ অধিকতর সঠিক মনে হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেন, হজ্জ্ব সম্পর্কীয় প্রশ্নের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। আর যদি কারো পিতার নাম জিজ্ঞাসার সঙ্গে এ আয়াতকে যুক্ত করা হয় তবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরা এমন সব কথা জিজ্ঞাসা করোনা যে সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রকাশ করা হলে তোমরা লজ্জিত এবং ব্যথিত হবে অর্থাৎ যদি তোমাদের সঠিক বংশ প্রকাশ করা হয় এবং তোমাদের

পিতার সঠিক নাম বর্ণনা করা হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তোমরা লজ্জিত ও দুঃখিত হবে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত মূলতঃ নাযিল হয়েছে তখন, যখন লোকেরা "বহীরা" "সায়েবা" প্রভৃতি সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল। দেখ, পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কেই কথা রয়েছে।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ

'বহীরা' 'সায়েবা,' 'ওসীলা' এবং 'হাম' আল্লাহ পাক স্থির করে দেননি; বরং কাফেররাই আল্লাহ্ পাকের নামে এসব মিথ্যা আরোপ করেছে। তাদের অধিকাংশ লোকেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।

"বহীরা" "সায়েবা" প্রভৃতির ব্যাখ্যায় অনেক কথা বর্ণিত আছে। তবে এ পর্যায়ে বোখারী শরীফে যে বর্ণনা রয়েছে তা হলো এই–

'বহীরা' সে জন্তুকে বলা হয়, যার দুধ দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, অন্যের জন্যে তার দুধ পান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'সায়েবা'– যে জন্তুকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয় যেমন বর্তমান যুগেও ষাঁড় ছেড়ে দেয়া হয় এবং সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে, খেতে পারে।

'ওসীলা'– যে উষ্ট্রীর ঘরে একাধারে শুধু উষ্ট্রী জন্ম গ্রহণ করে নর জন্মগ্রহণ না করে। এমন উষ্ট্রীকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। এমন উষ্ট্রীকেই 'ওসীলা' বলা হয়।

'হাম'– এমন উষ্ট্র যে বিশেষ সংখ্যক উষ্ট্রীর সঙ্গে মেলামেশা করেছে, তাকেও দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব হলো বর্বরতার যুগের কুসংস্কার, আল্লাহ্ পাক এসব জন্তুর দুধ এবং গোশ্ত হালাল করেছেন এবং এগুলোর উপর আরোহন করাও হালাল করেছেন। অথচ কাফেররা এসবের দুধ এবং গোশ্ত নিজেদের জন্যে হারাম করেছে, এগুলোর উপর আরোহণ করাও অবৈধ মনে করেছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, উল্লেখিত জন্তুগুলোর সঙ্গে তারা যে আচরণ করতো তা তাদের নিজস্ব কীর্তি। আল্লাহ পাকের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহ পাকের নামে তারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। তাদের এসব প্রশ্ন অবান্তর এবং কোন হালাল বস্তুকে নিজেদের তরফ থেকে হারাম ঘোষণা করা অমার্জনীয় অপরাধ। মূলত তারা হলো নির্বোধ, বিবেক বুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, হালাল হারাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক যা নাযিল করেছেন এবং আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন, তোমরা তা মান এবং তার উপর আমল কর। কিন্তু এ মূর্খ লোকেরা বললো,

قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا

অর্থাৎ আমাদের পিতা, পিতামহকে যে পন্থায় চলতে দেখেছি, যে কাজ করতে দেখেছি তাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। এটি এই অজ্ঞ লোকদের মূর্খতা এবং সংকীর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর জবাবে পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ এ মূর্খ লোকেরা এ অবস্থায়ও তাদের পূর্ব পুরুষের অনুসরণ করবে, যখন তাদের বাপ দাদা কিছুই জানতো না। তারাও ছিল অজ্ঞ, মূর্খ, তারা হেদায়েতও লাভ করেনি, তারা ছিল পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত। অতএব, যারা তাদের অনুসরণ করবে তারাও হবে পথভ্রষ্ট। তারাও হবে আল্লাহ্‌র কোপগ্রস্ত। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাপ দাদার অনুসরণ করা সব ক্ষেত্রে যে অবৈধ তা নয়, বাপ দাদা তথা পূর্ব পুরুষ যদি গুণী, জ্ঞানী, ঈমানদার, আমানতদার, সত্যপরায়ণ হন, তবে তাদের অনুসরণ একান্ত কাম্য। পক্ষান্তরে, যদি বাপ দাদা বা পূর্ব পুরুষ বেঈমান ও পথভ্রষ্ট হয়, তবে তাদের অনুসরণ হবে বিপদের কারণ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

তরজমা

(১০৫) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের আত্মরক্ষার কথা চিন্তা কর যদি তোমরা সৎ পথে থাক, তবে যে কেউ পথভ্রষ্ট হোক, তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ্ পাকের নিকটই যে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের, মুশরেকদের অন্যায় আচরণের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে মোমেনগণ! তোমরা ইসলামের

এ দুশমনদের চিন্তায় মগ্ন হয়োনা। তোমরা নিজেদের হেদায়েতের চিন্তা কর। যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করে, তাদের চিন্তা পরিহার কর। নিজেদের সংশোধনে আত্মনিয়োগ কর। তারা তোমাদের কথা মানেনা, তোমাদের নছিহতের উপর আমল করেনা, যদি তোমরা নছিহত কর, তবে তাদের জেদের কারণে তারা সৎ পথে আসেনা। তাদেরকে সত্যের সন্ধান দেয়া সত্ত্বেও তারা শেরক এবং কুফর পরিহার করেনা। তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমরা তাদের জন্যে দুঃখিত হয়োনা। যদি তোমরা সঠিক পথে থাক, তবে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তারা তোমাদের ক্ষতিসাধনে সক্ষম হবে না।

শানে নুযুল

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেনঃ আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথা কালবী বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আহলে কেতাব থেকে (ইহুদী নাসারা) জিযিয়া (অমুসলিম কর) গ্রহণ করেছেন, আরবদেরকে বলেছেন, হয় ইসলাম কবুল কর অথবা তরবারি দ্বারা মোকাবেলা কর, তখন মুনাফেকরা মোমেনদের নিকট একথার সমালোচনা করে যে, আপনারা একদল কাফের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেন, আরেক দল থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেন না। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন এবং আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন যে, হে মোমেনগণ! এ সমালোচকদের সমালোচনা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, যদি তোমরা সঠিক পথে থাক।

শানে নুযুল সম্পর্কে আরও কথা

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেনঃ এ আয়াত তখন নাযিল হয়েছে যখন মুসলমানগণ কাফেরদের অবস্থা দেখে ব্যাথিত হতেন এবং তারা যেন ইসলাম কবুল করে– এ আশা পোষণ করতেন।

আহমদ এবং তেবরানী হযরত আবু আমের আশআরী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছি যে, مَنْ ضَلَّ শব্দ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ কাফের– যারা পথভ্রষ্ট তাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যদি তোমরা সঠিক পথে থাক, তবে তারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না।

মুজাহেদ এবং সাঈদ এবনে যোবায়ের বলেছেনঃ مَنْ ضَلَّ শব্দ দ্বারা ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা সঠিক পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, তবে আহলে কেতাবরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা। অতএব, তোমরা তাদের কাছ থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ কর এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও।

অন্য একদল তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন, এরপর তাদের আত্মীয়-স্বজন বলত যে, তুমি তোমার পিতাকে নির্বোধ মনে করে রেখেছ। যেমন বর্ণিত আছে, আফরাহ নামক এক ব্যক্তির গোলাম ইসলাম কবুল করে। ইসলামের নূরে অন্তরকে আলোকিত করার পর সে তার আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দেয়, কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, আমাদের জন্যে আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্মই যথেষ্ট।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান বন্ধ করে দাও; বরং মর্মকথা হল- সাধ্যানুযায়ী সৎ কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখ।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অভিমত

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন যে, হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াত পাঠ কর কিন্তু এর সত্যিকার মর্মার্থ উপলব্ধি কর না। আমি নিজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথা শ্রবণ করেছি, যদি লোকেরা মন্দ কাজ দেখে তাকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, তবে হতে পারে আল্লাহ্ পাক সকলকে কোপগ্রস্ত করে দেন। (এবনে মাজাহ, তিরমিযী) আবু দাউদ শরীফে একখানি হাদীস রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি লোকেরা দেখে যে, জালেম জুলুম করছে এবং জালেমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট না হয়, তবে হতে পারে আল্লাহ্ পাক সকলকে আযাব দিতে পারেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যদি কোন সমাজে পাপাচার প্রসার লাভ করে এবং লোকেরা ইচ্ছা করলে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে, শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তা না করে (অর্থাৎ পাপাচার বন্ধ করার চেষ্টা না করে) তবে হতে পারে আল্লাহ্ পাক সকলকে আযাবে নিপতিত করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, মানুষের কর্তব্য হল ভাল কাজে অনুপ্রাণিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। যদি এ দায়িত্ব পালন না করা হয়, তবে আল্লাহ পাক দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতাবান করে দেবেন। তখন তারা তোমাদেরকে চরম কষ্ট দেবে। ঐ সময় যদি তোমাদের নেককার লোকেরা দোয়া করে, তবে তাদের দোয়া কবুল হবে না। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ তোমরা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখ। যতক্ষণ তোমাদের কথা মান্য করা হয়, যদি তোমাদের কথা অমান্য করা হয়, তবে তোমরা একা নিজের সংশোধনের চিন্তা কর।

পবিত্র কোরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা অতীত কাল সম্পর্কীয়। এমন কিছু আয়াত রয়েছে যার মর্ম হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেই বাস্তবায়িত হয়েছে। আর কিছু এমন আয়াতও রয়েছে, যার মর্ম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের সামান্য কিছুদিন পর বাস্তবায়িত হয়েছে। আর কিছু এমন আয়াতও রয়েছে, যার মর্ম আরো কিছুদিন পর বাস্তবায়িত হবে। পবিত্র কোরআনে আরো কিছু আয়াত রয়েছে, যার অর্থ আখেরী যমানায় প্রকাশ পাবে। পবিত্র কোরআনে আরো কিছু এমন আয়াত রয়েছে, যাতে হিসাব নিকাশ এবং জান্নাত ও দোযখের কথা রয়েছে। এসব কেয়ামতের দিন বাস্তবায়িত হবে।

আত্ম-সংশোধনে সচেষ্ট হও

অতএব, যতক্ষণ তোমাদের অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা এক হয় এবং তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর লড়াই না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণকর কাজের তবলীগ কর এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ। আর যখন তোমাদের অন্তরে এবং চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য দেখা দেয় এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর কলহ দ্বন্দ্ব শুরু হয়, একদল অন্যদলের প্রতি আক্রমণ করে, এমন অবস্থায় প্রত্যেকের নিজের সংশোধনের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত।

আর এমন সময়ের জন্যে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার কথা চিন্তা কর, যদি তোমরা সৎ পথে থাক, তবে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের ক্ষতিসাধনে সক্ষম হবে না।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে আবি হাতেম, আবুশ্ শেখ এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে আবুল আলীয়ার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বোল্লেখিত বর্ণনা হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তিরমিযী এবং এবনে মাজাহ হযরত আবু সা'লাবা খাশনীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত সালাবা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এ আয়াতের অর্থ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এরশাদ করেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ একথা নয় যে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নির্দেশ পরিত্যাগ করে বসে যাবে; বরং এর অর্থ হল– কল্যাণকর পথে চল, মন্দ কাজ থেকে পরস্পরকে বিরত রাখ আর নিজেও বিরত থাক।

কিন্তু যখন দেখবে যে, মানুষ ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়েছে এবং দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং প্রত্যেকে তার নিজের ইচ্ছা মোতাবেক চলতে শুরু করেছে এবং প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে, আর তোমারও কিছু করণীয় থাকে তথা তুমিও কিছু করতে বাধ্য হচ্ছ, ঠিক এমন সময় শুধু আত্ম সংশোধনের চিন্তা কর এবং জনসাধারণের চিন্তা পরিত্যাগ কর। একথা নিশ্চিত যে, তোমাদের পর কিছু সংকটময় সময় আসবে, সে বিপদময় মুহূর্তে সবর করা এত কঠিন হবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারকে মুষ্টিতে রাখা। তখন নেক আমল করার সওয়াব ঐ পঞ্চাশ জন মানুষের সমান হবে যারা এমন নেক আমল করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ঐ ব্যক্তির নেক আমল তাদের পঞ্চাশ জনের সমান হবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমান হবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াত সম্পর্কে কেউ এ ধারণা করতে পারে যে, সত্যের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়তো অবশ্য কর্তব্য নয়, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না; বরং এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ্ পাকের অনুগত থাকবে, তাদেরকে অবাধ্য, গুনাহ্গারদের অপকর্মের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে না।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের মর্ম বাস্তবায়িত হবে শেষ যমানায়। যখন মানুষ দলে দলে বিভক্ত হবে এবং পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হবে। সে সময় প্রত্যেককে আত্মসংশোধনে সচেষ্ট হতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, তোমাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সে সব লোকদের যারা তোমাদের দ্বীনে বিশ্বাসী, অর্থাৎ তোমরা একে অন্যকে নছিহত করবে, পরস্পরকে পরস্পর ভাল কাজের দিকে আহবান করবে এবং মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করবে। আর এজন্যে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে তাগিদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে রক্ষা কর আর নিজেদেরকে রক্ষা করতে হলে তার একমাত্র পন্থা হল সৎ কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০

অন্য একটি ব্যাখ্যা

এ আয়াতের অন্য একটি অর্থ হল এ আয়াতখানি বিশেষভাবে কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাদের অবস্থা এই যে, কোন প্রকার ওয়াজ নছিহত, উপদেশ তাদের জন্যে উপকারী হয় না। আর তারা কখনও নাফরমানী পরিত্যাগ করেনা। এমনি অবস্থায় তাদেরকে নছিহত করা অবশ্য কর্তব্য নয়, যেমন মুনাফেকদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, জিযিয়া সম্পর্কে তারা মুসলমানদের সমালোচনা করেছে। এরা এমন লোক, যাদেরকে উপদেশ দেয়া না দেয়া সমান। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমরা আত্ম-সংশোধনে ব্যস্ত হও, আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন। যখন একজন মানুষ সৎ কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে গিয়ে নিজের জীবনের ব্যাপারে অথবা অর্থ সম্পদের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করে, এমন অবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতা তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। সে অন্যের হেদায়েতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেনা।[১]

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ তোমাদের সকলকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে তিনি অবহিত করবেন। অর্থাৎ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা হবে। একজনকে অন্যজনের অপরাধের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। যে সৎ কাজ করবে, সে তার শুভ পরিণতি লাভ করবে আর যে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করবে, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, তাকে তার কৃতকর্মের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

১. তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা ১১২-১৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ
الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ
لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ
مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا
أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

তরজমা

(১০৬) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়তের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে অথবা তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের ব্যতীত অন্য দু' জন বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখবে। তোমরা যদি সফরে থাক এবং মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়, তবে দু'জন সাক্ষীকে মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। এরপর তারা আল্লাহ্ পাকের নামে শপথ করে বলবে, আমরা আমাদের ঘণিষ্ঠ-আত্মীয়-স্বজন হলেও শপথের বিনিময়ে কোন অর্থ সম্পদ গ্রহণ করব না। আর আমরা আল্লাহ্র বিধান গোপন করব না। (যদি এমন করি তবে) আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৭) কিন্তু যদি একথা প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তবে যাদের স্বার্থহানি হয়েছে তাদের সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয়দের থেকে অপর দু'জন সাক্ষী পূর্ব সাক্ষীদ্বয়ের স্থলে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ্র শপথ করে বলবে, পূর্বের সাক্ষীদ্বয়ের থেকে আমাদের সাক্ষ্য সঠিক। আমরা সীমা লঙ্ঘন করি নাই, করলে আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৮) এ পন্থায় আশা করা যায় যে, তারা সঠিকভাবে সাক্ষ্য দান করবে অথবা ভয় করবে যে, তাদের শপথের পর পুনরায় শপথ গ্রহণ করা হবে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং

(আল্লাহর বিধান সমূহ) শ্রবণ কর। আর আল্লাহ্ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে দ্বীনের হেফাজতের হুকুম ছিলো আর এ আয়াতে ধন-সম্পদের হেফাজতের পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যুকালে ওসিয়তের ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানানো উচিত। প্রথম আয়াতে দ্বীনি উপকারের কথা রয়েছে আর এ আয়াতে দুনিয়ার উপকারের কথা বলা হয়েছে।

অথবা

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রত্যেককে হাযির হতে হবে এবং প্রতিটি মানুষের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের ওসিয়ত করা উচিত এবং সে ওসিয়তের উপর সাক্ষী রাখা উচিত।[১]

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল হল একটি ঘটনা, যা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেছিলো। ঘটনার বিবরণ এই, তামীম এবনে আওসদারী এবং আদী এবনে বোদ্দা নামক দু'জন খৃষ্টানের সঙ্গে বোদায়েল নামক একজন মোহাজের মুসলমান ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফর করেন।

সিরিয়া পৌছার পর বোদায়েল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ধারণা করেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তাই তিনি তাঁর মাল পত্রের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেন এবং সে তালিকাটি গোপনে মাল পত্রের সঙ্গে রেখে দেন। খৃষ্টান সঙ্গীদ্বয়কে ওসিয়ত করেন যে, যদি আমার মৃত্যু হয় তবে মাল-পত্র আমার ওয়ারিশানদের নিকট পৌছে দিও। এরপর তাঁর মৃত্যু হয়। উভয় সাথী মদীনা মোনাওয়্যারা প্রত্যাবর্তন করে এবং বোদায়েলের মাল প ত্রের মধ্যে একটি স্বর্ণ খচিত রৌপ্য পাত্র ছিলো যা তারা উভয়ে আত্মসাত করে।

বোদায়েলের ওয়ারিশানরা তার আসবাব পত্রের মধ্যে রক্ষিত তালিকা পেয়ে দেখতে পান যে, একটি স্বর্ণ খচিত রৌপ্য পাত্র তার মধ্যে ছিল। তাই তারা তামীম এবং আদীকে জিজ্ঞাসা করেন, বোদায়েল তার মাল-পত্রের মধ্যে কোন কিছু কি বিক্রয় করেছিল? তারা জবাব দিল, না। পুনরায় তারা জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কোন ব্যবসা করেছিলেন? তারা বলল, না। ওয়ারিশানরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, রুগ্ন অবস্থায় তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কোন কিছু কি ব্যয় করতে হয়েছে? তারা

১ : তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪১৬-১৭

এবারও বলল না। তখন বোদায়েলের ওয়ারিশানরা তাদেরকে বলল, আমরা বোদায়েলের মাল–পত্রের মধ্যে তাঁর লিখিত একটি তালিকা পেয়েছি। ঐ তালিকায় স্বর্ণ খচিত একটি রৌপ্য পাত্রের উল্লেখ রয়েছে যা পাওয়া যাচ্ছেনা। তখন তারা বলল, আমরা জানিনা। আমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে, আমরা তা ফেরত দিয়ে দিয়েছি।

তখন বোদায়েলের ওয়ারিশানগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তামীম এবং আদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা এ সম্পর্কে তাদের অস্বীকৃতির কথা পুনর্ব্যক্ত করল। যেহেতু ওয়ারিশানদের অভিযোগ প্রমাণের ব্যাপারে কোন সাক্ষী ছিলনা, তাই অভিযুক্তদেরকে শপথ নেয়া হল। তারা শপথ করে বলল, আমরা মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমরা তার কোন মাল– পত্র আত্মসাত করিনি। শপথের ভিত্তিতেই এ মামলার নিষ্পত্তি হয়।

এদিকে কিছু দিন পর এ খবর রটে যায় যে, তারা মক্কার কোন স্বর্ণকারের নিকট উক্ত স্বর্ণ খচিত রৌপ্য পাত্রটি বিক্রয় করেছে। স্বর্ণকারকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তোমার নিকট কে এটি বিক্রয় করেছে? সে বলল, তামীম এবং আদী থেকে তা ক্রয় করেছি, কিন্তু তাদের নিকট এ ক্রয়ের ব্যাপারে কোন সাক্ষী ছিলনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পুনরায় বোদায়েলের আত্মীয়–স্বজন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তারা উভয়ে দাবী করে যে, আমরা এ পাত্রটি বোদায়েল থেকে ক্রয় করেছি।

এমনি অবস্থায় বোদায়েলের আত্মীয়-স্বজন থেকে প্রিয়নী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শপথ নিলেন। তারা শপথ করে বলল, এ পাত্রটি বোদায়েলের ছিল, আর তামীম এবং আদি এ ব্যপারে মিথ্যা শপথ করেছে। এমন অবস্থায় তারা যে এক হাজার দেরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ খচিত রৌপ্য পাত্রটি বিক্রয় করেছিল তা বোদায়েলের আত্মীয়-স্বজনকে আদায় করার আদেশ প্রদান করা হল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মৃত্যুর সময় ঘণিয়ে আসে, তখন ওসিয়ত করার মুহূর্তে তোমরা দু'জন সাক্ষী নিয়োগ কর যারা হবে

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৬২
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড–১, পৃষ্ঠা ৫৬৮-৬৯
তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১১৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮০-৮১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-২ পৃষ্ঠা ৪১৭-১৮

ন্যায়বান, বিশ্বস্ত। এ দু'জন মুসলমানদের মধ্যে হোক অথবা অমুসলিম। তবে তাদের ন্যায়বান এবং বিশ্বস্ত হওয়া শর্ত। যাদের কর্তব্য হবে মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত পূর্ণ করা এবং তার ধন-সম্পদে খেয়ানত না করা। যদি সে মূহুর্তে মুসলমান না পাওয়া যায় তবে অমুসলিম সাক্ষী নিযুক্তির অনুমতি রয়েছে।

اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ

যদি তোমরা সফরে থাক আর মৃত্যু উপস্থিত হয়, সফরসঙ্গী থাকে অমুসলিম, এমন অবস্থায় তাদেরকেই ওসি বা সাক্ষী নিযুক্ত কর। যদি তোমরা এ সাক্ষীদ্বয়ের আমানতদারী ও সততায় সন্দিহান হও, আর তাদের সম্পর্কে এ ধারণা কর যে, তারা বিশ্বস্ততার পরিচয় দেবেনা, এমন অবস্থায় তাদেরকে নামাযের পর অপেক্ষমান থাকতে বলো, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ

আলোচ্য আয়াতে নামাযের পর সাক্ষীদ্বয়কে দাঁড় করিয়ে জনসমক্ষে শপথ করার বিধান পেশ করা হয়েছে। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ উল্লেখিত সালাত বলতে আসরের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, ঐ সময় হল দরবারে এলাহীতে কবুলিয়তের সময় এবং ফেরেশতাদের মোলাকাতের সময়। নামাযের পর সাক্ষীদ্বয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে যে, আমরা সাক্ষ্য গোপন করব না। আর আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করব না। যার জন্যে আমরা এ সাক্ষ্য দিচ্ছি, সে যদি নিকটতম আত্মীয়ও হয়, তবু তার জন্যে আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেবনা। আর এতদ্ব্যতীত, অন্যের জন্যে তো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রশ্নই উত্থিত হবে না। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবশ্য কর্তব্য ঘোষিত এ সাক্ষ্য আমরা কোন অবস্থাতেই গোপন করব না। যদি আমরা তা করি, তবে আমরা মহাপাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

কিন্তু এরপরও যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষীদ্বয় পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে তথা মৃত ব্যক্তির সম্পদের খেয়ানত করেছে এবং মিথ্যা শপথ করেছে, এমন অবস্থায় অন্য দু'জন তাদের স্থলে কসম করার তথা শপথ গ্রহণের জন্যে দাঁড়াবে। এরা দু'জন হবে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে। তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য অধিকতর বিশ্বসাযোগ্য। আমরা এ শপথের মাধ্যমে কোন রকম বাড়াবাড়ি করিনি। যদি আমরা এ পর্যায়ে কোন প্রকার সীমা লঙ্ঘন করে থাকি, তবে আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

আয়াতের মর্মকথা

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, এ জগৎও ক্ষণস্থায়ী, প্রতিটি মানুষ একটি সীমিত সময়

নিয়েই আসে এ পৃথিবীতে। এ সময় শেষ হলে পাড়ি জমাতে হয় প্রত্যেককেই পরপারের দিকে। আল্লাহ্ পাকের কুদরত, হেকমত এবং মর্জিতেই এ পৃথিবীতে মানুষের আগমন হয় আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই মানুষকে এ পৃথিবী থেকে গমন করতে হয়। এ জীবনের সব কিছুই সত্য কিন্তু যখন কারো উপর মৃত্যুর অলজ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হয় তখন সব সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়, যে বা যারা জীবনের মালিক আল্লাহ্ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে, শুধু তাদের জীবনই সার্থক এবং সুন্দর হয়। অন্যথায় জীবন সাধনা যে ব্যর্থ হয় তাই নয়; বরং মহা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

যাহোক, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে তথা চির বিদায় গ্রহণ করতে হবে এ পৃথিবী থেকে। তাই বিদায় গ্রহণের পূর্বে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হল– বিদায়ের জন্যে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। বলাবাহুল্য, মৃত্যুর পূর্বে পরপারের যাত্রী মাত্রেরই তার অর্থ সম্পদের ওসিয়ত করা পূর্ব প্রস্তুতিরই অংশ বিশেষ। অর্থ সম্পদ হোক অথবা অন্য কোন জরুরী বিষয়ে হোক– সে সম্পর্কে ওসিয়ত করা অতীব কল্যাণকর কাজ এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আলোচ্য আয়াতে এ ওসিয়তের বিধানই পেশ করা হয়েছে। জীবন সায়াহ্নে যদি কোন মুসলমান তার ধন-সম্পদ কারো কাছে রেখে যায় তবে তার উপর দু'জন মুসলমান সাক্ষী রেখে যাওয়া কর্তব্য।

কিন্তু যদি সফরে থাকার কারণে দু'জন মুসলিম সাক্ষী না পাওয়া যায় তবে অমুসলিম সাক্ষী রেখে যাবে। এ সাক্ষীদ্বয় কোন প্রকার খেয়ানত করেছে বলে যদি ওয়ারিশানদের সন্দেহ হয় এবং কোন অভিযোগ উত্থিত হয়, তবে সে অভিযোগ প্রমাণের জন্যে নিকটাত্মীয়দের তরফ থেকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। তারা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলবে যে, আমরা কোন কিছুই গোপন করব না এবং কোন প্রকার স্বার্থ বা অর্থ লোভ অথবা আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে আমরা মিথ্যা বলব না, যদি আমরা তা করি তবে এমন অবস্থায় জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব। বোদায়েলের ঘটনায় অবতীর্ণ এ আয়াতের শেষে আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ

অর্থাৎ ওয়ারিশদের সন্দেহ হলে শপথ দেয়ার যে নির্দেশ রয়েছে তা দ্বারা এ আশা করা যায় যে, শপথ গ্রহণের ভয়ে সাক্ষীরা মিথ্যাবাদিতা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ শপথ করবে। এ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষীদ্বয়ের মিথ্যা শপথ তাদের বিরুদ্ধে

যাবে। এ ভয়ের কারণে হয়ত তারা ধোকাবাজী থেকে বিরত থাকবে।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا

আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং আমানত সমূহের হেফাজত কর, কোন অবস্থাতেই খেয়ানত করোনা। আর আল্লাহ্ পাকের বিধান সমূহ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতে থাক। আর মনে রেখো, পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক হেদায়ত করেন না। তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে সে সব লোকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করে।

আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ)-এর বক্তব্য

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে مِنْكُمْ শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হে মোমেনগণ! ওসিয়তের উপর সাক্ষী নিযুক্ত করবে তোমাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ মুসলমানদের থেকে। অতএব, দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান ওসিয়তের উপর সাক্ষী হিসেবে নিযুক্ত হবে। আর এ অভিমত হলো হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), আবু মূসা আশআরী (রাঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), সাঈদ এবনে মুসায়্যেব (রঃ) এবং শোরায়েহ্ (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), এবনে সিরিন (রঃ) ও এবনে জোরায়েয (রঃ)-এর। তাঁরা বলেছেন, যদি মানুষ ভ্রমণরত থাকে এবং ওসিয়তের জন্যে সাক্ষী হিসেবে কোন মুসলমানকে না পায়, তখন এমন ব্যক্তির জন্যে ইহুদী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক তথা কোন কাফেরকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হয়। মুসলমানদের উপর কাফেরের সাক্ষ্য এ অবস্থা ব্যতীত বৈধ নয়।

ইমাম শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেন, একজন মুসলমান ভ্রমণরত অবস্থায় অসুস্থ হন, তিনি কোন মুসলমানকে পাননি, যাকে তার ওসিয়তের উপর সাক্ষী নিযুক্ত করেন। সে সময় কূফার শাসক ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তাঁর নিকট উভয় সাক্ষী হাযির হল এবং ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। তারা সেই মুসলমানের পরিত্যক্ত সম্পদ এবং ওসিয়ত তাঁর নিকট পেশ করল। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, এমন ঘটনা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর আর ঘটেনি।

যাহোক, তিনি কূফার মসজিদে আছরের নামাযের পর তাদের নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করলেন এ মর্মে যে, তারা মিথ্যা কথা বলেনি এবং মৃত ব্যক্তির মাল-পত্রে কোন পরিবর্তন করেনি। এ অভিমত হল– হযরত হাসান বসরী (রঃ), জুহরী (রঃ) এবং অন্যান্য ব্যবহার শাস্ত্রবিদ ওলামায়ে কেরামের। তাদের মতে আল্লাহ পাক যেহেতু বলেছেন ঃ

ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

এর মর্ম হল সাক্ষীগণ হতে হবে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। আর যদি তোমরা সফরে থাক আর মৃত্যুর বিপদ দেখা দেয়, এমন অবস্থায় অপরিচিত লোকদের মধ্য থেকে সাক্ষী গ্রহণ কর কেননা, সফরের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন সাধারণতঃ কাছে থাকে না। তাই অনাত্মীয়-অপরিচিত সাক্ষী নিযুক্ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর সর্বপ্রথম আত্মীয়-স্বজনের কথা এজন্যে বলা হয়েছে যে, আপনজনেরা মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর অবগত থাকে।

যাঁরা প্রথমোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের দলীল হল– যে ঘটনা সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, তাতে দেখা যায় সাক্ষী দু'জনই ছিলো খ্রীষ্টান। আর তাদের সাক্ষ্য বোদায়েল নামক মুসলমানের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এমনিভাবে দু'জন ইহুদী হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট এমন ঘটনায় যখন সাক্ষ্য দেয়, তখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আর তখন কোন সাহাবী ইহুদীদের সাক্ষ্যকে গ্রহণ করার কথাকে অস্বীকার করেননি। এতদ্ব্যতীত, যারা কাফেরদের সাক্ষ্যকে বৈধ মনে করেন তারা বলেন, আমরা তা বৈধ মনে করি তখন যখন মুসলমান সাক্ষী হিসেবে না পাওয়া যায়। আর প্রয়োজন অনেক অবৈধ কাজকেও বৈধ করে দেয়। যেমন, সফরের কারণে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযকেও দু' রাকাআত করার বিধান রয়েছে।

এমনিভাবে পানির অভাব হলে তৈয়ম্মুমের অনুমতি রয়েছে। আর সফরের অবস্থায় রমজানের মাসে রোজা না রেখে পরে কাযা করার অনুমতি রয়েছে। এমনিভাবে কোন মানুষের হালাল রিয্ক না পাওয়ার কারণে নিতান্ত প্রাণ রক্ষার্থে হারাম বস্তু দ্বারাও প্রাণ রক্ষার অনুমতি রয়েছে। ঠিক তেমনি যখন ভ্রমণরত অবস্থায় কোন মানুষের মৃত্যু ঘণিয়ে আসে, এমন সময় ওসিয়তের ব্যাপারে সাক্ষী নিযুক্ত করার ব্যাপারে কোন মুসলমান না পাওয়া যায়, এমন অবস্থায় অমুসলিমকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া যায়।

যারা দ্বিতীয় মত পোষণ করেন তারা বলেন, আল্লাহ পাক দু'জন ন্যায়বান সাক্ষী নিযুক্ত করার কথা বলেছেন, আর কাফের তো ন্যায়বান হতেই পারে না।

ইমাম রাজী (রঃ) مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ (অর্থাৎ নামাযের পর) একথাটি সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক আয়াতে কোন বিশেষ নামাযের উল্লেখ করেননি। তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে আছরের নামাযকে নির্দিষ্ট করেছেন। এর কারণ এই, সাধারণতঃ আরবে এ সময়েই শপথ গ্রহণ করা হতো।

এতদ্বতীত, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আছরের নামাজের পর আদী এবং তামীম নামক উভয় সাক্ষীকে ডাকেন এবং তাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। আর আছরের নামাযের সময় নির্দিষ্ট করার জন্যে এটি দলিল হয়ে যায়।

এছাড়া সকল ধর্মাবলম্বী লোকেরাই এ সময়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

যাহোক, ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, আয়াতের শেষে আল্লাহ পাক তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তাগিদ করেছেন এবং এতে আল্লাহ্ পাকের বিধানের বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে একথাও বলেছেন।[১]

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ
الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ
إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

তরজমা

(১০৯) স্মরণ কর সে সময়কে যখন আল্লাহ পাক রসূলগণকে একত্রিত করবেন এবং বলবেনঃ তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবেঃ আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১১৫-১২১

(১১০) যখন আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ হে ঈসা এবনে মরয়ম! তোমার প্রতি এবং তোমার মাতার প্রতি আমার যে নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম রুহুল কুদুস দ্বারা, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছ, আর যখন আমি তোমাকে কিতাব, হেকমত, তৌরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম, তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে, ফলে তা আমার আদেশ-ক্রমে উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হতো। যখন তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দিতে, যখন তুমি আমার হুকুমে মৃতকে জীবিত করে তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে দিতে, যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার নিকট থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলেছিল, এ তো পরিষ্কার যাদু।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, শরীয়তের বিধান, নিয়ম–কানুন বর্ণনার পর আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অথবা আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে অথবা কেয়ামতের কঠিন দিনের ব্যাপারে কিছু বর্ণনা করেন, যাতে করে আল্লাহ্ পাকের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি এবং আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা স্মরণের কারণে আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করা সহজ হয়। এজন্যে এ সূরার শেষ পর্যায়ে এ আয়াতে কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

কেয়ামতের কঠিন দিনে পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পাকের আযাবের ভয়ে সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে এবং নিজেকে সেই কঠিন মুহূর্তে প্রকৃতস্থ রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এমন সময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাঁদের উম্মতের সম্মুখে এ প্রশ্ন করা হবে যে, হে আমার আম্বিয়াগণ! তোমরা যখন উম্মতকে আমার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি জবাব দিয়েছিল? এ প্রশ্নটি যদিও আম্বিয়ায়ে কেরামকে করা হবে কিন্তু এর লক্ষ্য হলো প্রত্যেক নবীর উম্মতকে ভয় প্রদর্শন করা, যেন তারা এ প্রশ্ন শ্রবণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়, যেমন কোরআনে করীমে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۞ بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ

যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? যদিও এরশাদ হয়েছে যে, যাদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কিন্তু এ প্রশ্নের লক্ষ্য হলো সে সব লোক যারা কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করেছে।

ঠিক এভাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন আম্বিয়ায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তৌহিদের আহবান করার পর তাদের উম্মতেরা কি জবাব দিয়েছিল? এতেও উম্মতদেরকে ভয় প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য। কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ পাকের এ প্রশ্নের জবাবে ভীত অবস্থায় আম্বিয়ায়ে কেরাম বলবেন, এ সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। হে আল্লাহ্! তোমার নিকটই রয়েছে সর্ব বিষয়ের জ্ঞান এবং গায়বী সংবাদ। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে প্রাথমিক ভয় কেটে যাবে।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) একথাই বলেছেন কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম জ্ঞানের মোকাবেলায় আমাদের কোন জ্ঞান নেই– একথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে, হে আল্লাহ! তুমিই সব জান আমরা যে কিছুই জানি না। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম জ্ঞানের মোকাবেলায় আমরা কিছুই জানিনা– একথা বলাই শ্রেয়। শুধু এতটুকুই কথা যে, কেয়ামতের সেই কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র নবীদের এমন উক্তি, তাঁদের বিবেক বুদ্ধি এবং উচ্চ মর্তবার জীবন্ত নিদর্শন।

কেয়ামতের দিন সকল নবীকে তাঁর উম্মতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করেছেন কেননা, খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে তাদের উপাস্য বলে মেনে নিয়েছে তথা খোদার আসনে তাকে বসিয়েছে। পরবর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাননীয়া মাতাকে যে নেয়ামত সমূহ দান করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করা, যারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে (নাঊযুবিল্লাহ মিন জালেক) বা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে, তাদের মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদই হলো এ আয়াতের উদ্দেশ্য।

এমনিভাবে দূরাত্মা ইহুদীদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদও রয়েছে এ আয়াতে কেননা, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত ও রেসালতকে অস্বীকার করে। আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের যে নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা একদিকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বন্দা এবং রসূল, ঠিক তেমনি তিনি যে আল্লাহ্র দানের মোহতাজ– একথাও প্রমাণিত হয়েছে।

কেননা, যে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত এবং এহসানের মুখাপেক্ষী হয় এবং যার জন্মের ব্যাপারে এবং হেফাজতের ব্যাপারে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর সাহায্য গ্রহণ করতে হয় সে অবশ্যই বন্দা, তাঁকে খোদার আসনে বসানোর ন্যায় নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে!

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪১৯-২০
তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা ১২২-২৩

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাননীয়া মাতার প্রতি অনেক এহসান করেছেন, তাই হযরত ঈসা (আঃ) সাধারণ মানুষ নন; বরং আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত প্রাপ্ত বিশেষ বন্দা ও রসূল। তাই তাঁর সম্পর্কে ইহুদীদের ধারণা যে বাতিল এতে একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[১] আর এ বিষয়টি উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, উভয় বাতিল ফেরকা ইহুদী নাসারারা যেন তাদের ভ্রান্ত মতবাদ পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে ফিরে আসে।

পয়গম্বরগণকে এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে ভর্ৎসনা করা। তারই জবাবে পয়গম্বরগণ আরজ করবেন, হে আল্লাহ! সকল গায়বী খবর সম্পর্কে তুমিই অবগত, সকল গোপন ও প্রকাশ্য তোমার নিকট সুস্পষ্ট, আমরা সামান্য যা কিছু জানার সুযোগ পাই তা তোমার নিকট পেশ করার যোগ্য নয়, তুমি মহাজ্ঞানী।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) একথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম বলবেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের পর উম্মতের লোকেরা কি করেছে তাতো আমরা জানিনা, দ্বিতীয়তঃ তারা প্রকাশ্যে যা বলেছে তা আমরা শুনেছি কিন্তু তাদের মনে কি আকীদা ও বিশ্বাস ছিল সে খবর তো শুধু তুমিই জান আর সওয়াব বা আযাবের সিদ্ধান্ত তাদের মনের অবস্থার প্রেক্ষিতেই হবে।

এবনে জরীর (রঃ) আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইমাম রাজী (রঃ)-ও এ তফসীরই করেছেন। এতদ্ব্যতীত, ইমাম রাজী (রঃ) আরো একটি কথা বলেছেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম আরজ করেছেন, উম্মতীদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা সঠিক ভাবে অবগত নই, তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের শুধুমাত্র একটু ধারণা রয়েছে। আর ধারণা দুনিয়ার জীবনে তো কিছুটা কার্যকর হয়, কিন্তু কোন বিষয়ের ধারণা আখেরাতের সওয়াব বা আযাবের জন্যে যথেষ্ট মনে করা হবে না; বরং সেখানে প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতেই বিচার করা হবে।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের কঠিন দিনে নবী রসূলগণকে তাদের উম্মতীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, উম্মতীগণ তাদের তবলীগ ও দাওয়াত কবুল করেছে কি-না। তার জবাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আরজ করবেন, এ সম্পর্কে আমাদের কোন এলম নেই।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা কোন প্রকার জবাব দিতে পারবেন না বলেই এ জবাব দিয়েছেন যে, আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। হে আল্লাহ! আমাদের অবর্তমানে তারা কি করেছে না করেছে তা আমাদের জানা নেই, তুমি তো সব কিছু জান, তুমি যে অন্তর্যামী, তোমার দরবারে কোন কিছু যে গোপন নেই।

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ

---

১ : তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২০

২ তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৩৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫

এ আয়াতে ঈসা (আঃ)-এবং তাঁর মাতার প্রতি আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে ঈসা এবনে মরয়ম! তোমার প্রতি এবং তোমার মাতার প্রতি আমার যে নেয়ামত হয়েছে তা স্মরণ কর, তোমাকে পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি এবং আমার কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছি। তোমাকে জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছি, শক্তিশালী করেছি। তোমার মাতার প্রতিও এহসান করেছি। তোমাকেই তাঁর পবিত্রতার দলিল হিসেবে পেশ করেছি। জালেমরা তাঁর প্রতি যে অন্যায় অপবাদ দিয়েছিল তা থেকে তোমার মাতাকে রক্ষা করেছি। তোমাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছি, তুমি দোলনায় বসে মানুষের সাথে বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ। তোমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করেছি, তুমি তৌরাত পাঠ করতে, তোমাকে পড়া লেখা শিক্ষা দিয়েছি।

হে ঈসা (আঃ)! তোমাকে আরো অনেক মোজেযা দিয়েছি যেমন তুমি মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করতে আর তাতে ফুঁক দিলে আমার হুকুমে তা জীবন্ত পাখীরূপে পরিণত হতো এবং আকাশে উড়তো। আর হে ঈসা! তুমি আমার হুকুমেই জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগী সুস্থ করতে আর তুমি মৃত ব্যক্তিকে ডাকতে, সে আল্লাহ্‌র হুকুম এবং কুদরতে জীবন্ত অবস্থায় কবর থেকে বের হয়ে আসতো।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দু' রাকাআত নামায আদায় করতেন এবং এরপর আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ ও সানা পাঠ করতেন। এরপর আল্লাহ্ পাকের সাতটি নাম জিকর করতেন। এ নাম গুলো হচ্ছে–

(ইয়া খাফিয়্যু) (ইয়া কাদিমু) (ইয়া আহাদু) (ইয়া ফারদু) (ইয়া দায়েমু) (ইয়া সামাদু) (ইয়া ভেত্‌রু)

এরপর তিনি قُمْ بِاِذْنِ اللّٰه (আল্লাহর হুকুমে দাড়াও) বলে ডাকলে মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে আসতো।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় আম্বিয়ায়ে কেরাম ভীত হয়ে যাবেন। ঐ অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব হবে না, তাই আরজ করবেন, এ সম্পর্কে আমাদের কোন এলম নেই। এরপর যখন প্রকৃতস্থ হবেন, তখন তাঁরা নিজ নিজ উম্মত সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

আর এবনে জোরায়েয (রঃ) বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো আমরা জানিনা যে, আমাদের পর উম্মত কি কাজ করেছে, হে আল্লাহ! তুমিই সব কিছু জান, তোমার নিকটই রয়েছে সকল গায়বী এলম।

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৪

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (কেয়ামতের দিন) হাউজের পার্শ্বে আমার নিকট কিছু লোক আসতে ইচ্ছা করবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারবো। কিন্তু আমার নিকট তাদের পৌঁছতে বাঁধা দেয়া হবে। আমি বলবো এরাতো আমার সাহাবী, আমার প্রিয় সঙ্গী। তখন জবাবে বলা হবে, আপনি জানেন না এরা আপনার পরে দ্বীন ইসলামে কি কি নতুন কথা সংযোজন করেছে। (বোখারী) এর অনুরূপ বক্তব্য হযরত ঈসা (আঃ) দেবেন। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে তার বিবরণ। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

(আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। যখন তুমি আমাকে ওফাত দিয়েছে, তুমিই ছিলে তাদের উপর নেগেহবান।)

تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا

এ আয়াতাংশে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, হে ঈসা! তুমি দোলনায় থেকে এবং বয়স্ক অবস্থায় একই প্রকার হেকমতপূর্ণ কথা বলতে। বয়স্ক অবস্থায় এমন কথা বলা সহজ কিন্তু অতি শৈশবে এমন কথা শুধু যে বিস্ময়কর তাই নয়; বরং অচিন্তনীয়ও। আর তাই ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেযা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ পাক ৩০ বছর বয়সে হযরত ঈসা (আঃ)-কে রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। ৩০ মাস রেসালতের দায়িত্ব পালনের পর আল্লাহ পাক তাঁকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন। এর পরবর্তী আয়াত সমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অন্যান্য নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বে আমরা উপস্থাপন করেছি।

وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ

হে ঈসা! সে সময়কে স্মরণ কর যখন বনী ইসরাঈলের ইহুদীরা তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। আমি তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেই। তাদেরকে এমন অন্যায় থেকে বিরত রাখি। তুমি যখন তাদের নিকট মোজেযা নিয়ে আস, তারা তোমার প্রতি অবিশ্বাস করে এমনকি, তোমাকে হত্যা করার চক্রান্ত করে। তখন আমিই তোমাকে রক্ষা করি।

فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা বললো– এতো সুস্পষ্ট যাদু। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতকে বিশ্বাস করতো না এবং তাঁর বিস্ময়কর মোজেযা সমূহকে যাদু মনে করতো অথচ মোজেযা হলো এমন বিষয় যার দৃষ্টান্ত পেশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মোজেযা এমনি একটি অলৌকিক শক্তি যা আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণকে দান করেছেন। এটি আল্লাহর দান, মানুষের অর্জন করার বিষয় নয়; পক্ষান্তরে যাদু হলো একটি আর্ট, যে কোন মানুষ তা শিখতে পারে।

আলোচ্য আয়াত সমূহ আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন এবং আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাঁদের উম্মতের সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হবে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম ঐ অবস্থায় যে জবাব দেবেন তারও উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান

এ পর্যায়ে হযরত ঈসা (আঃ)–কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি যে নেয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ করা হবে। যে নেয়ামত সমূহের উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে তা হলো এই–

১. হে ঈসা! তোমাকে জিব্রাঈল দ্বারা সাহায্য করেছি।

২. অতি শৈশবে তোমাকে বুদ্ধিমানের ন্যায় কথা বলার তৌফিক দিয়েছি।

৩. নবুওয়্যত দান করেছি।

৪. তোমাকে লেখা পড়া শিক্ষা দিয়েছি।

৫. নবুওয়্যতের এলম, তৌরাতের এলম তোমাকে দান করেছি।

৬. তোমার প্রতি ইঞ্জিল নাযিল করেছি।

৭. তোমাকে এ শক্তি দিয়েছি যে, মাটি দ্বারা তৈরী পাখির আকৃতিতে তুমি ফুঁক দিলে তা জীবন্ত পাখী রূপে পরিণত হতো।

৮. জন্মান্ধকে ফুঁক দিলে সে চক্ষুষ্মান হতো।

৯. কুষ্ঠ রোগীকে তুমি ফুঁক দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হতো।

১০. যখন বনী ইসরাঈলের নিকট তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসলে, তখন ইহুদীরা তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করলো, তোমার নবুওয়্যতকে অস্বীকার করলো এবং তোমার মোজেযাকে যাদু মনে করলো আর তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। আমি তোমাকে তাদের হামলা থেকে রক্ষা করলাম এবং নিজের কাছে তোমাকে তুলে নিয়ে আসলাম। এখানে উল্লেখ্য, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেযার উল্লেখের পর

আল্লাহ্ পাক بِاذْنِي (আমার অনুমতিক্রমে) শব্দটি সংযোজন করেছেন। এর অর্থ হলো যে, ঈসা (আঃ) যা কিছু অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছে তা আমার প্রদত্ত শক্তিতেই দেখিয়েছে।[১]

সারকথা

আলোচ্য আয়াত সমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মনোনীত নবী ও রসূল এবং তাঁর অতি প্রিয় ব্যক্তি। এতদ্বারা ইহুদীদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ হয়েছে। কেননা, তারা তাঁকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করতো না। অন্যদিকে তাঁর বন্দা হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। এতে পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ হয়েছে।

কেননা, এ বিভ্রান্ত লোকেরা এমন আপত্তিকর ধারণা করেছে যা নিতান্ত পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা সাহায্য করা, তাঁকে তা'লীম তরবিয়ত দেয়া, কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেয়া এবং ইহুদীদের হামলা থেকে তাঁকে রক্ষা করা- এসবই তাঁর প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান এবং একথার প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহর বন্দা ও রসূল এবং আল্লাহ্ পাকের সাহায্যপুষ্ট, আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান এবং আল্লাহর দানে ধন্য।

অতএব, তাঁর সম্পর্কে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। তাঁর যেসব মোজেযা দেখে খৃষ্টানরা তাঁকে খোদা এবং এবং খোদার পুত্র (নাঊজুবিল্লাহ মিন জালেক) বলেছে– এ মোজেযাগুলো তাঁর নবী ও রসূল হওয়ার প্রমাণ। এর বেশী আর কিছু নয়। কেয়ামতের দিন এ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখের মাধ্যমে আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৭২

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ
نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ
عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ
عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ
وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ
يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

তরজমা

(১১১) আর স্মরণ কর, আমি যখন হাওয়ারীদের অন্তরে এ প্রেরণা দেই যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন। তারা বলে আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা আপনারই পূর্ণ আনুগত।

(১১২) সে সময়কে স্মরণ কর যখন হাওয়ারীগণ আরজ করলো, হে ঈসা এবনে মরয়ম! আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবার ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করতে পারেন? ঈসা বলেন, তোমরা যদি প্রকৃত মোমেন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।

(১১৩) তারা বলে, আমাদের উদ্দেশ্য হল এই, আমরা তা থেকে আহার করি, আমাদের চিত্ত তৃপ্তি লাভ করে, তুমি যে আমাদেরকে সত্য বলেছ তা আমরা জানতে পারি এবং আমরা তার সাক্ষী থাকি।

(১১৪) তখন ঈসা এবনে মরয়ম দোয়া করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার আল্লাহ! আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাযিল করুন যেন ঐদিন আমাদের জন্যে পূর্বাপর আনন্দের দিন হয়, আর আপনার পক্ষ থেকে তা নিদর্শন স্বরূপ হয়ে থাকে, আর আমাদেরকে রিয্ক দান করুন এবং আপনি উত্তম রিয্ক প্রদানকারী।

(১১৫) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আমি তোমাদের প্রতি উক্ত খাঞ্চা অবশ্যই নাযিল করবো তবে এরপর তোমাদের মধ্যে যে কেউ কুফরী করবে আমি তাকে এমন কঠিন শাস্তি দেব যা পৃথিবীতে অন্য কাউকেও দেবনা।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি যখন ঈসা এবনে মরয়মের সাথীদেরকে ওহীর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করি যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন তখন তারা বললো, আমরা ঈমান এনেছি। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা আপনার পূর্ণ অনুগত।

তফসীরকারগণ এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে "ওহী" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা কোন্ অর্থে হয়েছে? কেননা, ওহী আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকটই প্রেরিত হয়। এর জবাবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে ওহী শব্দটি এলহামের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানব মনে কোন কথা প্রবেশ করিয়ে দেয়া, যেমন পবিত্র কোরআনেই রয়েছে ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ

(আমি মূসার মাতার নিকট ওহী পেরণ করলাম যেন সে মূসাকে দুধ পান করায়।) এক্ষেত্রে মূসা (আঃ)-এর মাতার নিকট ওহী প্রেরণের কথা রয়েছে অথচ তিনি নবী নন। এর অর্থ হল তাঁর অন্তরে এ সম্পর্কে এলহাম করা হয়েছে তথা তাঁর অন্তরে এ কথাটি সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এ অবস্থাকেই 'ওহী' বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ওহী শব্দটিকে এ অর্থে একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন–

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ

যাহোক, আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথীদেরকে অনুপ্রাণিত করলেন তথা আদেশ দিলেন যেন তারা রসূলের প্রতি ঈমান আনে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম ঈমানের কথা বলা হয়েছে। এরপর ইসলামের উল্লেখ রয়েছে। কেননা, ঈমান হলো কলবের গুণ তথা মানব মনের বিশ্বাসের ব্যাপার। আর ইসলাম হলো যে বিষয়ের প্রতি অন্তরে ঈমান রয়েছে প্রকাশ্যে তার সঠিক বাস্তবায়ন। আমরা কথাটিকে অন্য ভাবেও বলতে পারি। ঈমান হলো আল্লাহ পাক ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস। আর ইসলাম হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। আর সে আনুগত্য হতে হবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক। তাই মানব মনে যখন ঈমান আসে আর সেই ঈমান হয় প্রকৃত এবং খাঁটি, তখন সেই মানুষটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।[২]

---

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩৫
২. তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১২৮

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যে বিশেষ দান করেছেন এবং তাঁকে যে বিশেষ মোজেযা দিয়েছেন তার উল্লেখ রয়েছে। যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট এ আবদার করেছিলেন যে, তাদের জন্যে আসমান থেকে খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাযিল হোক। এতে তাদের রিয্ক থাকবে যা তারা আহার করবে এবং যেদিন আসমান থেকে তাদের জন্যে খাদ্য আসবে, সেদিন তাদের জন্যে হবে মহা আনন্দের দিন।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। 'মায়েদাহ,' শব্দের অর্থ হল খাদ্য ভরা খাঞ্চা। আর এটি ছিল একটি বিস্ময়কর ঘটনা, হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রদত্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোজেযা। যেহেতু এটি একটি বিশেষ ঘটনা তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা মায়েদাহ'। এটি নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের এক সুস্পষ্ট দলিল। তিনি যে আল্লাহ্ পাকের খাছ বন্দা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখানে উল্লেখ্য, ঈমান এবং ইসলাম হলো আধ্যাত্মিক এবং আখেরাতের নেয়ামত যার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, আর 'মায়েদাহ' হলো জাহেরী বা প্রকাশ্য নেয়ামত এবং দুনিয়ার জিন্দেগীর নেয়ামত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তারা তাঁর কাছে একটি আবদার করলেন যে, যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের নিকট খাদ্য ভরা খাঞ্চা আসতো তবে আমাদের মন শান্তি লাভ করতো।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গীদের তরফ থেকে এ আরযী তাদের কোন সন্দেহের কারণে পেশ করা হয়নি; বরং তারা নিতান্ত আরযী এবং আবদার হিসেবেই এ দরখাস্ত পেশ করেছে যে, হে আল্লাহ্র নবী! যদি আপনার বরকতে আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ পাক দয়া করে পূর্ণ করেন তবে তা হবে আমাদের জন্যে শান্তি এবং সান্ত্বনার কারণ। আমরা আমাদের মনকে নিশ্চিন্ত করতে চাই। আর আপনার এ মোজেযার উপর আমরা সাক্ষী থাকতে চাই।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ঃ

قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। কেননা, এমন আরযী আল্লাহ পাকের দরবারের আদবের খেলাফ, যা অস্বাভাবিক তা চাওয়া দুশমনদের কাজ, অনুসারীদের কাজ নয়; আর এ আরযী দ্বারা একথা প্রকাশ পায় যে, তোমাদের অন্তরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত ও রেসালতের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ রয়েছে। তার জবাবে তারা বললো, আমরা যে খাদ্য ভরা খাঞ্চার আরযী পেশ করছি তা থেকে আমরা আহার করতে চাই এবং এতদ্বারা আমাদের মন শান্তি লাভ

করবে, আর আমাদের একীন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে একথার উপর যে আমাদের নবী যা বলেছেন তা নিতান্ত সত্য।

এ জবাবের পর হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ্! আসমান থেকে আমাদের জন্যে খাঞ্চা নাযিল কর। আমাদের পূর্বাপর সকলের জন্যে তা হবে মহা আনন্দের কারণ। আর হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে রিয্ক দিও, নিশ্চয় তুমি উত্তম রিয্ক দাতা। আল্লাহ্ পাক তখন এরশাদ করলেনঃ খাদ্য ভরা খাঞ্চা আমি আসমান থেকে নাযিল করবো কিন্তু মনে রেখো, এ জীবন্ত নিদর্শন দেখার পরও যদি কেউ অবাধ্য তথা কাফের হয় তবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব যা পৃথিবীতে আর কোন সম্প্রদায়কে দেইনি।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ার পর আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে আসমান থেকে মায়েদাহ্ নাযিল করেছিলেন কিন্তু দূরাত্মা হতভাগা বনী ইসরাঈল জাতি এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র নাফরমান হয়েছিল। পরিণামে আল্লাম পাক তাদেরকে শুকর ও বানরে পরিণত করেছিলেন। এটিই ছিল নাফরমানদের শাস্তি। এমন শাস্তি পৃথিবীতে এরপর আর কোন জাতিকে দেয়া হয়নি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তিনটি দোয়া করেছিলেন–

(১) হে আল্লাহ! যেভাবে অন্য কোন কোন জাতিকে তুমি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ আমার উম্মতকে তাদের ন্যায় চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিওনা। আল্লাহ পাক এ দোয়া মঞ্জুর করেছেন।

(২) হে আল্লাহ! যেভাবে অন্য জাতিকে তুমি শুকর বানরে পরিণত করেছ, এভাবে আমার উম্মতকে তুমি শুকর বানরে পরিণত করোনা। আল্লাহ পাক এ দোয়াও মঞ্জুর করেছেন।

(৩) হে আল্লাহ! আমার উম্মতে যেন খুন খারাবী না হয়। আল্লাহ্ পাক এ দোয়া মঞ্জুর করেননি।

মায়েদার বিবরণ

বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) যখন দোয়া করলেন তখন লাল বর্ণের একটি খাঞ্চা মানুষের সম্মুখেই আসমান থেকে নীচের দিকে অবতরণ করতে লাগলো। তার উপর এবং নীচে দু'টি আবর খন্ড ছিল, খাঞ্চাটি এসে অবতরণ করলো। এ দৃশ্য দেখে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শোকরগুজার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর আসমান থেকে যা অবতরণ করেছ তাকে আমাদের জন্যে রহমত বানাও, আযাবে

পরিণত করোনা। ইহুদীরাও এ দৃশ্য দেখছিল যা ইতিপূর্বে তারা কোন দিন দেখেনি। এদিকে খাঞ্চা থেকে এমন খুশবু বের হচ্ছিল যা ইতিপূর্বে কোন দিন পাওয়া যায়নি।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক নেককার সে যেন বিসমিল্লাহ পাঠ করে এর ঢাকনা খোলে। তখন হাওয়ারীদের নেতা সামুন সেগার আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনিই এর যোগ্য। হযরত ঈসা (আঃ) দন্ডায়মান হলেন এবং অজু করে সুদীর্ঘ নামায আদায় করে অনেক ক্রন্দণ করলেন এবং বিস্মিল্লাহ পাঠ করে খাঞ্চার ঢাকনা খুললেন এবং বললেন, 'বিসমিল্লাহি খায়রুর রাযিকীন"। খাঞ্চায় একটি ভুনা মাছ ছিল যাতে কোন কাঁটা ছিল না। তা থেকে তেল বেরিয়ে আসছিল। মাছের মাথার দিকে লবন এবং পায়ের দিকে সিরকা রাখা ছিল, চারি পার্শ্বে ছিল রকমারী তরকারী। পাঁচটি রুটিও ছিল। একটির উপর জয়তুন ছিল, দ্বিতীয়টির উপর মধু ছিল, তৃতীয়টির উপর ঘি, চতুর্থটির উপর পনির এবং পঞ্চম রুটির উপর ছিল গোশ্তের টুকরো। সামুন আরজ করলেন, হে রুহুল্লাহ! এ খাবার কি দুনিয়ার না আখেরাতের?

তিনি বললেনঃ তোমাদের সম্মুখে যে খাবার রয়েছে তা দুনিয়ার খাবারের ন্যায়ও নয়, আখেরাতের খাবারের ন্যায়ও নয়; বরং আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে তা তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। তোমরা চেয়েছিলে এখন তা আহার কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তাঁর দানে তিনি তোমাদেরকে ধন্য করবেন।

হাওয়ারীগণ আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ নবী! আপনিই সর্বপ্রথম খাবার শুরু করুন। তিনি বললেনঃ আমি এ খাবার থেকে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি। যে এর দরখাস্ত করেছিল তারই উচিত এ খাবার গ্রহণ করা। একথা শ্রবণ করে হাওয়ারীগণ ভীত হলো এবং খাবারে হাত দিলনা। হযরত ঈসা (আঃ) তখন ক্ষুধার্ত, ফকির, অসুস্থ, কুষ্ঠরোগী, শ্বেতরোগী, খোঁড়া, পঙ্গুদেরকে আহবান করলেন এবং বললেনঃ তোমরা আল্লাহর প্রেরিত রিয্ক আহার কর, তোমাদের জন্যে তা মোবারক, আর অন্যদের জন্যে তা মুসিবত। তাই সকলে সেই খাবার গ্রহণ করলো, এক হাজার তিন শত অসুস্থ পঙ্গু, বিপদ গ্রস্ত নারী-পুরুষ ঐ খাবার খেয়ে তৃপ্তি লাভ করলো।

কিন্তু মাছটি যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। এরপর খাঞ্চাটি উপরের দিকে উঠে গেল এবং মানুষের চোখের সামনেই উপরে যেতে থাকল, অবশেষে চোখের আড়াল হয়ে গেল। যে অসুস্থ বা পঙ্গু লোক খেয়েছিল সে সুস্থ হলো, আর যে দরিদ্র লোকেরা খেয়েছিল তারা ধনী হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে যারা খায়নি তারা লজ্জিত হলো। খাঞ্চা অবতরণের এ ধারা ৪০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত রইলো। প্রত্যহ সকালে চাশ্তের নামাযের সময় এ খাঞ্চা আসমান থেকে অবতরণ করতো, ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়

সকল প্রকার মানুষই তখন সমবেত হতো এবং সকলের সম্মুখেই তা রাখা হতো, সকলে খাবার গ্রহণের পর যখন প্রত্যাবর্তন করতো তখন খাঞ্চাটি উপরের দিকে উঠে সবার চোখের আড়াল হয়ে যেত।

কোন কোন বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, এ আসমানী খাঞ্চা সামুদ সম্প্রদায়ের উষ্ট্রীর ন্যায় একদিন পর একদিন আসত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন এবং বললেনঃ আমি আমার এ খাঞ্চা এবং রিয্ক শুধু ফকির মিসকিনের জন্যে নিদৃষ্ট করলাম, ধনীদের জন্যে এতে কিছু নেই।

এ আদেশ সম্পদশালী লোকদের অপছন্দ হলো, তারা নিজেরাও সন্দিহান হলো এবং অন্যদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগলো। তারা বললোঃ যদি এ খাঞ্চা সত্যি সত্যিই আসমান থেকে আসে তবে এতে ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য কেন হবে? আল্লাহ পাক তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ আমি পূর্বাহ্নে এ শর্ত দিয়েছিলাম যদি খাঞ্চা নাযিল হওয়ার পর কেউ কুফরী করে তবে তাকে এমন শাস্তি দেব যা অন্য কোন সম্প্রদায়কে দেয়া হয়নি। এখন যেহেতু তারা নাফরমানী করেছে তাই আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) আরজী পেশ করলেনঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

“যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও (তবে দিতে পার) কেননা, তারা তোমার বন্দা, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার হক্ব তোমার রয়েছে, আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তা–ও হতে পারে কেননা, তুমিই পরাক্রমশালী, তুমি বিজ্ঞানময়, তোমার কোন ইচ্ছাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আর ক্ষমা করার যে উপকারিতা রয়েছে তা তুমি ভালভাবেই জান। কেননা, তুমি মহাজ্ঞানী”।

যাহোক, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের ৩৩৩ জনকে শাস্তি দেয়া হলো। রাতে তারা মানুষের আকৃতি নিয়েই ঘুমিয়েছিল কিন্তু সকালে তারা কোপগ্রস্ত হলো। শুকরে পরিণত হলো এবং পথের ময়লা খেতে লাগলো।

লোকেরা এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলো। যারা শুকরে পরিণত হয়েছিল তারাও হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে এসে ঘোরাফেরা করতে লাগলো এবং ক্রন্দন করতে লাগলো। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের নাম ধরে ডাকলেন, আর তারা একে অন্যকে ইশারা করতো এবং কাঁদতো; কোন কথা বলতে পারতো না। এ অবস্থায় তিন দিন জীবিত ছিল। এরপর সকলেই মরে গেল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, খাল্লাস এবনে আমর হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ (ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের জন্যে) খাদ্য ভরা খাঞ্চা অবতরণ করলো, তাতে গোশ্ত এবং রুটি ছিল। বণী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল তোমাদের জন্যে এ মায়েদাহ, তোমরা খেয়ানত করোনা এবং খাঞ্চার কোন বস্তু গোপন করোনা কিন্তু তারা ঐ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই খেয়ানত করলো এবং কিছু জিনিস আগামী দিনের জন্যে গোপনও রাখলো। অবশেষে তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করা হলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) বণী ইসরাঈলকে বলেছিলেনঃ তোমরা ৩০টি রোজা রাখ। এরপর যা ইচ্ছা আল্লাহর নিকট চাও। তিনি তোমাদেরকে দান করবেন।

হুকুম মোতাবেক লোকেরা রোজা রাখল এবং রোজা সুসম্পন্ন করার পর তারা বললো, আমরা যদি কারো কাজ করি তবে সে আমাদেরকে খাবার দেয়। এখন আল্লাহর জন্যে আমরা রোজা রেখেছি তাই আল্লাহ্ পাকের নিকট আমরা খাবার চাই। তাই তারা খাদ্য ভরা খাঞ্চা অবতরণের দরখাস্ত করলো। তাদের দোয়া কবুল হলো, আল্লাহর ফেরেশতাগণ খাদ্য ভরা খাঞ্চা বহন করে নিয়ে আসলেন। তাতে সাতটি রুটি এবং সাতটি মাছ ছিল। সকল পর্যায়ের লোকেরা তা থেকে আহার করলো। আর খাবার শুরু করার পূর্বে যে পরিমাণ খাবার ছিল সর্বশেষ ব্যক্তির খাওয়ার পরও তাই রয়ে গেল।

কা'বে আহবার বলেছেনঃ মায়েদাহ্ মাথা ঝুঁকিয়ে অবতরণ করেছিল। আসমান এবং জমিনের মধ্যখানে ফেরেশতাগণ তাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। তাতে গোশ্ত ব্যতীত আর সবই ছিল।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তাতে জান্নাতের ফল ছিল। আতিয়া উফি বলেছেন, একটি মাছ আসমান থেকে অবতরণ করেছিল যাতে সবকিছুর স্বাদ ছিল।

কালবী (রঃ) বলেছেন, তাতে চাউলের রুটি ছিল। হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি অনুযায়ী খাঞ্চায় গোশ্ত এবং রুটি ব্যতীত আর সব কিছু ছিল। ওহাব এবনে মোনাব্বেহ বলেছেন, তাতে আল্লাহ্ পাক জবের ছোট ছোট রুটি এবং মাছ নাযিল করেছিলেন। কিছু লোক খাবার শেষ করে চলে যেত এবং পরে অন্য লোক এসে খাবার গ্রহণ করতো। এমনকি শেষ পর্যন্ত সকলে খাওয়ার পরও খাবার বেঁচে গেল।

কালবী এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক রুটি এবং মাছ পাঠিয়েছিলেন। মানুষের সংখ্যা এক হাজারের উপরে ছিল। সকলে সেই খাবার গ্রহণ

করেছে, আর নিজ নিজ বস্তিতে প্রত্যাবর্তন করে এর আলোচনা করে। যারা এ মজলিসে আসেনি তারা এ বিষয় শ্রবণ করে হাসতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, তোমাদেরকে বোধ হয় নজরবন্দী করা হয়েছিল। যার কল্যাণ সাধন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছিল সে ঈমানের উপর কায়েম রয়েছে। আর যার ধ্বংস হওয়া মঞ্জুর হয়েছিল সে কুফরের দিকে চলে গিয়েছে। পরিণামে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে শুকরে পরিণত করেন। এদের মধ্যে কোন শিশু বা স্ত্রীলোক ছিল না (সকলেই পুরুষ ছিল)। এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সকলেই মরে যায়। তারা কোন কিছুই পানাহার করেনি, তাদের বংশ রয়নি।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ
اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ
بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ
نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِيْ بِهٖۤ اَنِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾
اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾
قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

তরজমা

(১১৬) আর যখন আল্লাহ বলেনঃ হে ঈসা এবনে মরয়ম! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাতাকে দু'জন মা'বুদ স্থির করে লও? ঈসা এবনে মরয়ম বলেন, পবিত্র মহিমাময় তুমি হে আল্লাহ! আমার মুখে এমন কথা সাজেনা, যাতে আমার কোন অধিকার নেই। যদি আমি এমন কথা বলে থাকি তবে অবশ্যই তুমি তা জেনে থাকবে। আমার মনে কি আছে তা তুমি সবই জান, আর তোমার মনের কথা আমি কিছুই জানিনা। নিশ্চয় গায়ব বা গোপন বিষয় সমূহ উত্তম রূপেই তুমি জান।

(১১৭) আমি তাদেরকে শুধু সে কথাই বলেছি যার আদেশ তুমি আমাকে দিয়েছ যে, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর যিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক, যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন আমি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম, এরপর যখন আমাকে তুমি উঠিয়ে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধায়ক আর তুমিই সর্ব বিষয়ের সাক্ষী।

(১১৮) যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারাতো তোমারই বন্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমিতো পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

(১১৯) আল্লাহ্ পাক বলবেন, আজকের দিনে সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্যে উপকৃত হবে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। যার পাদদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও তাঁর প্রতি রাজী। আর এটিই হলো মহান সাফল্য।

(১২০) আসমান জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের, তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতেও সে ঘটনারই পরিসমাপ্তি উল্লেখিত হয়েছে। যে কথা আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন তার শেষাংশ এ আয়াত সমূহে স্থান পেয়েছে।

আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতার প্রতি যে মহান নেয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এরপর খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে যে সব বাতিল ও অলীক কথাবার্তা বলেছে তার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন ঈসা (আঃ)-কে যে কথা সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হবে তার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আল্লাহ পাক ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলবেনঃ হে ঈসা এবনে মরয়ম! তুমি কি লোকদেরকে তোমাকে এবং তোমার মাতাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে বলেছিলে?

মহান আল্লাহ পাকের এ প্রশ্নের জবাবে ভীত এবং বিনীত হয়ে ঈসা (আঃ) আরজ করবেনঃ পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! কিভাবে আমার পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব হবে, আমি তাদেরকে তোমার নির্দেশ ব্যতীত কিছুই বলিনি। তুমি যা আদেশ দিয়েছ আমি শুধু তাই বলেছি। আমি শুধু একথাই বলেছি, তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর যিনি আমার এবং তোমাদের সকলের প্রতিপালক, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, এটি আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নিয়েছেন তখনই তাঁকে এ কথা বলেছিলেন, কেননা قال শব্দটি দ্বারা অতীত কালকে বোঝায়। কিন্তু অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এসব কথা কেয়ামতের দিন হবে। পূর্বেই আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের ভাষায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কেয়ামতের দিনের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যেন এর দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তাদের সম্মুখে তাদের শোচনীয় পরিণাম তুলে ধারা হয়।

ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শানে বেয়াদবী করেছে। তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করেনি। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাঁকে শহীদ করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। পক্ষান্তরে, খৃষ্টানরা তাঁর সম্পর্কে সীমা লঙ্ঘন করেছে। তিনি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল অথচ তারা তাঁকে খোদার আসনে বসিয়েছে, এর চেয়ে বড় হীন এবং নিন্দনীয় আর কোন কথা হতে পারেনা। যদিও একথায় সম্বোধন করা হয়েছে ঈসা (আঃ)-কে কিন্তু এতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে ইহুদী ও নাসারাদের উদ্দেশ্যে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের উম্মতদের ডাকা হবে। এরপর ঈসা (আঃ)-কে তলব করা হবে এবং তাঁকে যে নেয়ামত সমূহ দান করা হয়েছে তার উল্লেখ করা হবে, এরপর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্ন তাঁকে করা হবে। তিনি আরজ করবেনঃ আমি আমার উম্মতকে একথা বলিনি যে, তারা আমার এবাদত করুক। তখন নাসারাদেরকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা বলবে হ্যাঁ, তিনি হুকুম দিয়েছিলেন।

একথা শ্রবণ করে হযরত ঈসা (আঃ) এত ভীত হবেন যে, তাঁর শরীর এবং মাথার চুল দাঁড়িয়ে যাবে এবং নাসারারা এক হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির থাকবে। অবশেষে তাদের সম্মুখে দলিল কায়েম হয়ে যাবে এবং সত্য প্রকাশিত হবে। একথাও প্রমাণিত হবে যে, সত্য কথা বলার শাস্তি স্বরূপ হযরত ঈসা (আঃ)-কে শুলে চড়াবার ভয় দেখানো হয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে আদব এবং সৌন্দর্য।

سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ

অর্থাৎ পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! আমার জন্যে আদৌ শোভনীয় ছিলনা যে আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নাই। যদি আমি বলে থাকি তবে তা তোমার জানা থাকবে। তুমি তো অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠের সকল গোপন খবর রাখ।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ

হে আল্লাহ! যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও (তবে দিতে পার তা অযৌক্তিক নয়) কেননা, তারা তোমার বন্দা। আর মালিক তার গোলামের ব্যাপারে যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে, এতে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। বিশেষতঃ এমন অবস্থায় যখন তুমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাদেরকে লালন পালন করেছ। অথচ তারা অন্যের গুণগান করেছে, তাদের শাস্তি বিধান করা কোন অবস্থাতেই অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়।

وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ

হে আল্লাহ! আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তা-ও সম্ভব। কেননা, তুমি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। তোমার ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। তুমি আযাব অথবা সওয়াব দেয়ার অধিকার ও শক্তি রাখ। তুমি কাউকে মাফ করে দিলে তা কোন দুর্বলতার কারণে হবে না; বরং তোমার দয়ার কারণে হবে।

মোটকথা, তুমি আযাব দিলে তা হবে ইনসাফ আর যদি তুমি ক্ষমা করে দাও তবে তা হবে তোমার মেহেরবানী।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আয়াতখানি সারা রাত পাঠ করেছেন–

হযরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার সারা রাত এ আয়াতখানি পাঠ করতে থাকেন। সকালে যখন তাঁর খেদমতে আরয করা হয় যে কি কারণে একই আয়াত আপনি বার বার পাঠ করতে থাকেন? তখন তিনি এরশাদ করেনঃ আমি আল্লাহ পাকের নিকট উম্মতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলাম।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এবনে মরদবিয়ার বর্ণনা হলো এই– হযরত আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। রাত্রে আপনি নামাজের মধ্যে দন্ডায়মান অবস্থায় পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াত এতবার পড়েছেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন করতো তবে আমরা তার প্রতি

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪০

রাগ করতাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে দোয়া করেছি। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনার দোয়ার পর কি জবাব পাওয়া গেছে?

তিনি এরশাদ করেনঃ এমন জবাব পাওয়া গেছে যদি মানুষ তার খবর পায় তবে অনেকেই নামায ছেড়ে দেবে। বর্ণনাকারী আরয করলেনঃ আমি কি এ সুসংবাদ মানুষকে দেব? তিনি এরশাদ করলেনঃ কেন দেবেনা? তখন হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি এ খবর মানুষের নিকট প্রেরণ করেন তবে তারা এবাদত পরিত্যাগ করবে এবং ঐ খবরের উপর ভরসা করেই বসে থাকবে। এ কথা শ্রবণ করে তিনি বর্ণনাকারীকে ফেরত ডেকে নিলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ইমাম মুসলিম এবং নেসায়ী হযরত আবদুল্লাহ এবন আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর সূত্রে এমনি হাদীস সংকলন করেছেন।[১]

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন এ দোয়া করলেন যে হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতকে মাফ করে দিও। এ দোয়ার সময় ক্রন্দন করছিলেন, তখন আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করলেনঃ হে জীব্রাঈল! তুমি মোহাম্মদের নিকট জিজ্ঞাসা কর এ ক্রন্দনের কারণ কি? (যদিও সে কারণ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল) জীব্রাঈল (আঃ) এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দোয়া পাঠ করছিলেন তা বলে দিলেন। তখন আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন, হে জীব্রাঈল! তুমি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট গমন করে তাঁকে বল আমি তাঁর উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্ট করবো, অসন্তুষ্ট করবোনা।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ এ হলো সেদিন যেদিন সততা পরায়ণ লোকদের সততা তাদের জন্যে উপকারী হবে অর্থাৎ কেয়ামতের দিন ঈমানদার, সততাপরায়ণ লোকদের সততা তাদের জন্যে বিশেষভাবে উপকারী হবে। কেননা, সেদিন ঈমানদার নেককারগণ তাদের জীবন–সাধনার সার্থকতা দেখতে পাবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯৯

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "সাদেকীন" অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরাম। কালবী (রঃ) বলেছেন, এখানে সাদেকীন অর্থ মোমেনগণ, অর্থাৎ মোমেনগণ কেয়ামতের দিন তাদের আমলের সওয়াব বা শুভ পরিণতি লাভ করবেন। সেই শুভ পরিণতির বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে–

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশতের বাগ-বাগিচা যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। আর সেই জান্নাত সমূহে তারা চিরদিন থাকবে। শুধু তাই নয়; বরং

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

(আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, আর তারাও তাঁর প্রতি থাকবে অতি সন্তুষ্ট।)

তফসীরকারগণ এ বাক্যের অর্থ লিখেছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং এবাদতের সাধনাকে পছন্দ করবেন আর এটিই হবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে যে সওয়াব দান করা হবে জান্নাতবাসীগণ তা দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন, আর এটি হলো তাদের সন্তুষ্টি।

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থাৎ এটিই হলো মহান সাফল্য আর এ সাফল্য হলো চিরন্তন। পক্ষান্তরে পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কোন সাফল্য অর্জন করা হলে তা হয় ক্ষণস্থায়ী সাফল্য।

এরপর আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্বের কথা রয়েছে এবং ঈসায়ীদের ভ্রান্ত মতবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط

অর্থাৎ আল্লাহ পাকেরই নিরংকুশ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে আসমান এবং জমিনে আর যা কিছু তার মাঝে রয়েছে তাতে।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বোপরি তিনি সর্বশক্তিমান যা ইচ্ছা তিনি তা করতে পারেন। পৃথিবীর অস্তিত্ব প্রদান এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করণ সবই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন। সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন।

(আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য) ১৫ই জমাদিউল আউয়াল ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার রাত সোয়া এগারটায় সূরা মায়েদার তফসীর শেষ হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর।

সূরা আনআ'ম

(মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৬৬, রুকু-২০)

সূরা আনআ'ম প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কা শরীফে হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। শুধু ৬ খানি আয়াত হিজরতের পর মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এ সূরা রাত্রিকালে একই সঙ্গে নাযিল হয়। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে ওহী লেখককে ডাক দিয়ে এ সূরাটি লিপিবদ্ধ করিয়ে দেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন এ সূরা নাযিল হয় তখন ৭০ হাজার ফেরেশতা তার সঙ্গে আসে এবং তসবীহ পাঠ করতে থাকে।[১]

হযরত আসমা বিনতে এজিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রের উপর আরোহী ছিলেন। এমন সময় সূরা আনআ'ম নাযিল হওয়া শুরু হয়। আমি উষ্ট্রের রশি ধরেছিলাম। ওহীর চাপে উষ্ট্র ঋজু হয়ে যায়। মনে হয় তার হাড়গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফেরেশতাগণ আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। সূরা আনআ'ম নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তসবীহ পাঠ করতে থাকলেন এবং এরশাদ করলেনঃ এ সূরার সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা এসেছে। ফেরেশতাদের তসবীহ ছিলঃ "সোবহানাল্লাহি বিহামদিহি, সোবহানাল্লাহিল আযীম"। ফেরেশতাদের এ তসবীহ'র গুঞ্জনে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল।[২]

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সূরা আনআ'ম ব্যতীত অন্য কোন সূরা এক সঙ্গে আমার নিকট নাযিল হয়নি।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরার দু'টি বৈশিষ্ট্য এবং ফজিলত রয়েছে—

১. এ সূরা একই সঙ্গে নাযিল হয়েছে।

২. এ সূরার সঙ্গে ৭০ হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছে।

এর কারণ এই, এতে তৌহীদ ও নবুওয়্যতের দলিল রয়েছে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা এবং বাতিলপন্থীদের তথা পৌত্তলিক বা মুশরেকদের পথভ্রষ্টতার ঘোষণা রয়েছে।[৩]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪২
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৪১
খোলাসাতুত তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৫৭৮

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ وَّهِیَ مِائَةٌ وَّخَمْسٌ وَّسِتُّوْنَ اٰیَةً وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ۬ ؕ
ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ
ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ﴿٢﴾ وَهُوَ
اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ ؕ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿٣﴾
وَمَا تَاْتِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ﴿٤﴾
فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ یَاْتِیْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ
یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٥﴾

তরজমা

(১) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের যিনি আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলো ও আঁধার তৈরী করেছেন। এতদসত্ত্বেও কাফেররা অন্যদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমতুল্য সাব্যস্ত করে।

(২) তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি মৃত্তিকা দ্বারা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আবার একটি সময় নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন, আর তাঁর নিকটও একটি সময় নিদৃষ্ট রয়েছে তবু তোমরা সন্দেহ পোষণ কর।

(৩) তিনিই আল্লাহ (সত্য মা'বুদ) আসমান এবং জমিনে, তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সমূহ এবং তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তিনি অবগত।

(৪) তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের যে কোন নিদর্শনই আসুক না কেন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৫) বস্তুতঃ সত্য যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তারা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো অচিরেই তার যথার্থ বিবরণ তাদের সম্মুখে আসছে।

তফসীরুল কোরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ পাকের জন্যে। এতদ্বারা বন্দাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যেন তারা আল্লাহ্ পাকের হামদ্ করে, এর পাশাপাশি একথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের কারো প্রশংসার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক। কেননা, প্রশংসা মানেই আল্লাহর জন্যে এবং সকল প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যেই।

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

যিনি আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ব কোন দৃষ্টান্ত ব্যতীত। এতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের জন্যে যে সকল প্রশংসা তার পক্ষে কোন দলিল প্রমাণের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব ব্রম্মান্ডের সৃষ্টিই তাঁর প্রশংসিত হওয়ার প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আসমান জমিনের সৃষ্টির কথা বিশেষভাবে এজন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্ব প্রথম আসমান জমিনের প্রতিই মানুষ দৃষ্টিপাত করে, আর এ আসমান–জমিনের মধ্যে অগণিত বিস্ময়কর, শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে। আর অনেক বিষয়ের সঙ্গে মানব জীবন সম্পৃক্ত রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, দিন ও রাতের পরিবর্তন আবহমান কাল ধরে হয়ে আসছে, আর কোন পরিবর্তন পরিবর্তনকারী ব্যতীত হয়না। কা'বে আহবার বলেছেন, এটিই হলো তৌরাতের প্রথম আয়াত। আর সর্বশেষ আয়াত হলো–

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে সৃষ্টির আলোচনা শুরু করেছেন হামদ্ দ্বারা এবং এরশাদ করেছেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

এবং মানুষের জীবনাবসানের কথাও উল্লেখ করেছেন হাম্‌দ সহ, এরশাদ হয়েছেঃ

وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার এবং আলোকে। নূর হলো কল্যাণ, আর জুলমাত বা অন্ধকার হলো অকল্যাণ। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জুলমাত (অন্ধকার) কুফরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর নূরের

অর্থ হলো ঈমান আর যেহেতু কুফরের পথ অনেক তাই 'জুলমাত' শব্দটি (বহুবচন) ব্যবহৃত হয়েছে। আর ঈমানের পথ একটিই, তাই নূর একবচন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে একটি সরল রেখা টেনে দিয়েছেন, এটি হলো আল্লাহ পাকের পথ। এরপর ঐ সরল রেখার ডানে বামে অনেক রেখা টেনে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, এর প্রত্যেকটিতে শয়তান বসে আছে। সে মানুষকে নিজের দিকে ডাকে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ

এটিই আমার সঠিক পথ। অতএব, তোমরা এ পথের অনুসরণ করো। (আহমদ, নেসায়ী, দারমী) যেহেতু আঁধারের অস্তিত্ব আলোর পূর্বে হয়, তাই জুলমাত (আঁধার) শব্দটিকে নূরের পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারের মধ্যে পয়দা করেছেন। এরপর তিনি তাদের উপর নিজের নূর বিচ্ছুরিত করেছেন। যে ঐ নূরের অংশ পেয়েছে সে হেদায়েত লাভ করেছে। আর যে ঐ নূর পায়নি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এজন্যেই তো আমি বলি আল্লাহ্ পাকের এলম্ মোতাবেক (লিপিবদ্ধ করার পর) কলম শুস্ক হয়ে গেছে। (আহমদ, তিরমিজি)

ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা এবাদত ও তা'যীমের ব্যাপারে অন্য কিছুকে বিশ্ব প্রতিপালকের সমতুল্য মনে করে। যারা অগ্নিপূজক তারা বলে, খোদা দু'জন একজন পূণ্যের স্রষ্টা তার নাম হলো ইয়াজদান, আরেকজন পাপের স্রষ্টা তার নাম হলো আহরেমান। অগ্নিপূজকরা তাদের ধারণা মোতাবেক উভয় খোদাকে যথাক্রমে নূর এবং জুলমাত নামে অভিহিত করে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে পৌত্তলিকরা তথা বহুত্ববাদীরা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতায় বিশ্বাস করে। এদিকে আর্য সমাজ তৌহিদে বিশ্বাসের কথা দাবী করে কিন্তু ধাতু এবং আত্মাকে অনাদি এবং অবিনশ্বর বলে বিশ্বাস করে। শুধু তাই নয়, সৃষ্টির পরিচালনার ব্যাপারে তারা আল্লাহকে ধাতু এবং আত্মার মুখাপেক্ষী বলে মনে করে। (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক) আল্লাহ পাক কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন।

খৃষ্টানদের অবস্থা আরো শোচনীয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট ইঞ্জিল এসেছে। তিনি এক আল্লাহর বন্দেগী করার তা'লিম দিয়েছেন কিন্তু খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। তারা "তিন এক" এবং "এক তিন" এর গোলক ধাঁধায় পড়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা সম্পর্কে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

আর আরবের পৌত্তলিকরা ছিলো আরো উদার মনা। তারা পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য এমনকি তারকা, বৃক্ষ, পাথর, জীব-জন্তু সব কিছুকেই খোদার সমতুল্য সাব্যস্ত করতে দ্বিধাবোধ করতো না।[১] অথচ, কোন সৃষ্টিই আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না। আল্লাহ পাক স্রষ্টা, পালনকর্তা, রিয্কদাতা, অনাদি, অনন্ত, সর্ব গুণে গুণান্বিত, নিখিল বিশ্বের সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। রোগ-তাপ, জীবন-মৃত্যু সবই তাঁর ইচ্ছায়। তিনি কারো সাহায্য গ্রহণ করেন না। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র-সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি এসব কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি একমাত্র উপাস্য। তাঁর কোন শরীক নেই। অতএব, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। এবাদত শুধু তাঁরই, আর কারো নয়। পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াত বিশ্ববাসীকে এ সত্য গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের এবং শুধু তাঁর বন্দেগী করার তা'লিম দিয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ

"তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে) মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার সুদ্দী বলেছেনঃ আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-কে জমিন থেকে কিছু মাটি আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। জমিন জীব্রাঈল (আঃ)-কে বললোঃ আমি আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় প্রার্থী এজন্যে যে তুমি আমার কোন অংশ নিয়ে যাবে তথা আমার দেহ থেকে কিছু অংশ কমিয়ে দেবে। একথা শ্রবণ করে জীব্রাঈল (আঃ) মাটি না নিয়ে ফিরে গেলেন এবং আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ! জমিন আমার ব্যাপারে তোমার আশ্রয় নিয়েছে। তাই আমি খালি হাতে ফিরে এসেছি।

এরপর আল্লাহ পাক মিকাঈল (আঃ)-কে জমিনের নিকট প্রেরণ করলেন, কিন্তু জমিন আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থী হলো। তখন মিকাঈল (আঃ)–ও খালি হাতে ফিরে গেলেন। অবশেষে আল্লাহ পাক এ উদ্দেশ্যে আজরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। জমিন এবারও আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করলো। তখন আজরাঈল (আঃ) বললেনঃ আমি আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করি।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৪১

যাহোক, মালাকুল মওত জমিনের কথা শ্রবণ করলেন না। সারা পৃথিবী থেকে সামান্য সামান্য মাটি বাছাই করে নিলেন। তাতে লাল, কালো, সাদা সব বর্ণের মাটিই ছিল এবং সকল প্রকারের মাটিকে একত্রিত করা হলো। এ কারণে মানুষের বর্ণ বিভিন্ন। এরপর এ মাটিকে মিষ্টি, লবনাক্ত এবং টক পানির সঙ্গে মিশানো হলো। আর এ কারণেই মানুষের আখলাক, চরিত্র, মেজাজ বিভিন্ন প্রকার হলো। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ জীব্রাঈল এবং মিকাঈল উভয়ে জমিনের প্রতি দয়া করেছে কিন্তু তুমি তা করোনি। তাই এ মৃত্তিকা দ্বারা যাদেরকে আমি বানাবো তাদের রূহ কবজ করার দায়িত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করবো।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন মাটি ও পানি মিশ্রিত করলেন। আর কিছু দিন তাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর তা কাঁদায় পরিণত হলো। এরপর তাকে একটি পুতুলের মত তৈরী করলেন এবং পুতুলের আকৃতি দান করলেন এবং কিছু দিন এভাবে রেখে দিলেন, তা শুষ্ক হলো। এরপর আল্লাহ পাক তাতে রূহ ফুঁকে দিলেন। আল্লামা বগভী (রঃ)-ও এ মত পেশ করেছেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার জন্যে এক মুষ্টি মাটি সমগ্র পৃথিবী থেকে নিয়েছেন আর এ কারণেই মানুষ লাল, সাদা, কালো এবং শ্যামলা বর্ণের হয়। এভাবে বিনম্র স্বভাবের এবং কঠোর মেজাজের লোক হয়। অনুরূপ ভাবে কোন মানুষ চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হয়, আর কেউ হয় চরিত্রহীন। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এর পূর্ববর্তী আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে বিশ্ব মানবের কথা আলোচিত হয়েছে। বলতে গেলে প্রতিটি মানুষ একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব। লক্ষ্যনীয়, আল্লাহ পাক প্রাণহীন জড় পদার্থ মাটি থেকেই আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করেছেন। তাকে জীবন দিয়েছেন। শুধু একটি মাটির তৈরী আকৃতির মধ্যে আল্লাহ পাক রূহ ফুঁকে দিলে তাতে জীবন সঞ্চারিত হয়। পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাঁকে মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ করেন। এখন আকৃতি ও প্রকৃতি মিলে এক নবরূপ লাভ করে। আদি মানব, আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক অভিজাত সৃষ্টি হিসেবে তথা সেরা সৃষ্টি হিসেবে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেন। ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেন তাঁকে সম্মান সূচক সেজদা দিতে এবং পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ

করেন। মানুষের সৃষ্টি যেমন মাটি থেকে ঠিক তেমনি মানুষের আহার্যও আল্লাহ্ পাক মাটিতে রেখে দিয়েছেন। মানুষকে মাটি থেকে তার আহার্য আহরণের সুযোগ দিয়েছেন। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের অপার রহমত, অশেষ দান।

কথা এখানেই শেষ নয়; বরং এ জীবনের পর মানুষকে পুনরায় আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে। কেননা, মানুষের এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে। এ জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব একটি নিদৃষ্ট কালের জন্যেই মানুষকে দেয়া হয়েছে। এ নিদৃষ্ট কাল শেষ হওয়া মাত্রই মানুষকে পাড়ি জমাতে হয় পরপারে। তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًاؕ

অর্থাৎ আবার একটি সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর নিকটও একটি সময় নিদৃষ্ট করে রেখেছেন।

আলোচ্য আয়াতে মানব জীবন সম্পর্কে দু'টি সময়ের উল্লেখ রয়েছে। এর তাৎপর্য সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ প্রথম যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হলো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময় এবং দ্বিতীয়বার যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হলো মৃত্যুর পর থেকে হাশরের ময়দানে পুনরুত্থান পর্যন্ত। এছাড়া এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যারা পরহেযগার, নেককার, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি এহসানকারী, পরোপকারী তাদের বয়স ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্ পাক দয়া করে বৃদ্ধিও করে দেন। পক্ষান্তরে, যারা পাপাচারী, আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্টকারী ক্ষেত্র বিশেষ আল্লাহ পাক তাদের বয়স কমিয়েও দেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথম যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হলো নিদ্রা, আর দ্বিতীয় যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা হলো পৃথিবীতে যে সময়টুকু মানুষকে দেয়া হয় তা। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটি হলো এ জীবন, আর পরের সময়টি হলো আখেরাত। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন ঃ উভয় সময়ই এক আল্লাহ্ পাক মানুষকে পৃথিবীতে যে সময় দিয়েছেন তা তিনি নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন, কিন্তু কোন মানুষকে তা জানানো হয় না। কার বয়স কত, কে কত দিন এ ছায়ামায়া ঘেরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তা শুধু এক আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারোই নেই।

এছাড়া কোন কোন ব্যাখাকার বলেছেনঃ প্রথম সময় হলো মৃত্যু, দ্বিতীয়টি কেয়ামত। মৃত্যু সম্পর্কে মানুষ ধারণা করতে পারে কেননা, প্রতিনিয়ত মানুষ অন্যের মৃত্যু দেখে বা খবর শ্রবণ করে, কিন্তু কেয়ামত সম্পর্কে এলম একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথম যে নিদৃষ্ট সময়ের কথা বলা হয়েছে, তা হলো যারা পৃথিবীতে অতীত কালে এসেছিল তাদের কথা। আর পরবর্তী সময় হলো যারা ভবিষ্যতে আসবে তাদের নির্দৃষ্ট সময়ের কথা। যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে এসেছে তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাই তাদের সময় সুনিদৃষ্ট, আর যারা এখনো আসেনি তারা কতকাল পৃথিবীতে থাকবে তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন।

২. এতদ্ব্যতীত এর আরো একটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে মৃত্যু, দ্বিতীয় সময় অর্থ কেয়ামত। কেননা, দুনিয়ার জিন্দেগী সীমিত। আর আখেরাতের জিন্দেগী অনন্ত অসীম, আর আল্লাহ পাক ব্যতীত পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনা।

৩. এর আরেকটি অর্থ হলো– প্রথম সময় জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে এ পৃথিবীতে যে সময় পাওয়া যায় তা। আর দ্বিতীয় সময়ের অর্থ হলো মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়।

৪. আর প্রথম সময় অর্থ হলো নিদ্রা, দ্বিতীয় সময় অর্থ মৃত্যু।

৫. প্রথম সময় অর্থ হলো প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় সময়ের অর্থ হলো প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের যে অংশটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।

অবশেষে আল্লাহ পাক মাটির মানুষকে পুনরায় মাটিতেই ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু মাটির মানুষ মাটিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না; বরং আল্লাহ পাক তাকে মাটি থেকে আবার বের করে আনবেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

"এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো। আর এই মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো"।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ

তিনি বললেনঃ "তোমরা এ পৃথিবীতে জীবন যাপন কর, আর এখানেই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে। অবশেষে তোমরা মাটি থেকে বের হয়ে আসবে"। আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

"তোমরা যত সুরক্ষিত ইমারতে আত্মরক্ষা কর না কেন অবশেষে মৃত্যু তোমাদেরকে পাবে"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ পাক তোমাদের সকলকেই সমবেত করবেন"। আর সূরা জুমআতে আল্লাহ্ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে, অতঃপর তোমরা সেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এরপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবনের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করবেন"।

আর সূরা আর রহমানে আল্লাহ্ পাক বিষয়টিকে এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۞ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"বিশ্ব জগতের বুকে যত কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল, তোমার প্রতিপালকের পবিত্র সত্ত্বাই শুধু স্থায়ী"।

পবিত্র কোরআনের সূরা মূলকের শুরুতে বিষয়টি অন্যভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"মহা মহিমান্বিত তিনি, যিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার লক্ষ্যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম"।

এ আয়াতে মৃত্যুকে জীবনের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তির জীবন লাভের পূর্বেই তার মৃত্যুর মুহূর্ত, দিন তারিখ নিদৃষ্ট হয়ে থাকে। আর একথাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا

(আবার প্রতিটি মানুষের জন্যে আল্লাহ পাক একটি সময় নির্দৃষ্ট করে দিয়েছেন।)

তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে একথাও বলেছেনঃ যেভাবে একজন মানুষের জীবন ও মৃত্যু হয় ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টি এবং লয় হবে। যেভাবে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, পরে হয়েছে, পুনরায় এ অস্তিত্ব থাকবে না। ঠিক তেমনি বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না, আল্লাহ পাক তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং অবশেষে তার লয় হবে, আর লয় কখন হবে তা এক আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেয়ামত কবে আসবে? তখন তিনি বলেছিলেনঃ যখন এ পৃথিবীতে একটি মানুষও আল্লাহ, আল্লাহ বলার মত থাকবে না তখনই মহাপ্রলয় বা কেয়ামত আসবে।

বস্তুতঃ আল্লাহর জিকরই হলো পৃথিবীর প্রাণ। যখন একজন মানুষও আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকবে না তখন এ পৃথিবী থাকারও কোন যুক্তি থাকবে না। তাই মহাপ্রলয় দেখা দেবে এবং তখন সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে মানুষের আগমন এবং এখান থেকে গমন তথা জীবন ও মৃত্যুর যে ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের যে আধিপত্য ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তা লক্ষ্য করে মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, কিন্তু বদনসীব মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করে, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ

(তবু তোমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর।)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ছয় ব্যক্তি এমন যার উপর আল্লাহ পাকের লা'নত এবং আমার ও সকল নবীর লা'নত রয়েছে।

১. যে আল্লাহ পাকের কিতাবে ভাষার দিক থেকে অথবা অর্থের দিক থেকে কোন প্রকার পরিবর্তন করে।

২. যে আল্লাহ্ পাকের নিদৃষ্ট তকদীরকে মিথ্যাজ্ঞান করে।

৩. যে বল প্রয়োগ করে মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, যাকে আল্লাহ পাক অপমানিত করেছেন তাকে সম্মানিত করে। আর যাকে আল্লাহ পাক সম্মানিত করেছেন তাকে অপমানিত করে।

৪. আল্লাহ পাক যে বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন তাকে যে ব্যক্তি হালাল মনে করে।

৫. আল্লাহ পাক যে বস্তুকে হালাল ঘোষণা করেছেন তাকে যে হারাম মনে করে।

৬. যে আমার সুন্নতকে বর্জন করে।

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ

আসমান জমীনে, স্থলে এবং সামুদ্রিক ভাগে ও অন্তরীক্ষে এক কথায় সর্বত্র তিনিই একমাত্র উপাস্য, একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই, নেই কোন উপাস্য, তিনি এক, অদ্বিতীয়, বিশ্ব-জগতের পালনকর্তা তিনিই, পরিচালক তিনিই।

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ

তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, তোমরা যেসব কথা মনের গোপন প্রকোষ্ঠে গোপন কর আর যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ পাক জানেন।

وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ

আর তোমরা ভাল বা মন্দ যা কাজ কর আল্লাহ পাক সে সম্পর্কেও অবগত রয়েছেন। অর্থাৎ তোমাদের মনের অবস্থা এবং তোমাদের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যা কিছু কর, সবই তিনি জানেন। এমনকি যে কাজ তোমরা করোনি ভবিষ্যতে করবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন, এক কথায় তোমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব কিছু আল্লাহ পাকের নখদর্পণে রয়েছে। অতএব, নেককারের শুভ পরিণতি এবং বদকারের শাস্তি প্রদান হবে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো একথা প্রকাশ করা যে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন যেমন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, ঠিক তেমনি সর্ব বিষয়ে তিনি মহাজ্ঞানীও, তিনি জানেন মানুষের মনের কথা। মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপের অবস্থা। এমনকি মানুষের ভবিষ্যতের কর্মকান্ড সম্পর্কেও তিনি অবহিত। অতএব, এ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানি করে তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ

ইতিপূর্বে তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এবং আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ থেকে বিমুখ হওয়া এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র কোরআনের সত্যতায় বিশ্বাস না করার শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, যখনই কাফেরদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ থেকে বিমুখ হয়। যখন তাদের নিকট সত্য আসে, তখন তারা সত্যকে প্রত্যাখান করে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে যে সত্যের কথা বলা হয়েছে তা হলো পবিত্র কোরআন অথবা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র মোবারক সত্ত্বা। কেননা, কাফেররা পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ পাকের কালাম হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অথচ পবিত্র কোরআন এক বিস্ময়কর গ্রন্থ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোজেযা। কাফেরদেরকে একাধিকবার বলা হয়েছে যে তোমরা পবিত্র কোরআনের অনুরূপ তিনটি আয়াত রচনা করে নিয়ে আসো। কিন্তু তারা এতে সক্ষম হয়নি।

অথবা আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত "হক্ব" শব্দটির উদ্দেশ্য হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কাফেররা তাঁকেও মিথ্যা জ্ঞান করেছে। তিনি তাদের দাবী মোতাবেক চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করা সহ অনেক মোজেযা দেখিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবনে কারো নিকট লেখা পড়া শেখেননি অথচ আল্লাহ পাক তাঁকে পূর্বের ও পরের সমস্ত এলম দান করেছেন। এলম এবং হেকমতের ঝর্ণা তাঁর নিকট থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কাফেররা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক কাফেরদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَٰؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

অদূর ভবিষ্যতে তারা যে বিষয়ের প্রতি বিদ্রুপ করে তার সম্পর্কে খবর পাবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তারা তাদের অপকর্মের শাস্তি দেখতে পাবে অথবা এর অর্থ হলো যেদিন ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন তারা তাদের ব্যর্থতা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করবে এবং তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপের ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের অপূর্ব নিদর্শন দেখেও বিমুখ হয়েছে, পবিত্র কোরআনের মোজেযা দেখেও বিশ্বাস করেনি, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিস্ময়কর মোজেযা সমূহ দেখেও বিশ্বাস করেনি; বরং ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে তারা অদূর অবিষ্যতে এর শোচনীয় পরিণাম দেখতে পাবে।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কুফরের তিনটি স্তর রয়েছে,

১. সত্য থেকে বিমুখ হওয়া, সত্য সম্পর্কে গাফলত করা,

২. সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করা,

৩. সত্যকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, আর এটি হলো কুফরের সর্বশেষ স্তর। তাই যারা কুফরের এ স্তরে উপনীত হবে তাদের জন্যে রয়েছে রয়েছে কঠিন শাস্তি যা তারা অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাবে।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ
فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَ
جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا
مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ
فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾
وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ
لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا
يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ
سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

তরজমা

(৬) তারা কি লক্ষ্য করেনা? যে, আমি তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি। তাদেরকে পৃথিবীতে এমন প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদান করেছিলাম যা তোমাদেরকে দান করিনি। আর আমি তাদের প্রতি আসমানকে অবিরাম বর্ষিত হতে দেই, আর আমি তাদের নিম্নদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত করেছিলাম। এরপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণেই ধ্বংস করি, আর তাদের পরে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করি।

(৭) আর (হে রসূল!) যদি আমি আপনার নিকট কাগজে লিপিবদ্ধ কিতাবও অবতরণ করি, আর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শও করতে পারে, তবুও এ কাফেররা বলত এতো সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(৮) আর তারা আরো বলে, তার নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয়নি? অথচ আমি যদি কোন ফেরেশতা নাযিল করি তবে তো মীমাংসাই হয়ে যায়। এরপরতো তাদেরকে এতটুকু অবকাশও দেয়া হবেনা।

(৯) আর যদি আমি ফেরেশতাগণকে রসূল করে প্রেরণ করতাম তবে তাকেও মানুষের আকারেই করতাম, বর্তমানে তারা যে সন্দেহে পড়ে আছে সে সন্দেহেই তাদেরকে ফেলে রাখতাম।

(১০) (হে রসূল!) আপনার পূর্বেও লোকেরা রসূলগণকে বিদ্রুপ করেছে, পরিণামে বিদ্রুপকারীদের বিদ্রুপের বিষয়ই শেষ পর্যন্ত তাদের ঘেরাও করেছে।

তফসীরুল কোরআন

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করার কারণে কাফেরদের জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদেরকে বিশেষভাবে নসিহত করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে এসেছে এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। আল্লাহ্র প্রেরিত রসূলগণের প্রতি বিদ্রুপ এবং উপহাস করেছে তাদের পরিণাম কত শোচনীয় হয়েছে।

যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আদ জাতি, সামুদ জাতি, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়, শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং ফেরাউন ও তার দলবল, তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে ধ্বংস হয়েছে। নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে তারা হয়েছে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ। অথচ বাহুবল, জনবল, ধনবল, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। কিন্তু তাদের আমল মন্দ হওয়ার কারণে তাদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়।

অনুরূপভাবে তোমরা যদি আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করতে থাক এবং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর তবে তোমাদেরকেও সেই শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

قَرْنٍ

"করণ" শব্দটির অর্থ শতাব্দী। কেননা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ এবনে বশার মাজানীকে বলেছিলেন, তুমি এক "করণ" জীবিত থাকবে। তিনি একশ' বছর জীবিত ছিলেন। একথা লিখেছেন আল্লামা বগভী (রঃ)। বর্ণিত আছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি ছেলের মাথার হাত বুলিয়ে বলেছিলেনঃ তোমার বয়স এক করণ হোক। অবশেষে দেখা গেল সে ছেলেটির বয়স একশ' বছর হয়েছে।

مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ

অর্থাৎ তাদেরকে যে শক্তি সামর্থ্য এবং সম্পদ দান করেছি তা তোমাদেরকে দান করিনি। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ হলো পূর্ববর্তী লোকদের এত সুদীর্ঘ বয়স দিয়েছিলাম যা

তোমাদেরকে দেইনি। যেমন নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ জাতি প্রভৃতি। তাদের অনেক বয়স হতো। আর আমি তাদের উপর অনবরত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তাদের বাসস্থানের তলদেশ থেকে নহর সমূহ প্রবাহিত করি। কিন্তু যখন তাদের নিকট আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করা হয় এবং তারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করে তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। তাদের অর্থ-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুই তাদের জন্যে উপকারী হয়নি। তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

এবং তাদের স্থলে আমি অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি। হে মক্কাবাসী! যদি তোমরাও পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বিরোধিতা কর তবে তোমাদের পরিণামও অনুরূপভাবে ভয়াবহ হবে।

জাগতিক উন্নতি ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনা

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি কোন জাতি আল্লাহর অবাধ্য ও নাফরমান হয়, মানবতার দুশমন হয় তবে বাহ্যিক অবস্থা তার যত উন্নততরই হোক না কেন, অবশেষে তার পরিণাম হবে শোচনীয়, জাগতিক উন্নতি তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।[১]

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিবরণ ছিল। যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন আলো ও আঁধার, তিনিই তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনি এক, অদ্বিতীয়। একথাই ঘোষণা করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে, আর এ আয়াতে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করতো এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো তাদের সন্দেহ ভঙ্গ করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ পাকের কালাম হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে অবিশ্বাস করতো। কখনও বলতো আসমান থেকে লিপিবদ্ধ গ্রন্থ কেন অবতীর্ণ হয়নি? আর

১ তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮০

কখনও বলতো ফেরেশতা তার প্রকৃত রূপ ধারণ করে কেন আমাদের সম্মুখে এসে আপনার সত্যতার উপরে সাক্ষ্য দেয়না? কখনও বলতো নবীকে মানবরূপে কেন প্রেরণ করা হলো? ফেরেশেতাকে নবী বানিয়ে কেন প্রেরণ করা হলোনা? আলোচ্য আয়াত সমূহে এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

শানে নুযুল

কালবী এবং মোকাতেল (রঃ) এর বর্ণনা এই, নজর এবনে হারেস, আবদুল্লাহ এবনে উমাইয়া এবং নওফেল এবনে খওলেদ নামক মুশরেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললোঃ যদি আপনি আসমান থেকে একটি লিখিত গ্রন্থ এনে দিতে পারেন এবং এর সঙ্গে চার জন ফেরেশতা এসে এ সাক্ষ্য দেন যে, এ কিতাব সত্যি সত্যি আল্লাহর কিতাব, তাহলে এমন অবস্থায় আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। তারই জবাবে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ

অর্থাৎ যারা বর্তমান কোরআনকে যাদু এবং কোরআনের বাহককে যাদুকর বলতে দ্বিধাবোধ করেনা যদি আমি (হে রসূল!) আপনার নিকট কাগজে লিপিবদ্ধ গ্রন্থ প্রেরণ করি আর তারা সে গ্রন্থ স্বহস্তে স্পর্শ করে এবং ঐ গ্রন্থের সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়, এরপরও সেই গ্রন্থকে যাদু বলতে তারা এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করবে না। কেননা, এ কাফেররা শুধু জেদ এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়েই এসব কথা বলে। মূলতঃ তাদের অদৃষ্টে হেদায়েত লিপিবদ্ধ হয়নি, তাই তাদের সন্দেহ নিরসন হবে না। তারা ঈমান আনবে না।[১]

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

দূরাত্মা কাফেররা আরো বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতা কেন আসে না? আমাদের সম্মুখে এসে ফেরেশতাগণ পবিত্র কোরআন এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতার কথা ঘোষণা করুক। আমরা তাদের কথা শ্রবণ করে সব কিছু দেখে শুনে বিশ্বাস করবো।

একথারই জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ এ নির্বোধ ও দূরাত্মারা বোঝেনা যে, যদি ফেরেশতা তাদের সম্মুখে স্বশরীরে নাযিল হয় তবে তাদেরকে আর এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হবে না। তারা আলৌকিক জ্যোতি এবং ফেরেশতাদের ভীতির কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। ইতিপূর্বে যখন আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন সম্প্রদায় মোজেযা চেয়েছে, মোজেযা দেখার পর তারা নাফরমানী করলে তাদেরকে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪৬

সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে। অতএব, ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ না করা প্রকৃত অর্থে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, তাদেরকে এতদ্বারা তওবা করার অবকাশ দেয়া হয়েছে।

যদি ফেরেশতা তাদের প্রকৃতরূপে আসত তবে যারা ফেরেশতা প্রেরণের দাবী করছে তারা ক্ষণিকের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো। আর যদি ফেরেশতাকে মানবরূপ দিয়ে পয়গম্বর বানিয়ে প্রেরণ করা হতো তবে এ কাফেররা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে যেভাবে অস্বীকার করেছে তেমনি মানবরূপ ধারণকারী সেই ফেরেশতাকেও অস্বীকার করতো।

ফেরেশতাকে দেখা কি সম্ভব?

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহর নবী ব্যতীত ফেরেশতাদেরকে স্বশরীরে দেখার শক্তি কারো নেই। যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখেন এবং তারা মানব জাতির মধ্য থেকে মনোনীত হন। আল্লাহ পাকের দরবার থেকে প্রাপ্ত ফয়েজ, বরকত, হেদায়েত, নূর এবং রূহানী ও বাতেনী শক্তি আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্যে বিতরণ করেন, তাই তাঁরা ফেরেশতাদেরকে তাদের প্রকৃত রূপে দেখার শক্তি রাখেন। এ শক্তি অন্য কারো মধ্যে থাকে না।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ২৩ বছরের নবুওয়্যতের আমলে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) ২৪ হাজার বার এসেছেন। জীব্রাঈল (আঃ)-কে তিনি তাঁর প্রকৃত রূপে মাত্র দু'বার দেখেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য নবীদের ব্যাপারে এ প্রমাণও পাওয়া যায় না। সাধারণত দাহিয়া কালবী নামক একজন সাহাবীর আকৃতি ধারণ করেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে জীব্রাঈল (আঃ) আসতেন। নবীগণ ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যে ফেরেশতাদেরকে দেখা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা, ফেরেশতাকে দেখা মাত্র মানুষ ধ্বংস হবে। আর মক্কার কাফেরদের ধ্বংস করা আল্লাহ পাকের মর্জি ছিল না বলেই ফেরেশতাদেরকে তাদের স্বরূপে প্রেরণ করা হয়নি।[১]

তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে আরো লিখেছেন, পবিত্র কোরআন অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান আনার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ফেরেশতাগণ অদৃশ্য বা অদেখা জগতের অধিবাসী। প্রকৃত মুসলমান হতে হলে যে সব অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় তন্মধ্যে ফেরেশতাগণ অন্যতম। অতএব, ফেরেশতা যদি প্রকাশ পায় তবে ঈমান আনার সুযোগ কোথায় থাকে?

দুনিয়াতে মানুষকে চিন্তা চর্চা করার সুযোগ দেয়া হয় যেন বিবেক বুদ্ধি ব্যয় করে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করে তবে চিন্তা চর্চার কোন সুযোগ থাকেনা। তাই তাদেরকে আর কোন সুযোগ দেয়া হয় না।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১২
২। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১২

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপহাস করতো তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) ইতিপূর্বে যারা রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছে তাদেরকেও উপহাস করা হয়েছে। উপহাস বা বিদ্রুপ কোন নতুন বিষয় নয়। পূর্বকালের নবীগণ উপহাস বা বিদ্রুপে সাহস হারা হননি। অবশেষে যারা বিদ্রুপ করতো তারা তাদের ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করেছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের বিদ্রুপের শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে।

(হে রসূল!) আপনার কাজ হলো আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। এরপর আল্লাহ পাক দেখবেন কার কি শাস্তি হয়, কার কি পরিমাণ হয়। যারা আল্লাহর গজবকে বিদ্রুপ করে তারা অবশেষে সে গজবেই পতিত হয়। আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউনের দলবল আল্লাহর আযাবকে অস্বীকার করার শাস্তি ভোগ করেছে। অতএব, (হে রসূল!) মক্কাবাসী কাফেররা যদি আপনার প্রতি বিদ্রুপ করে তবে তাদের শাস্তিও অবধারিত।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ⑪ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِّلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ اَلَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑫
وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑬ قُلْ اَغَيْرَ
اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ
اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ⑭
قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑮

তরজমা

(১১) (হে রসূল!) আপনি বলুন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে তা লক্ষ্য করে দেখ।

(১২) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যা কিছু আসমান এবং জমিনে রয়েছে তা কার? আপনি বলুন, সব কিছু আল্লাহ্ পাকের। তিনি রহমত নাযিল করা তথা দয়া করা নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেছেন, তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে তারা ঈমান আনবে না।

(১৩) রাত এবং দিনে যা কিছু থাকে সবই আল্লাহ্ পাকের। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(১৪) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন আসমান জমিন যিনি তৈরী করেছেন, যিনি সকলকে খাবার দেন, তাঁকে কেউ খাবার দেয় না সেই আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আমি কি অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবো? (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতি আদেশ রয়েছে আমি যেন সর্ব প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করি এবং মুশরেকদের দলভুক্ত না হই।

(১৫) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের নাফরমানি করি তবে আমি ভয় করি যে, মহা দিনের আযাব আমার উপর আপতিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা দ্বীন ইসলামের, আল্লাহর নবীর বা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের প্রতি বিদ্রুপ করে তারা তাদের ভয়াবহ পরিণাম অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাবে। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমানদের যে ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে তা লক্ষ্য কর।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں = نہ عبرت کی جاے تماشا نہیں

(মুগ্ধ হয়ে থাকার স্থান দুনিয়া নয় এটি উপদেশ গ্রহণের স্থান, খেল তামাশার স্থান নয়।) যারা ইতিপূর্বে দ্বীন ইসলামের বিদ্রুপ করেছে তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে অমান্য করেছে। তাই প্রলয়ংকরী বন্যা তাদের উপর আপতিত হয়েছে। ফেরাউন লোহিত সাগরে তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য সহ নিমজ্জিত হয়েছে। সাদ্দাদ, নমরূদ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, হযরত সালেহ (আঃ) এবং হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে অমান্য করার কারণে তাঁদের সম্প্রদায় কিভাবে

কোপগ্রস্ত হয়েছে, এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতীরা আসমান থেকে অবতীর্ণ মায়েদার প্রতি বিদ্রুপ করার কারণে শুকরে পরিণত হয়েছে। আইলাবাসী তাদের প্রতারণার শাস্তি হিসেবে বানরে পরিণত হয়েছে। (হে রসূল!) আপনি মক্কাবাসী পৌত্তলিকদেরকে বলুন, তারা যেন পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং আল্লাহর নাফরমানদের উপরোল্লিখিত পরিণাম দেকে ভবিষ্যত সম্পর্কে সাবধান হয়।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আপনি মক্কার মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক কে? আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার অধিপতি কে? স্বয়ং মুশরেকরাও একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন।

তাই পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিন। এই নীল আকাশ এবং এই বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী আর তাতে যা কিছু রয়েছে এর সব কিছুর অধিপতি একমাত্র আল্লাহ পাক, তাই আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীকে যারা অবিশ্বাস করে, তাঁর প্রেরিত গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে যারা অমান্য করে তারা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে পারে? কিন্তু যেহেতু তিনি অনন্ত অসীম করুণাময় তাই অপরাধীকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না; বরং আত্ম সংশোধনের সুযোগ দান করেন। এটি করুণাময়ের করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের জন্যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া করা স্থির করে নিয়েছেন। তাই তিনি তাঁর বন্দাদের প্রতি তাদের পাপাচার সত্ত্বেও রহমত করে থাকেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক তাঁর একশটি রহমতের মধ্যে একটি জমিনে নাযিল করেছেন। সেই একটি রহমতের কারণেই মানব-দানব, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ একে অন্যকে, মা তার সন্তানকে মায়া করে, স্নেহ করে আর ৯৯টি রহমত আল্লাহ পাক নিজের জন্যে রেখে দিয়েছেন যা কেয়ামতের দিন তাঁর বন্দাদেরকে দান করবেন। (মুসলিম শরীফ)

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আলোচ্য হাদীসে ১০০টি রহমতের যে কথা রয়েছে তার অর্থ হয়তো এই সংখ্যা

নিদৃষ্ট করা নয়; বরং সংখ্যার আধিক্য বোঝাতে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বন্দার কাছে যা রয়েছে দয়া-মায়া, স্নেহ হিসেবে তা সীমিত এবং ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট যে রহমত রয়েছে তা চিরস্থায়ী, কোন দিন তা শেষ হবে না। কেননা, সৃষ্টি মাত্রই ধ্বংসশীল। আর আল্লাহ পাকের যাবতীয় গুণাবলী অনন্ত অসীম এবং চিরস্থায়ী। আল্লাহ পাক বন্দাদের অন্তরে রহমতের যে অংশ নাযিল করেছেন তা আল্লাহ পাকের রহমতের একটি ছায়া বিশেষ।

উল্লেখ্য, দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত দুনিয়ার নেয়ামত রূপে প্রকাশ পায়। যেমন স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, আরাম-আয়েশ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মান-মর্যাদা, এতে মুসলমান এবং কাফের সকলেই শরীক। আর আখেরাতের নেয়ামত যথা আম্বিয়ায়ে কেরামের আবির্ভাব, আসমানী কিতাব সমূহ নাযিল হওয়া, পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ করা এবং আল্লাহ পাকের দিদার হাসিল হওয়া– এসব কিছু শুধু মুসলমানদের জন্যে।[১]

لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন অথবা এর অন্য একটি অর্থ হলো আল্লাহ পাক তোমাদের সকলকে কেয়ামত পর্যন্ত কবরে একত্রিত করবেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটির একাধিক অর্থ হতে পারে।

(১) আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম এরশাদ করেছেনঃ আসমান জমিনের মালিক কে?

অতঃপর এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আসমান জমিনের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। এরপর এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বন্দাদের জন্যে রহমত করা নিজের জন্যে সাব্যস্ত করে নিয়েছেন। অর্থাৎ কোন বন্দাকে অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করেন না, বরং তাদেরকে অবকাশ দেন, আত্ম সংশোধন ও তওবা এস্তেগফারের সুযোগ দান করেন। এরপর আলোচ্য বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ যদিও দুনিয়াতে অবকাশ দেয়া হচ্ছে কিন্তু অবশেষে কেয়ামতের দিন সকলকে আল্লাহ পাক একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেককে তার যাবতীয় কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে।

(২) এ বাক্যটির অন্য একটি অর্থ হলো– আল্লাহ পাক বন্দাদের প্রতি রহমত করা নিজের জন্যে নিদৃষ্ট করে নিয়েছেন আর এ সিদ্ধান্তও করেছেন যে, তোমাদের সকলকে কেয়ামতের দিন তিনি একত্রিত করবেন।

অথবা,

১ : তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১৫

এর অর্থ হলো এই, আল্লাহ পাক বন্দাদের প্রতি রহমত করা স্থির করে নিয়েছেন, আর সে রহমত হলো এই যে, কেয়ামতের দিন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন, কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে এ সতর্কবাণী মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তোমাদের সকলকে কবর থেকে বের করে আনবেন এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেয়া হবে। যেহেতু কাফেররা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতো তাই কেয়ামতের দিনের কথা যারা মিথ্যা জ্ঞান করেছে তাদের শাস্তির কথা এ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে।

لَا رَيْبَ فِيْهِ

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে একত্রিত করার ব্যাপারে অথবা কেয়ামতের কঠিন দিন সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহ নেই।

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বন্দাদের জন্যে রহমত করা নিজের জন্যে স্থির করে নিয়েছেন তাই এ সন্দেহ হতে পারে যে, আখেরাতে কাফেররাও হয়তো আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করবে, তাই এ সন্দেহ নিরসন-কল্পে পরবর্তী বাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে তারা ঈমান আনবে না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, শেরকের কারণে তারা ঈমান আনবে না। কেননা, তারা নিজেদের পুঁজিই বিনষ্ট করেছে। আল্লাহ পাক তাদের প্রতি যে রহমত নাযিল করেছিলেন তার বদলে তারা আযাবকে ক্রয় করেছে। অর্থাৎ কাফেররা স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে, তাই তাদের শাস্তি অবধরিত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তখন নিজের ব্যাপারে একটি অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করে রেখে দিয়েছেন, তা হলো–

اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ

অর্থাৎ আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা আখেরাতে কেন শাস্তি পাবে? এমন প্রশ্ন হতে পারে। তারই

১ : তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা ১৬৫-৬৬

জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফের ও মুশরেকরা তাদের কৃতকর্মের কারণেই আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুম হয়েছে। তাদের শাস্তির জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী।

এ পর্যায়ে একখানি হাদীসে কুদসী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ দুনিয়ার নেয়ামত সে সব লোকও পায় যারা আল্লাহর অনুগত এবং যারা আল্লাহর অবাধ্য। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু তারাই লাভ করবে যারা মোমেন। পক্ষান্তরে, যারা কাফের তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে শেরক ও কুফরের মাধ্যমে অতএব, তাদের শাস্তি অনিবার্য।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাকের রহমত ব্যাপক, সকলের জন্যে, কিন্তু ঈমান আনয়নে ব্যর্থতাই হলো আল্লাহর রহমত থেকে কাফেরদের বঞ্চিত হওয়ার মূল কারণ।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

রাত এবং দিনের বেলায় যা কিছু হয় সবইতো আল্লাহ পাকের, স্থান-কাল তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের যথাসর্বস্ব আল্লাহ পাকেরই কর্তৃত্বধীন, তাঁরই নিয়ন্ত্রণধীন। পূর্ববর্তী আয়াতে স্থানের কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতে সময়ের কথা বলা হয়েছে। এক কথায় নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং অধিকার একমাত্র সর্ব শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রোতা, কাফের মুশরেকদের সব কথা তিনি শ্রবণ করেন। তিনি মহাজ্ঞানী, সব বিষয়ে অবগত, তাই কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। এতে কাফের মুশরেকদের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, তোমাদের কোন কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই। অতএব, তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই নেই। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব, তার অবস্থান সব কিছুই আল্লাহর দান। আমি কি সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আমার অভিভাবক বানাব? মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। তাঁর করুণা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই অথচ আল্লাহ পাক কারো ধার ধারেন না। সমগ্র সৃষ্টি জগতকে তিনি খাবার দান করেন। পক্ষান্তরে, তিনি এসব প্রয়োজন থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে কিভাবে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করব?

قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ

কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর পূর্ব পুরুষের ধর্ম অবলম্বনের কথা বললে এ আয়াত নাযিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতি এ আদেশ হয়েছে যে, আমি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করি, আর কোন অবস্থাতেই যেন আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত না হই। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন যে, ঈমান এবং ঈমানের দাবী পূরণের ব্যাপারে সর্ব প্রথম দায়িত্ব অর্পিত হয় আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর। কেননা, তাঁদেরকে উম্মতের জন্যে নমুনা এবং আদর্শ হতে হয়। তাই ঈমানদারদের মধ্যে প্রথম সারিতে থাকেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তাঁরাই হন অনুসরণীয়, অনুকরণীয়।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যদিও বাস্তবে কোন নবীর শেরক করার কোন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু নবীকে বলে উম্মতকে সতর্ক করা হলো এর উদ্দেশ্য। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম মাসুম বা নিঃষ্পাপ। যখন নিঃষ্পাপ ব্যক্তিদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় এমন নির্দেশ রয়েছে তখন যারা পাপী তাপী তাদেরকে কত অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা সহজেই অনুমেয়।

قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করতে আমি নিশ্চয় মহা দিনের কঠিন আযাবকে ভয় করি"।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে একথা এরশাদ হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেয়ে নিঃষ্পাপ, নিষ্কলংক কোন মানুষ পৃথিবীতে আসেনি, ভবিষ্যতেও আসবে না। এতদসত্ত্বেও যখন নাফরমানী করলে তাঁকে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তবে আর কেউ আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পেতে পারে না। অতএব, কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করে প্রত্যেকের আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করা একান্ত করণীয় কাজ।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮২

مَنْ
يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَاِنْ
يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَ
بَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۚ اَئِنَّكُمْ
لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ۚ قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا
هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ
يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৬) যে ব্যক্তি থেকে ঐ দিন শাস্তি দূরীভূত করা হবে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি নিঃসন্দেহে দয়া করলেন, আর এটিই বিরাট সাফল্য।

(১৭) আর আল্লাহ্ পাক যদি তোমাকে কোন প্রকার কষ্টে পতিত করেন তবে তিনি ব্যতীত এমন কেউ নেই যে, তা দূরীভূত করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ সাধন করেন তবে তিনি তো সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৮) আর আল্লাহ্ পাকের বন্দাগণের উপর তাঁরই পূর্ণ আধিপত্য। তিনি মহা বিজ্ঞানময়, তিনি সব ব্যাপারে পূর্ণ অবগত।

(১৯) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন 'আল্লাহ'। (তিনি) আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী, আর আমার নিকট এই কোরআন ওহীরূপে প্রেরিত হয়েছে যেন আমি এই কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কোরআন পৌছবে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কোন উপাস্য রয়েছে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন আমি তো এমন সাক্ষ্য দেবনা, (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তিনিই তো একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য, নিশ্চয় আমি তোমাদের অংশীবাদের উপর সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট।

(২০) আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তারা রসূলকে এমনিভাবে চেনে যেভাবে চেনে তাদের নিজেদের পুত্রদেরকে। যারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে তারা ঈমান আনবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের দিনের কঠিন আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের কঠিন দিনের সেই আযাব থেকে যদি কোন প্রকারে রেহাই পাওয়া যায় তবে তা আল্লাহ পাকের বিরাট দান, এবং সৌভাগ্য ও মহা সাফল্য মনে করতে হবে। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) একথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিলেনঃ

لا لنا ولا علينا

অর্থাৎ যদি কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাদের নেক আমলের জন্যে কোন পুরস্কার না দেন আর আমাদের গুনাহর জন্যে কোন শাস্তিও না দেন তা হলেই বাঁচি।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেনঃ এটিই হবে সুস্পষ্ট নাজাত অর্থাৎ যদি কেয়ামতের দিন শাস্তি না হয় তাহলে নাজাত হবে, আর তাই একান্ত কাম্য।

পবিত্র কোরআন আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়াকে বিরাট সাফল্য বলে আখ্যা দিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন আযাব থেকে রক্ষা করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন তা হবে সে ব্যক্তির জন্যে নাজাত এবং মহা সাফল্য।

মূলতঃ কেয়ামতের দিনের আযাব হবে অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়াবহ। এ আযাব থেকে মুক্তি লাভ করা নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য। এ সাফল্যের অর্থ হলো জান্নাতে প্রবেশ করা। কেননা, দোযখের আযাব থেকে নাজাত লাভ করার ফলশ্রুতি হলো জান্নাত লাভ।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন আযাব থেকে নাজাত দেবেন তার প্রতি হবে আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া। তিনি আরো বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি আযাব দূরীভূত হয় তবে তা আল্লাহ পাকের দয়া-মায়ার কারণেই হয়। আর যদি সওয়াব হাসিল হয় তবে তা-ও আল্লাহর দানে ধন্য হওয়ার কারণেই হয়। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

والذى نفسى بيده ما من الناس احد يدخل الجنة بعمله قالوا

ولا انت يارسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدنى الله برحمته

"শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, কোন মানুষ জান্নাতে তার আমলের কারণে যেতে পারবেনা"।

লোকেরা বললোঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও না"! তিনি এরশাদ করলেনঃ "না", আমিও না। তবে আল্লাহ পাক তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে রেখেছেন"।

এতেও একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই।[১]

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ

মানুষের ভাল-মন্দ একমাত্র আল্লাহ্ পাকের হাতেই রয়েছে। যদি তিনি কাউকে কষ্ট দিতে চান তবে কারো সাধ্য নাই যে, তা দূর করতে পারে। আর তিনি যদি কাউকে সুখ শান্তি দিতে চান তথা কারো কল্যাণ সাধন করতে চান তবে তাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতাও কারো নাই। স্বাস্থ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য, সম্মান, শক্তি–সামর্থ্য সবই আল্লাহ পাকের নেয়ামত। আল্লাহ পাক দিতে চাইলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাতে বাধা দিতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাক কাউকে কষ্ট দিতে চাইলে তা দূরীভূত করার ক্ষমতা কারোই নাই।

কোরআনে করীমে এ নীতিকথা একাধিক বার ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভাল মন্দ একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে, চাওয়া একমাত্র আল্লাহর কাছে, আশা একমাত্র আল্লাহর নিকট, ভরসা একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রতি, তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক রহমতের যে দ্বার উন্মুক্ত করেন তা কেউ বন্ধ করতে পারে না, আর যে দ্বার তিনি বন্ধ করেন তাকেও কেউ খুলতে পারেনা।

হাদীস শরীফ আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করেছেনঃ

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد

"হে আল্লাহ! যা আপনি দান করেন তাকে কেউ বাধা দিতে পারেনা। আর যাকে আপনি বাধা দেন, কেউ তাকে দিতে পারেনা, আপনার মোকাবেলায় কারো চেষ্টা কার্যকর হয় না"।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৭১

আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে তিরমিযী শরীফে সংকলিত হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পারস্য রাজা কেসরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপঢৌকন স্বরূপ একটি খচ্চর প্রেরণ করেছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাতে আরোহণ করলেন এবং পেছনে আমাকে বসিয়ে নিলেন। এরপর রওয়ানা হলেন। কিছুদূর চলার পর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেনঃ হে বৎস! আমি আরজ করলামঃ আমি হাযির। ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)!

তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধি-নিষেধের তুমি হেফাজত করবে তাহলে আল্লাহ পাক তোমার হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে চলবে। তাহলে আল্লাহ পাককে তুমি সম্মুখে দেখতে পাবে। তুমি আরাম এবং আনন্দের সময় আল্লাহ পাকের কথা মনে রেখো, তাহলে বিপদের সময় তুমি তাঁর অপরিচিত থাকবেনা। যদি কিছু চাইতে হয় তবে আল্লাহ পাকের দরবারে চাও। যদি সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় তবে শুধু তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। যা কিছু হবে তা কলম লিপিবদ্ধ করে ফেলেছে, আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের বরখেলাফ যদি সমগ্র সৃষ্টি জগত তোমার উপকার করতে চায় তবে তা করতে পারবে না।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার বরখেলাফ যদি সমগ্র বিশ্ব জগত তোমার ক্ষতি করতে চায় তবে তাও করতে পারবে না। যদি তোমার দ্বারা সম্ভব হয় তবে পূর্ণ একীন নিয়ে সবরের সঙ্গে আমল কর। আর যদি আমল না করতে পার তবে অন্ততঃ সবর বা ধৈর্য ধারণ কর। অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। একথাও জেনে রেখো, সবর বা ধৈর্য ধারণের সাথে আল্লাহ পাকের সাহায্য আসে। আর যেখানে কঠিন সমস্যা দেখা দেয় সেখানে সমাধানকে সহজ করা হয়।[১] (আহমদ, তিরমিযী)

আয়াতের শিক্ষা

অতএব, এ আয়াতের শিক্ষা হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা, শুধু আল্লাহ পাকের নিকট আশা পোষণ করা, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা এবং কোন কিছুর প্রয়োজনে শুধু তাঁর নিকট চাওয়া। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, কোন অবস্থাতেই অধৈর্য না হওয়া। আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। যতদিন মুসলিম জাতি এমনি গুণে গুণান্বিত ছিল ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এক বিরাট অংশের উপর তাদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১৯
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৬৯

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ط

বন্দাদের উপর আল্লাহ পাকের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি বিজ্ঞানময়। তিনি সকলের খবর রাখেন, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ পাকের ক্ষমতা, শক্তি, আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর ক্ষমতার আওতার বাইরে কোন কিছুই নেই। আর সমগ্র সৃষ্টি জগত সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। এতদ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ এলম্ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে, আর কারো নয়।

শানে নুযুল

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কালবী বর্ণনা করেছেন যে, একবার মক্কাবাসী একদল লোক প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং আরয করলোঃ এমন কেউ আছে কি, যে আপনার রসূল হওয়ার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে? আমরাতো এমন কাউকে পাইনি যে আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। আমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু তারা বলেছে তাদের নিকট যে আসমানী কিতাব রয়েছে তাতে আপনার কোন উল্লেখ নেই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন (হে রসূল!) যারা আপনার নবুওয়্যত ও রেসালতের সাক্ষীর অন্বেষণ করে তাদেরকে একথা বলুন সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী আল্লাহ পাক। আর স্বয়ং আল্লাহ পাকই আমার নবুওয়্যতের সাক্ষী। তাঁর চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেউ হতে পারেনা। কেননা, পৃথিবীর সব কিছুর মালিক আল্লাহ্ পাক। সারা পৃথিবীতে তাঁরই আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি আদি, তিনি অনন্ত। তিনি অপ্রতিহত, অদ্বিতীয়। পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। তিনি নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

(এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করছেন।) অতএব, তাঁর চেয়ে নির্ভরযোগ্য তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী আর কে হতে পারে?

قُلِ اللّٰهُ

(হে রসূল!) তাদের জবাবের অপেক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেই জবাব দিন যে, আল্লাহ্ পাকই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। আর একথাও বলুন যে,

شَهِيدٌۢ بَيۡنِى وَبَيۡنَكُمۡۚ

তিনিই আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। অর্থাৎ যদি তোমরা আমার নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রতি সাক্ষী কে জানতে চাও তবে জেনে রাখ যে, আমার নবুওয়্যতের সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ পাক, তিনি নিজেই আমাকে নবুওয়্যতের দলিল প্রমাণ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আর যে সব দলিল প্রমাণ আমার রেসালতের ব্যাপারে প্রদত্ত হয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো পবিত্র কোরআন যা ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট নাযিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম। মানব জাতির মুক্তির মহাসনদ, আমার নবুওয়্যতের সাক্ষী। যদি আমি আল্লাহর রসূল না হতাম তবে তিনি আমার প্রতি তাঁর কালাম নাযিল করতেন না। পবিত্র কোরআন বিশ্বগ্রন্থ। মানব জাতির কল্যাণের মহান শিক্ষা রয়েছে পবিত্র কোরআনে। পবিত্র কোরআন আমার প্রতি এজন্যে নাযিল করা হয়েছে যেন আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট পবিত্র কোরআন পৌঁছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এ কোরআন পৌঁছে তাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই আমার প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

وَمَنۢ بَلَغَ

(আর যাদের নিকট পবিত্র কোরআন পৌঁছে) এর অর্থ হলো সে সব জ্বীন ও মানুষ যারা কোরআনে করীম নাযিল হওয়ার সময় বর্তমান ছিল অথবা সে সব জ্বীন ও মানুষ যারা কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসবে। নবী বা রসূলের দায়িত্ব হলো যারা আল্লাহর অনুগত তাদেরকে নাজাতের সুসংবাদ দেয়া। আর যারা আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা, তাদেরকে সাবধান করা।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে শুধু ভয় প্রদর্শনের কথা রয়েছে। সুসংবাদ প্রদানের কথা নেই। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এর জবাবে লিখেছেন, কাফেররা যে কথা নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল তার জবাবে সুসংবাদ দেয়ার কোন প্রশ্ন উত্থিত হয় না, তাই শুধু ভয় প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, তবলীগের ক্ষেত্রে সুসংবাদ প্রদানের চেয়ে ভয় প্রদর্শনের গুরুত্ব সমধিক। যদি ভয় প্রদর্শন উপকারী না হয় তবে সুসংবাদ প্রদানের পন্থা আদৌ উপকারী হবে না কেননা, কোন ব্যাপারে লাভ অর্জনের চেয়ে ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার গুরুত্ব অধিকতর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পয়গাম

পৌঁছে দাও, তা এক আয়াতই হোক না কেন। আর বনী ইসরাঈলের বর্ণিত কথাও বয়ান কর তাতে কোন অসুবিধা নেই যদি হাদীসের খেলাফ না হয়। (মনে রেখো) যে আমার ব্যাপারে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলে তার উচিত দোযখে নিজের ঠিকানা তৈরী করে নেয়া।

এই হাদীসে বনী ইসরাঈল বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা খাঁটি মুসলমান হয়েছিল, যারা মিথ্যাবাদী বা কাফের রয়েছে তাদের বর্ণনার কোন গুরুত্ব নাই। হযরত সামুরা এবনে জুন্দব (রাঃ) এবং হযরত মুগীরা এবনে শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন কথা যা আমার কথা নয় তাকে জেনে শুনে হাদীস বলে বর্ণনা করে তা মিথ্যা, আর সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করুন যে আমার কথা শ্রবণ করে এবং স্মরণ রাখে ও এর মর্ম উপলব্ধি করে। অতঃপর সে কথা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয় কেননা, অনেক লোক এমন রয়েছে যে কোন ভাল কথা এমন লোকের কাছে পৌঁছে দেয় যে পৌঁছে দিল সে তার চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান।

তিনটি কথায় মুসলমানের অন্তর কার্পণ্য করেনা। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমল করা, মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করা এবং যারা ইসলামকে ভালবাসে এমন লোকদের সঙ্গে একত্রিত থাকা। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

হযরত সাঈদ এবনে যেবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন পেয়েছে সে যেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জেয়ারত লাভ করেছে। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির নিকট পবিত্র কোরআন পৌঁছেছে আমি তার ভয় প্রদর্শনকারী।

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ

তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে আরো মা'বুদ রয়েছে? এমন অন্যায় কথা তোমরা বলতে পার কেননা, তোমাদের কোন কিছুতেই বাধা নেই। কিন্তু আমি এমন কথা বলতে পারিনা এমনকি, এমন কথা চিন্তাও করতে পারিনা। কেননা, আল্লাহ পাকের সঙ্গে শেরক করার ন্যায় অন্যায় কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তোমাদের এহেন অন্যায়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ পাক এক. অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন শরীক থাকতে পারে না, কাফেররা

যেহেতু বলেছিল যে, আমরা আপনার নবুওয়্যতের কোন সাক্ষী পাইনি, আমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকেও জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু তারা আপনার নবুওয়্যতের সাক্ষ্য দেয়না। কাফেরদের একথার প্রতিবাদেই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (আল্লাহর রসূলকে) এভাবে চেনে যেভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চেনে। এর কারণ এই, তৌরাত এবং ইঞ্জিলে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাঁর হুলিয়া শরীফ কোথায়, তাঁর জন্ম কোথায়, তিনি হিজরত করবেন এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কেও অনেক কথা রয়েছে, শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথাই নয়; বরং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও তৌরাত ইঞ্জিলে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনি অবস্থায় যে তৌরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করবে সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চিনবে না তা হতেই পারে না।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্ৰণিধানযোগ্য, আল্লাহ পাক একথা এরশাদ করেছেন যে, ইহুদী নাসারারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এত ভালভাবে চেনে যত ভাল ভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চেনে। একথা এরশাদ করেননি যে, সন্তানরা যেভাবে পিতা-মাতাকে চেনে ঠিক সেভাবে তারা তাঁকে চেনে। এর কারণ এই, পিতা মাতা তাদের সন্তানদেরকে যেভাবে চেনে সন্তানরা তাদের পিতা মাতাকে সেভাবে চিনতে পারে না। সন্তানের জন্ম থেকে নিয়ে যৌবন পর্যন্ত সময় পিতা-মাতার সম্মুখেই অতিবাহিত হয়। সন্তানের সকল অবস্থা পিতা-মাতার নিকট সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। পক্ষান্তরে, সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতাকে এভাবে চিনতে পারা সম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) যিনি পূর্বে ইহুদী ছিলেন, পরে ইসলাম কবুল করেছেন, তাঁকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এভাবে চেন যেভাবে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে চেন। এর কারণ কি? হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বলেন হ্যাঁ, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচয় সেভাবে পেয়েছি যেভাবে আল্লাহ পাক তৌরাতে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সম্পর্কে আমাদের এলম সম্পূর্ণ নিশ্চিত কেননা, তাঁর পরিচয় আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে। হযরত যায়েদ এবনে সানাও ছিলেন আহলে কিতাব। তিনি তৌরাত ইঞ্জিলের বিবরণ দেখেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, শুধু একটি বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। তা হলো হযরত

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সবর বা ধৈর্য ও সহনশীলতার অবস্থা কি? তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে যখন নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করেছেন।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য এবং পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাই যথেষ্ট। তদুপরি আহলে কিতাব ধর্মযাজকরা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই তৌরাত ইঞ্জিলের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় পায় এবং তারা তাঁকে এভাবে চিনতো যেভাবে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে চিনতো।[১] কিন্তু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ সত্যকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়। তাদের পদ-পদবীর লোভ এবং অর্থ-বিত্তের মোহে তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ যারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছে তারা ঈমান আনবে না। বস্তুতঃ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করেছে তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে দু'টি স্থান রয়েছে একটি জান্নাতে, আর একটি দোযখে, যে মৃত্যুর পর দোযখী হয় তার জান্নাতের স্থান জান্নাতীগণ লাভ করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক দোযখীদের জন্যে জান্নাতে সংরক্ষিত স্থান মোমেনদেরকে দিয়ে দেবেন। মোমেনদের যে স্থান দোযখে ছিল তা দোযখীদেরকে দিয়ে দেবেন।

আলোচ্য আয়াতাংশে একথার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।[২]

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৭২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৩

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ
بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ
نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۲۲﴾
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿۲۳﴾
اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

তরজমা

(২১) আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। নিশ্চয়, জালেমরা কোন দিন সফলকাম হবে না।

(২২) আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো। সেদিন আমি মুশরেকদের বলবো যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক বলে দাবী করতে তারা আজ কোথায়?

(২৩) এরপর তাদের কোন ফন্দিই থাকবে না, শুধুমাত্র একথা বলবে যে আল্লাহর শপথ, আমরা কখনও শেরক করি নাই।

(২৪) দেখতো নিজেদের বিরুদ্ধে কিভাবে তারা মিথ্যা বললো, আর তাদের সব বানানো কথা কিভাবে হারিয়ে গেল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতের এরশাদ হয়েছে, যারা নিজেদের সর্বনাশ করেছে তারা ঈমান আনবে না। আর এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে সর্বনাশ হওয়ার কারণ সমূহ।

কাফেরদের ধ্বংস হওয়ার কয়েকটি কারণ

১. আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা। কেননা, মক্কার কাফেররা তাদের হাতে বানানো মূর্তিকে আল্লাহর শরীক মনে করতো। তারা বলতো আল্লাহ্ পাক আদেশ দিয়েছেন মূতিগুলোর এবাদত করতে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এগুলোই হলো বাহন, আর কাফেররা একথাও বলতো যে, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ্ পাকের কন্যা (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

২. ইহুদী নাসারারা বলতো তৌরাত, ইঞ্জিলে কোন পরিবর্তন হবে না এবং এরপর আর কোন নবীরও আগমন হবে না।

৩. যখন তারা কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতো তখন তারা বলতো, আমাদের পূর্ব পুরুষরা এ কাজ করতো এবং আমাদেরকেও এভাবে কাজ করার আদেশ দিয়েছে।

৪. ইহুদীরা বলতো, আমরা তো আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর বন্ধু। যেমন পবিত্র কোরআনে রয়েছে–

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ

তারা আরও বলতো, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

(দোযখ আমাদেরকে শুধু অল্প কয়েক দিনই স্পর্শ করবে।)

৫. আর ইহুদীদের কোন কোন মূর্খ লোক বলতো, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ

নিশ্চয় আল্লাহ ফকির আমরা ধনী (নাঊজুবিল্লাহ মিন জালেক)। এমনি ধরনের বাতিল ভিত্তিহীন বেআদবীপূর্ণ উক্তি করার কারণেই কাফেররা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

৬. এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করা, তাঁর মোজেযা সমূহকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং কোপগ্রস্ত হয়েছে।[১]

আর এ কারণেই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

"নিশ্চয় জালেমরা তাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সফল হবেনা। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তারা হবে অপমানিত এবং বঞ্চিত"।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ আখেরাতে কাফেরদের ব্যর্থতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা, আল্লাহ পাক শেরককে মাফ করবেন না, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত। আর দুনিয়াতেও কাফেররা কোন অবস্থাতেই মোমেনদের ন্যায় মনের শান্তি ভোগ করতে পারে না। অতএব, অশান্তি অকল্যাণ তাদের চির সাথী। তাই এরশাদ হয়েছেঃ "জালেমরা কোন দিন সফল হবে না"।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৮১

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তথা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে অথবা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে, তৌহীদ, রেসালত, শেষ বিচারের দিন এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতায় অবিশ্বাস করে তাদের ব্যর্থতা অনিবার্য, তাদের সাফল্য অসম্ভব, অকল্পনীয়।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে জালেম এবং কাফেরদের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর এ আয়াতে এর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আমি এ মুশরেকদের সকলকে একত্রিত করবো, সেদিন তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, তোমরা তোমাদের বানানো মূর্তিগুলোকে আমার শরীক করতে, তাদের নিকট নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে, তাদের উপাসনা করতে আজ তারা কোথায়? তারা কেন আজ তোমাদের সাহায্য করেনা?

ثُمَّ نَقُولُ

পূর্ববর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে, যেদিন আমি কাফেরদের সকলকে একত্রিত করবো, এরপর ثُمَّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ثُمَّ শব্দটি বিলম্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সওয়াল জবাব ও হিসাব নিকাশ হবে না, বরং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায়, অস্থিরতা ব্যাকুলতায় নিপতিত থাকতে হবে।

একখানি হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাক হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। যেমন তীরকে খাপে একত্রিত করা হয় এবং ৫০ হাজর বছর তোমরা ঐ অবস্থায় থাকবে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কেয়ামতের দিন ১ হাজার বছর যাবত সকলেই অন্ধকারে থাকবে। (মোসতাদরাক, হাকেম এবং বায়হাকী) এ দু'টি বর্ণনায় যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো ৫০ হাজার এবং ১ হাজার বছরের আর এমনি পার্থক্য পবিত্র কোরআনের দু' খানি আয়াতেও লক্ষ্য করা যায় এরশাদ হয়েছে ঃ

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ সেদিন হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। আর অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ

অর্থাৎ একদিন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হবে এক হাজার বছরের সমান। এ পার্থক্যের কারণ হলো, সেদিন অত্যন্ত কঠিন, চরম কষ্ট এবং বিপদের দিন হবে। এ কষ্ট এবং বিপদের বিভিন্ন স্তর হবে। কারো জন্যে এই একটি দিন ৫০ হাজার বছরের ন্যায় মনে হবে। আর কেউ এ দিনকে ১ হাজার বছরের ন্যায় মনে করবে। যাহোক, সেদিন অত্যন্ত সুদীর্ঘ হবে এবং অনেক সময় অতিবাহিত হবে কিন্তু কোন বিচার বা হিসাব নিকাশ শুরু হবে না। এমনকি কেয়ামতের ময়দানে সমবেত কোটি কোটি মানুষ তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়বে। তারা বলবে যা কিছুই হোক একটা কিছু হোক। এ সুদীর্ঘ সময়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ثُمَّ শব্দ দ্বারা। আল্লাহ পাক যখন মুশরেকদেরকে সম্বোধন করে বলবেন তোমরা যেসব বস্তুকে আমার শরীক করতে তারা কোথায়? তারা আজ এ কঠিন বিপদের দিন তোমাদের সাহায্য করতে কেন আসেনা?

তখন তারা একটি ফন্দি আঁটবে এবং মিথ্যা কথা বলবে। আর তা আল্লাহর নামের শপথ করে বলবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

"আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরেক ছিলাম না"।

মুশরেকদের এ জবাবকে পবিত্র কোরআন ফেতনা বা ফন্দি বলে আখ্যা দিয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, মুশরেকরা দুনিয়াতে মূর্তি এবং হাতে বানানো বস্তুর উপাসনা করেছে। তাদের প্রতি নিজেদের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে কিন্তু আজ তাদের এই বানানো উপাস্যদের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ রয়নি।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে দন্ডায়মান হয়ে কিভাবে তারা মিথ্যা বলার সাহস করবে? আর তা-ও আল্লাহর নামে শপথ করে, তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেন, মূলতঃ কেয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থার কারণে তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় যা মুখে আসবে তাই বলে দেবে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্ পাকই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করার নিমিত্তে তাদেরকে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেবেন। যাতে করে যেভাবে তারা দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলত, কুফর এবং শেরকের পাশাপাশি মিথ্যাবাদীতায়ও তারা অভ্যস্ত ছিল তার বহিঃপ্রকাশ হবে তাদের একথার মাধ্যমে। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ

অর্থাৎ এই কাফের মুশরেকরা যেভাবে মুসলমানদের নিকট মিথ্যা শপথ করে ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মহান দরবারেও মিথ্যা শপথ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। কেয়ামতের ময়দানে তারা মিথ্যা শপথ করে বলবে আমরা শেরক করিনি, শেরকের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিলনা, সে সময় আল্লাহ্ পাক তাদের রসনা বন্ধ করে দেবেন। আর তাদের হাত পা সহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আদেশ দেবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও তারা কি কি কাজ করেছে? যেমন সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

(আজকের দিনে তোমাদের রসনাকে আমি সিল করে দেব এবং তোমাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং তোমাদের কার্যাবলীর উপর তোমাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে। আর কোন কথা গোপন রাখার সাহস তাদের হবে না।) তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا

অর্থাৎ সেদিন তারা আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না। এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ প্রথমে কাফের, মুশরেক এবং মুনাফেকরা অনেক মিথ্যা কথা বলবে। এমনকি মিথ্যা শপথও করবে কিন্তু যখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তখন আর মিথ্যা কথা বলার সাহস করবে না।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের আদালতে অপরাধীকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে। যেভাবে দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলতো কেয়ামতের দিনও তাদেরকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কেননা, তাদের মিথ্যাবাদীতার স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের কুদরতে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে। আর এ কারণেই প্রতিটি মানুষকে সমাধিস্থ হওয়ার পরই যে পরীক্ষা করা হবে ফেরেশতার মাধ্যমে, এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ মুনকের নকীর ফেরেশতা কাফেরকে যখন প্রশ্ন করবে–

مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ

অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে? এবং তোমার দ্বীন কি?

তার জবাবে কাফেররা বলবে–

هَاءْ هَاءْ لَآ اَدْرِىْ

(হায় আক্ষেপ, আমি তো কিছুই জানিনা।) পক্ষান্তরে, যখন মোমেন ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন করা হবে তখন মোমেন বলবেন ঃ

رَبِّىَ اللّٰهُ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ

(আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাক। আর আমার দ্বীন ইসলাম।) এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কবরে যে সওয়াল জবাব হবে তাতে মিথ্যা বলার কোন সুযোগ থাকবে না। তফসীরকারগণ এর কারণ লিখেছেন, কবরে পরীক্ষা গ্রহণ করবে ফেরেশতারা, তারা গায়বের এলম রাখেনা এবং মানুষের হাত পা দ্বারা স্বাক্ষ্য নিতেও পারে না। তাই মিথ্যা বলার সুযোগ কাফেরকে দেয়া হয় না।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললোঃ হে এবনে আব্বাস! আপনি কি শুনেছেন যে আল্লাহ পাক কাফেরদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন তারা বলবেঃ

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

(আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরেক ছিলাম না।) তাদের পক্ষে এমন মিথ্যা কথা বলা কি করে সম্ভব হবে? তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ যখন মুশরেকরা দেখবে নামাযী ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারছেনা। তখন তারা একে অন্যকে বলবে, চল আমরা শেরকের কথা অস্বীকার করি, এ সময় আল্লাহ পাক তাদের বাক শক্তি রহিত করবেন এবং তাদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দেয়ার আদেশ দেবেন। তাই তারা আর কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না। হে ব্যক্তি! এখন তো তোমার অন্তরে আর কোন সন্দেহ রয়নি।[২]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যারা কেয়ামতের দিন শেরক করার কথা অস্বীকার করবে তারা সে সব লোক যারা দুনিয়াতে প্রকাশ্যে শেরক করতো না, কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর শরীক করতো না। কিন্তু তাদের আমল এমন ছিল যে, তারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা সৃষ্টির কাছেই পেশ করতো এবং তাদের নামেই নজর মানত করতো এবং স্বাস্থ্য, রুজি, সন্তান-সন্ততি সবই কোন সৃষ্টির কাছে চাইতো। তারা নিজেকে মুশরেক মনে করতো না। আর এজন্যেই তারা শপথ করে বলবে, আমরা মুশরেক ছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে কেয়ামতের ময়দানে অপমানিত করবেন এবং তাদের ভুল ধারণার নিরসন হবে।

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন পৃষ্ঠা-১৫৭৩-৭৬

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৬

প্রশ্ন হতে পারে, পবিত্র কোরআনের কোন কোন আয়াতে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক সেদিন কাফেরদের সঙ্গে কথা বলবেন না, অথচ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেন, যে আয়াতে কথা না বলবার ঘোষণা রয়েছে তার অর্থ হলো তাদের সঙ্গে সম্মান মর্যাদা এবং কবুলিয়তের কোন কথা হবে না; বরং ধমকের কথা হবে অথবা এ আয়াতে যে কথার উল্লেখ রয়েছে তা ফেরেশতাদের মাধ্যমে হবে। সরাসরি আল্লাহ পাকের সাথে হবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ (হে রসূল!) আপনি দেখুন যে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে কিভাবে মিথ্যা কথা বললো এবং তাদের সব বানানো কথা কিভাবে হারিয়ে গেল! তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার তাৎপর্য হলো, মিথ্যাবাদীতার ভয়াবহ পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপের অর্থ হলো দুনিয়াতে অন্য কিছুকে আল্লাহর শরীক করা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর আরো একটি ব্যাখ্যা হলো মুশরেকরা তাদের বাতিল উপাস্যদের ব্যাপারে যে সব মিথ্যা কথা বলতো যেমন "আমরা মূর্তির উপাসনা এজন্যে করি যেন এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি"।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

কিন্তু তাদের এ মিথ্যারোপের মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারবে তখন যখন তাদের কোন বাতিল উপাস্য কঠিন বিপদের মুহূর্তে তাদেরকে কোন সাহায্য করতে আসবে না।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে কাফের মুশরেকদের দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা যখন দুনিয়াতে ছিল তখন সত্যকে গ্রহণ করেনি, দ্বীন ইসলামের সত্যতায় অবিশ্বাস করেছে, সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরে রয়েছে। আর আখেরাতে এসে তারা তাদের উপাস্যদের অস্বীকার করেছে কিন্তু তাদের জন্যে তা কোন ভাবেই উপকারী হবে না। তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি এদের অবস্থা লক্ষ্য করুন, তারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য ছিল, তবু তাদের ধারণা ছিল যে তারা হক্বের উপর রয়েছে, আর এখন তারা তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তথা অবস্থা বেগতিক দেখে বলছে আমরা শেরক করিনি। এভাবে তাদের সারা জীবনের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তারা তাদের কৃতকর্মের শোচনীয় পরিণাম ভোগ করবে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৮৪

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ
وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا
جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ
اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا
يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾ بَلْ
بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ
وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا
بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৫) (হে রসূল!) তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আপনার দিকে কান পেতে থাকে। আর আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করে রেখেছি আর তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তাতে তারা ঈমান আনবে না। (হে রসূল!) তারা যখন আপনার নিকট হাযির হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন ঐ কাফেররাই বলে, এ-তো প্রাচীন কালের কিস্‌সা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(২৬) তারা অন্যকে পবিত্র কোরআন শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। আর তারা শুধু নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তারা তা বুঝতে পারে না।

(২৭) আর (হে রসূল!) যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে দোযখের পাশে দাড় করানো হবে এবং তারা বলবে হায়, কত উত্তম হতো যদি আমাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ করা হতো তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করতাম না এবং মোমেনেদের দলভুক্ত হতাম।

(২৮) বরং ইতিপূর্বে তারা যা গোপন করতো তা তাদের জন্যে প্রকাশিত হয়েছে। পুনরায় যদি তারা প্রেরিত হয় তবে যা নিষেধ করা হয়েছে আবারও তারা তাই করবে। নিশ্চয় তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

(২৯) আর তারা বলে, এই দুনিয়া ব্যতীত আমাদের অন্য কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনর্জীবন দেয়া হবে না।

(৩০) (হে রসূল!) আপনি যদি সে দৃশ্য দেখতেন যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, আল্লাহ পাক বলবেনঃ একি বাস্তব সত্য নয়? সকলে বলবে, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের শপথ! তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, তবে এখন নিজেদের কুফরের বিনিময়ে আযাব ভোগ কর।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

কালবী (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার আবু সুফিয়ান এবনে হারব, আবু জেহেল এবনে হিশাম, ওলীদ এবনে মগিরা, নজর এবনে হারেস, আকাবা, ওতবা এবং শাইবা এবনে রবীয়া, উমাইয়া এবনে খালফ এবং হারেস এবনে আ'মেরসহ একদল কাফের হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে থাকে। নজর এবনে হারেসকে অন্যরা জিজ্ঞাসা করে, হে আবু কাতিলা! তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ? মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি বলেন?

সে বললো, আমি জানিনা তিনি কি বলেন, তবে আমি এতটুকু উপলব্ধি করি যে, তাঁর রসনা নড়াচড়া করে এবং প্রাচীন কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করেন, যেভাবে আমি তোমাদেরকে পূর্বকালের ঘটনাবলী শুনিয়ে থাকি। আবু সুফিয়ান বললো, তাঁর কিছু কথা সত্য মনে হয় কিন্তু আবু জেহেল বললো, অবশ্যই নয়, তাঁর কোন কথা সত্য স্বীকার করোনা। আমি মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত নই।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) এ কাফেররা আপনার নিকট পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে, পবিত্র কোরআনের অকাট্য দলিল প্রমাণ তারা লক্ষ্য করে। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তর হিংসা এবং শত্রুতায় পরিপূর্ণ, তাই তারা সত্যকে গ্রহণ করতে পারেনা, তাদের অন্যায় আচরণই হেদায়েত থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। আল্লাহ পাকের

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৮৬
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৫
খোলাসাতুততাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৮

পবিত্র কালাম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা তাঁর কথা-বার্তায় কান পেতে থাকতো। হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের কল্যাণের জন্যে নয়, সত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনেও নয়; বরং শত্রুতার উদ্দেশ্যে। তাদের অনবরত সত্যদ্রোহিতা তাদের সত্যকে গ্রহণের যোগ্যতা বিনষ্ট করে দিয়েছে। তাই তারা বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, অন্যায় অসত্য পথকেই তারা সঠিক পথ মনে করেছে। তাদের এ অবস্থাকে পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ

(আমি তাদের মনের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি যেন তারা বুঝতে না পারে আর তাদেরকে বধির করে রেখেছি।) কথাটিকে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

"(হে রসূল!) আপনি যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করেন তখন আপনার মধ্যে এবং যারা আখেরাতের বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে আমি আবরণ ফেলে দেই"।

বস্তুত এ অবস্থা ঠিক তখনই হয় যখন মানুষ সত্যদ্রোহিতায় চরম পর্যায়ে পৌঁছে এবং সত্য গ্রহণের কোন সম্ভাবনা না থাকে। মক্কার কাফেরদের সত্য-বিমুখতা এবং নাফরমানী এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনতে রাজি ছিলনা। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا

"যদি তারা সকল দলিল-প্রমাণ, যাবতীয় নিদর্শন এবং মোজেযা দেখে তবুও ঈমান আনবে না"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার কারণে তাদের হৃদয়-মন গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই ঈমান লাভের সৌভাগ্য থেকে তারা হয়েছে বঞ্চিত। তারা আলোকে আলো এবং ভালকে ভাল বলে গ্রহণ করতে পারেনা। এমনকি তাদের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে তারা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে, এরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ

যখন (হে রসূল!) তারা আপনার নিকট কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার জন্যে আসে

তখন এ কাফেররা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলে, এ হলো প্রাচীনদের কিস্‌সা কাহিনী, এছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলে যেভাবে আমরা রুস্তম এবং অন্যান্য লোকদের কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করে থাকি, ঠিক তেমনি কোরআনেও আদ ও সামুদ জাতির ঘটনা রয়েছে। আর এটি কোন বিস্ময়কর বিষয় নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ج

পৌত্তলিকদের নসীব এত মন্দ যে, তারা শুধু ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিজেরাই বঞ্চিত হয়নি, বরং অন্যদেরকেও বঞ্চিত করেছে। আর এভাবে তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মোহাম্মদ এবনে হানাফীয়া এবং কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা পবিত্র কোরআন থেকে অন্যদেরকেও দূরে রাখতো, নিজেরাও দূরে থাকতো, কেননা তাদের মতে এ আয়াত মক্কায়ে মোয়াজ্জমার সেই কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা পবিত্র কোরআন থেকে মানুষকে দূরে রাখতো এবং নিজেরাও দূরে থাকতো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, এ আয়াত আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোন পৌত্তলিক কষ্ট দিতে চাইলে তাকে বাধা দিতেন কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান আনেননি।

এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে উবাই হেলালের সূত্রে অন্য একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য সম্পর্কে। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মক্কার পৌত্তলিকদের এক দল একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু তালেবের নিকট হাযির হলো এবং আরযী পেশ করলো যে, আপনি মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমাদের নিকট সোপর্দ করুন এবং তার বদলে আমাদের কোন সুন্দর যুবককে গ্রহণ করুন। আবু তালেব জবাব দিয়েছিলো, তোমরা চাও যে আমি আমার সন্তানকে তোমাদের নিকট দিয়ে দেই আর তোমরা তাকে হত্যা কর এবং তার বদলে তোমাদের সন্তানকে আমি লালন-পালন করি, এটি ইনসাফের কথা নয়।

আবু তালেবকে ইসলামের দাওয়াত

বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে দাওয়াত দেন।

আবু তালেবের জবাব

আবু তালেব বলেন, কোরায়শ আমাকে লজ্জা দেবে- এ আশংকা না থাকলে আমি মুসলমান হয়ে তোমার নয়ন মনের শান্তির কারণ হতাম, তবু যতদিন জীবিত আছি তোমার পক্ষ থেকে শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করতে থাকবো।

আবু তালেব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে তাঁর কবিতায় বলেছেনঃ আমার সমাধিস্থ হওয়া পর্যন্ত এ লোকেরা কোন দিন তোমার নিকট পৌঁছতে পারবেনা। তুমি প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের কাজ করতে থাক। কোন ভয় নেই, কোন বাধা নেই। তুমি আমাকে আহ্বান করেছ, আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে, তুমি আমার কল্যাণকামী এবং তুমি সত্যবাদী, আমানতদার। আর তুমি এমন ধর্ম পেশ করেছ যা সকল ধর্মের মধ্যে উত্তম। কিন্তু লোকেরা আমাকে তিরষ্কার করবে এ আশংকা করি। যদি মানুষের তিরষ্কারের আশংকা না থাকতো তবে তুমি আমাকে দেখতে যে, আমি প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করেছি।[১]

وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

আর মুশরেকরা তাদের আচরণের মাধ্যমে এবং তাদের অনাচারের পরিণামে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে, তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে নিজেরাই ধ্বংস হবে। তাদের এ আত্মঘাতী এবং ধ্বংসাত্মক নীতি তারা উপলব্ধিও করতে পারে না। একথা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, প্রত্যেকটি মানুষের কৃতকর্মের পরিণামই তাকে ভোগ করতে হবে।

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ

(হে রসূল!) যদি আপনি কাফেরদের সেই অবস্থা দেখতেন যখন তাদেরকে দোযখের পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে, দোযখের কঠিন আযাবের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ। তখন তারা বলবে হায় আক্ষেপ! যদি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় তবে আমরা আর অন্যায় অনাচার করবো না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করবো না। এবং আমরা প্রকৃত মোমেন হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের এ আবেদন ফলপ্রসূ হবেনা। তাদের এ অসময়ের কান্না গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ط

অর্থাৎ তাদের এ অনুতাপ সত্যিকার অনুতাপ নয়; বরং তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণাম দেখে অগত্যা আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাদের এসব কথা। পাপাচারের যে প্রভাব এ জালেমরা তাদের অন্তরে গোপন রেখেছিল তাদের শাস্তি অবধারিত দেখে তাদের মনের গোপন কথা তারা প্রকাশ করেছে যেন বর্তমানে যে আযাবের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

---

১ : তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৮

ইসলামের তিনটি মৌলিক নীতি

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইসলাম তিনটি মৌলিক নীতির উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানায়–

১. তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস।

২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হওয়ার প্রতি বিশ্বাস।

৩. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস।

অন্যান্য বিষয় সমূহ এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যখন এ মৌলিক বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তখন সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তার জীবনে একটা বিরাট বিপ্লব আসে, সে সরল সঠিক পথের যাত্রী হয়। বিশেষতঃ মানুষ যখন একথা বিশ্বাস করে আর সে বিশ্বাস তার অন্তরে বদ্ধমূল হয় যে, অবশেষে আমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং আমার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ হবে। ভাল আমল হলে পুরষ্কার, আর মন্দ আমল হলে কঠোর কঠিন শাস্তি অবধারিত, তখন মানুষের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। বিশেষতঃ যখন মানুষ এ জীবন্ত সত্য উপলব্ধি করে যে, আমার এ জীবন সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী, যে কোন মুহূর্তে আমার এ জীবনের অবসান ঘটতে পারে মৃত্যুর অলজ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে, আল্লাহ পাকের হুকুমে।

দ্বিতীয়ত, এ জীবনের সাফল্য আমার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে আমাকে সচেষ্ট হতে হবে। আমি আমার পরকালের জন্যে যা করবো তাই পাব। যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

(আর তোমরা যা কিছু করে পাঠাবে তোমাদের জন্যে আখেরাতে আল্লাহ পাকের দরবারে তার উৎকৃষ্টতর বিনিময় পাবে, দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।) পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না তারা আখেরাতের জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। তাদেরকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করার জন্যে তার পার্শ্বে দাড় করানো হবে তখন দোযখের শাস্তির ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তারা এ আকাজ্ক্ষা করবে যে, আল্লাহ পাক যদি দয়া করে তাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করেন তবে তারা খাঁটি মোমেন হবে। আল্লাহর বিধান সমূহ মেনে চলবে।

তাদের এ আকাজ্ক্ষা প্রকাশে দৃশ্যতঃ মনে হয় যে, তাদের অন্তরে সত্যিই ঈমান আনয়নের সুদৃঢ় ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের আসল কথা বলে দিয়েছে بَلْ শব্দ দ্বারা অর্থাৎ দুনিয়াতে মোমেন না হওয়ার জন্যে তাদের যে অনুতাপ তা সত্য নয়। তারা পৃথিবীতে যেভাবে মিথ্যাবাদীতায় অভ্যস্ত ছিল ঠিক তেমনি এখন যে কথা

বলছে তাতেও তারা মিথ্যাবাদী। কথা শুধু এতটুকু যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে আখেরাত সম্পর্কীয় যেসব কথা তারা শ্রবণ করতো এবং নিজেদের জেদ বা লোভের কারণে সে কথাগুলোকে গোপন করে রাখত, আজ একটি একটি করে তা তাদের সম্মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এক আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত তারা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর সত্যতাও তারা অবলোকন করছে এবং অবশেষে আখেরাতে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তাদেরকে হাযির হতে হবে– একথা তারা সর্বদা অবিশ্বাস করতো, আজ তা বাস্তব সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি হবে দোযখ, একথা দুনিয়াতে শুনেছে বারে বারে, কিন্তু মানে নাই। আজ সে দোযখের আগুন দাউ দাউ করে সচক্ষে জ্বলতে দেখে দুনিয়ার সকল অংহকারী নাফরমানরা বিনয়ী হয়ে বলছে, যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করা হয় তবে আমরা প্রকৃত মোমেন হতাম। কিন্তু যিনি মানুষের জীবনের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত তিনি তাদের এ আস্ফালন যে মিথ্যা তা ঘোষণা করে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

অর্থাৎ যদি তারা পৃথিবীতে পুনরায় ফিরেও যায় তবে পূর্বের ন্যায় পাপাচার ও অনাচারেই লিপ্ত হবে। বর্তমান প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার সবই বিস্মৃত হবে। পৃথিবীতে মানুষ বিপদে পড়লে যেমন আল্লাহকে ডাকে আর বিপদ দূর হলে পুনরায় আল্লাহর নাফরমানী করে, ভুলে যায় আল্লাহ্ পাকের দয়া মায়ার কথা এদের অবস্থাও তদ্রুপ।[১]

وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ দূরাত্মারা মিথ্যাবাদী। এর একটি অর্থ এই যে, পুনরায় পৃথিবীতে তাদেরকে প্রেরণ করা হলে তারা যে প্রকৃত মোমেন হওয়ার অঙ্গীকার করছে এ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রেও তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। তারা এ অঙ্গীকারের কথা ভুলে যাবে, আবার আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য এবং নাফরমান হবে।

অথবা এর এ অর্থ হতে পারে যে, তারা মিথ্যাবাদীতায় অভ্যস্ত, আর সে অভ্যাস মোতাবেক এখনও তারা মিথ্যা বলছে।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় তবে তারা তাদের মিথ্যাবাদীতার অভ্যাস বর্জন করবে না; বরং তারা কুফর ও নাফরমানী অব্যাহত রাখবে এবং দোযখের আযাব প্রত্যক্ষ করে তারা যা বলছে তাও মিথ্যাই বলছে।[২]

১ : তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৮০
২। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৮১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩০
তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৪

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করার তিনটি কারণ আদম (আঃ)-এর সম্মুখে বর্ণনা করবেন। এরশাদ হবে–

১. আমি কাফেরদেরকে আমার রহমত থেকে বঞ্চিত করেছি আর এর অঙ্গীকার করেছি। আমি মিথ্যাবাদীতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে ঘৃণা করি। যদি একথা না হতো তবে হে আদম! আমি তোমার সকল সন্তানের উপর আজ রহমত করতাম। (কোন ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করতাম না) কিন্তু আমার কথা ঠিক থাকবে, আর সে কথা হলো, যদি আমার রসূলগণের বিরোধিতা করা হয়, আর আমার নাফরমানী করা হয় তবে জ্বীন এবং মানুষ দ্বারা আমি দোযখকে পরিপূর্ণ করবো।

২. হে আদম! যাদের সম্পর্কে আমার জানা আছে যে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয় তবে তারা আবার সেই পাপাচারে লিপ্ত হবে যা পূর্বে তাদের মধ্যে ছিল। তারা অনাচার পরিহার করবে না। তাদের ব্যতীত আমি অন্যদেরকে দোযখে নিক্ষপ করবো না।

৩. হে আদম! আমি তোমাকে আমার এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ফয়সালাকারী মনোনীত করি, তুমি আমল পরিমাপের সময় পাল্লার নিকট দাড়াও, যার সৎ কাজের পাল্লা মন্দ কাজের পাল্লা থেকে সামান্যও ভারী হবে তার জন্যে জান্নাত রয়েছে (একথা এজন্যে বলা হচ্ছে যেন তুমি জান যে, আমি শুধু জালেমদেরকেই দোযখে নিক্ষেপ করবো)।[১]

وَقَالُوٓا اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيْنَ

যারা কাফের, আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, যারা বস্তুবাদী বা ভোগবাদী, যারা অপরিণামদর্শী তারা বলে দুনিয়াই সব কিছু, দুনিয়ার এ জীবনই বাস্তব, এ জীবনের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, আনন্দ-উল্লাসই জীবনের মূল লক্ষ্য, পরকাল বলতে কিছুই নেই। যারা ভোগবাদের মরফিয়া পান করে আত্মহারা হয় তারা বলে নিশ্চিত বাস্তবকে বর্জন করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কল্পনায় সচেষ্ট হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু যেদিন আখেরাত বা পরকাল অত্যন্ত বাস্তব সত্যরূপে দেখা দেবে, যখন তারা দোযখের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে দুনিয়াতে যা অস্বীকার করেছিলে তার শাস্তি ভোগ কর। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ط

(হে রসূল!) যদি আপনি সেই অবস্থা দেখেন যখন এ দূরাত্মা কাফেরদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাড় করানো হবে তখন আপনি এক বিস্ময়কর দৃশ্য

১ । তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩০
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৮২

দেখবেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ অথবা আল্লাহ্ পাকের অনুমতিক্রমে দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ বলবেনঃ

اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط

কবর থেকে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, অসৎ কাজের শাস্তি সত্য নয় কি? ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা দুনিয়াতে কেয়ামতকে অস্বীকার করতো, পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করতো না তাদের অসহায় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে। এরপর তারা যখন কেয়ামতের কঠিন দিনের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে এবং নেককারদের সওয়াব এবং বদকারদের শাস্তি দেখবে তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এসব কি সত্য নয়? তখন তারা নিরুপায় হয়ে বলবে পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط

(হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই সত্য।)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন এক অবস্থায় এসব কথা-বার্তা হবে। আর কেয়ামতের কোন অবস্থায় কাফেররা অস্বীকার করবে আর কোন সময় স্বীকারও করবে। আল্লাহ পাক তাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন (অথবা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতা বলবেন) তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি ভোগ কর। তোমরা যা অবিশ্বাস করতে তারই স্বাদ গ্রহণ কর।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى
ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّ
لَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَدْ
نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ
فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ
سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى
الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩১) যারা আল্লাহ পাকের মোলাকাতকে মিথ্যা মনে করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশেষে যখন তাদের নিকট অতর্কিত ভাবে কেয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমাদের ত্রুটির জন্যে, যা আমরা এ ব্যাপারে করেছি। তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে, তারা যা বহন করবে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

(৩২) দুনিয়ার এ জীবন খেলাধূলা এবং মন ভোলানো ছলনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে তাদের জন্যে পরকালের আবাসই উত্তম, তোমরা কি এ সত্য উপলব্ধি করনা?

(৩৩) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা যা বলে তা অবশ্যই আপনাকে কষ্ট দেয়। মূলতঃ তারা শুধু আপনাকেই মিথ্যাবাদী বলেনা; বরং এ জালেমরা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে।

(৩৪) (হে রসূল!) আপনার পূর্বে বহু রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে, তাঁরা সেই মিথ্যারোপ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, অবশেষে তাঁদের নিকট আমার সাহায্য এসেছে, আর আল্লাহর কথা কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা, আর রসূলগণের কিছু ইতিবৃত্ত আপনার নিকটও এসেছে।

(৩৫) (হে রসূল!) তাদের বিমুখ হওয়া যদি আপনার নিকট দুঃসহ হয়, তবে মাটিতে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ির সন্ধান করতে পারলে তা করুন, এরপর তাদের জন্যে কোন মোজেযা নিয়ে আসুন, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সকলকে সরল সঠিক পথে এক করে দিতেন, অতএব, (হে রসূল!) যারা জানেনা, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

তফসীরুল কোরআন

যারা আল্লাহ পাকের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে তারা নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতে দু'টি কথা এরশাদ হয়েছে ঃ

১. প্রত্যেকটি মানুষকে তার যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে- একথায় যারা অবিশ্বাস করে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

২. যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযিরীকে অস্বীকার করে তথা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করে এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতেই ব্যয় করে, তারা কেয়ামতের দিন তাদের মন্দ ও নিন্দনীয় কর্মের বোঝা বহন করে চলবে।[১]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন নেককারদের নেক আমল তাদের জন্যে সওয়ারী বা বাহন হবে (এবং তারা তার উপর আরোহন করবে)। পক্ষান্তরে, যারা বদকার হবে তাদের পাপাচারের বোঝা তাদের মাথায় তুলে দেয়া হবে।

হাদীস শরীফে একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, মোমেন যখন কবর থেকে বের হবে তখন এক অতি সুন্দর, আকর্ষণীয়, সুগন্ধময় ব্যক্তি তার সম্মুখে উপস্থিত হবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, তুমি আমাকে চেন? মোমেন বলবে না। তখন সে বলবে, আমি তোমার জীবনের নেক আমল। তুমি আজ আমার উপর আরোহণ করবে। দুনিয়ার জীবনে আমি তোমার উপর আরোহণ করেছি। আর কাফের ব্যক্তি যখন কবর থেকে বের হবে তখন তার সম্মুখে একটি মন্দ এবং দুর্গন্ধময়, কুৎসিৎ চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৭

উপস্থিত হয়ে বলবে তুমি কি আমাকে চেন? কাফের ব্যক্তি বলবে, না। তখন সে বলবে আমি তোমার জীবনের মন্দ কাজ সমূহ। দুনিয়াতে অনেক দিন তুমি আমার উপর আরোহন করেছ আজ আমি তোমার উপর আরোহন করব।

আলোচ্য আয়াতে 'লেকা' শব্দটির অর্থ মোলাকাত তথা আল্লাহর মোলাকাত। যেহেতু আল্লাহ পাকের দীদার কাফেরদের নছীব হবে না তাই এখানে এর অর্থ হবে হিসাব–নিকাশের জন্যে কেয়ামতের দিন উপস্থিতি।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে সুদ্দীর সূত্রে আরেকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন কোন পাপী ব্যক্তি কবরে প্রবেশ করে তখন তার নিকট একজন কৃষ্ণ বর্ণের কুৎসিৎ চেহারা বিশিষ্ট দুর্গন্ধময় ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং কবরে তার পাশে থাকে। তাকে বলে তোমার চেহারা কত বিশ্রী! আগন্তুক বলে, আমি তোমারই কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি। তোমার কৃতকর্ম এমনই ছিল। কেয়ামত পর্যন্ত ঐ দুর্গন্ধময় ব্যক্তিটি তার সঙ্গে থাকবে। কেয়ামতের দিন সে তাকে বলবে, ভোগ বিলাসের আকৃতিতে দুনিয়াতে আমি তোমাকে বহন করেছি আজ তুমি আমাকে বহন করবে। পাপাচারের পরিণামে ঐ ব্যক্তি পাপাচারীর পৃষ্ঠদেশে আরোহন করবে এবং তাকে দোযখে নিয়ে যাবে। পবিত্র কোরআন একথাটিই ব্যক্ত করেছে এভাবে ঃ[২]

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط

(তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে তাদের পৃষ্ঠ-দেশে।)

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ

আলোচ্য আয়াতে একথাও এরশাদ হয়েছে, যখন হঠাৎ কেয়ামত আসবে অর্থাৎ মানুষ তাদের দুনিয়াদারী কর্মকান্ডে মশগুল থাকবে এমন অবস্থায় হঠাৎ কেয়ামতের ঘোষণা হবে। যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করেনি তারা সেদিন আক্ষেপ করবে, তাদের সেই আক্ষেপ-অনুতাপ বিফল হবে কেননা, পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি এ জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিসরেই করতে হয়। এখানেই কর্ম আর পরকালে ফল। যারা কর্মস্থলে অবহেলা করে কর্মফল লাভ করার ভাগ্য তাদের হয়না। তাই আক্ষেপ-অনুতাপ তখন অনর্থক হয়।

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত السَّاعَة। শব্দটি কেয়ামত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেনঃ কেয়ামতকে এ শব্দ দ্বারা এজন্যে বোঝানো হয়েছে যে. সেদিন তথা মহা বিচারের দিন অতি সত্বর আসবে।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫০

ইমাম রাজী (রঃ)-ও السَّاعَةُ। শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমেই পরকালীন জিন্দেগীর সূচনা হয়, তাই এ পর্যায়ে শব্দটির অর্থ মৃত্যুও হতে পারে।

আল্লামা জমখশরী তাঁর তফসীরে কাশ্যাফে এবং আল্লামা আলূসী তার রুহুল মাআনীতেও শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط

"দুনিয়ার এ জীবন খেলাধূলা এবং মন ভোলানো ছলনা ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে পরকালের চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে ভুলে যায় তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে এ জীবনের সব কিছুই সত্য কিন্তু যখন মৃত্যুর মাধ্যমে এ জীবনের অবসান ঘটে, মানুষ পাড়ি জমায় পরপারে, দেখতে পায় সে তার কর্মফল। এখানকার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব কেউ তার সঙ্গী হয় না। তার সঙ্গী হয় একমাত্র তার কর্ম। সৎ কর্ম থাকলে নাজাত, আর অসৎ কর্ম হলে শাস্তি বা আযাব। তাই ধরাকে সরা মনে করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পবিত্র কোরআন এ আয়াতে দুনিয়ার এ জীবনের সত্যিকার মর্মার্থ বিশ্ব মানবের সম্মুখে তুলে ধরেছে। যদি এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যায়, যদি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সমূহ যথাযথ ভাবে পালন করা যায়, যদি হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ব এবং হক্কুল এবাদ বা বন্দার হক্ব সঠিকভাবে আদায় করা হয়, যদি জীবনের যাবতীয় কাজে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করা হয় তবে শুধু এ জীবনই সার্থক হয় না; বরং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীও হয় সার্থক।

এ জীবনেই পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়। পক্ষান্তরে যদি এ জীবনের সীমিত সময়কে অবহেলায় অতিবাহিত করা হয়, যদি আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য না করা হয়, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা হয়, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করা হয়, যদি জীবনের মালিক আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে জীবন যাপন করা হয়, তবে পরকালীন জীবনে আক্ষেপ করা ব্যতীত এবং দুঃখ কষ্ট ভোগ করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকেনা। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

১ তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৫

الدُّنْيَا مَلْعُوْنٌ وَمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ

(দুনিয়া অভিশপ্ত, আর দুনিয়াতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর জিকর অথবা আলেম বা তালেবে এলম, তারা অভিশপ্ত নয়।)

এখানে উল্লেখ্য যারা আল্লাহর জিকর করে তথা আল্লাহকে স্মরণ করে জীবনের কাজ করে ফলে আল্লাহর রহমত লাভ করে তাই তারা অভিশপ্ত নয়। যেমন আলেম এবং তালেবে এলম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনের এলম প্রচার করে, আর যারা দ্বীনের এলম শিক্ষা করে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হয় কেননা, তারা আল্লাহর জিকরেই মশগুল থাকে।

ইমাম যজরী (রঃ) লিখেছেন, যে কাজে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয় তথা যে কাজ শরীয়ত মোতাবেক করা হয় সে কাজ অবশ্যই আল্লাহর জিকরের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, হালাল রিয্কের অন্বেষণে যে কাজ করা হয় তথা হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জনের জন্যে যে সাধনা করা হয়, পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের জন্যে যে চেষ্টা করা হয়, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন, পাড়া-প্রতিবেশীর যে খেদমত করা হয়, মেহমানদারী, পরোপকার, গরীব দুঃখীর সাহায্য, সদকাহ-খয়রাত এক কথায় এসব কিছু আল্লাহর জিকরের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যদি জীবন সাধনা করা হয় তবে পরকালীন জিন্দেগীও সার্থক ও সুন্দর হয়।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

الكيس من دان نفسه ورضى بالكفاف وعمل لما بعد الموت

অর্থাৎ "বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের হিসাব নিকাশ করতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় জীবিকার উপর সন্তুষ্ট থাকে। আর মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে সাধনা করতে থাকে"।

অতএব, এ জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রস্তুতি এবং আয়োজনে যে সাধনা করা হয় তাই এ জীবনের সম্পদ, আর সে সাধনা শারীরিক হোক অথবা আর্থিক। এছাড়া আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত যা কিছু করা হয় তার কোন গুরুত্ব আল্লাহ পাকের দরবারে নেই। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে –"এ দুনিয়ার জীবন খেলাধূলা এবং মন ভোলানো ছলনা ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط

"যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে, যারা আল্লাহর বিধান সমূহের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে তাদের জন্যে পরকালের আবাসই উত্তম"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে পরহেযগার বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা শেরক থেকে দূরে থাকে আর পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করে তাদের জন্যে আখেরাতই উত্তম।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য)

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(আর আখেরাত উত্তম এবং চিরস্থায়ী।)

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

তোমরা কি তা-ও উপলব্ধি কর না? অর্থাৎ কোন্ কাজ তোমাদের জন্যে উপকারী আর কোন্ কাজ অপকারী এ সত্যও কি তোমরা অনুধাবন কর না?

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ

ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং হাকেম হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, আবু জেহেল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বলেছে, আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করিনা, বরং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তাকে মিথ্যাজ্ঞান করি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) সুদ্দী (রঃ)-এর সূত্রে অন্য একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেনঃ আখনাস এবনে সোরায়েক আবু জেহেল এবনে হিশামকে বলেছে, এখানে আমি ব্যতীত আপনার কথা শ্রবণকারী কেউ নেই। আপনি বলুন, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? তখন আবু জেহেল বললোঃ আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদী। কিন্তু সমস্যা হলো এই, যখন কোশাইয়ের বংশধরদের নিকট পতাকা, হাজীদের খেদমত, কা'বা শরীফের মোতাওয়াল্লী পদ, পঞ্চায়েত এবং নবুওয়্যত এক কথায় সব গৌরব চলে যায় এমন অবস্থায় অবশিষ্ট কোরায়শদের নিকট কি থাকে? আমি এজন্যে মোহাম্মদ এর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরোধিতা করি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

لَا يُكَذِّبُوْنَكَ

নাহিয়া এবনে কা'ব বর্ণনা করেন, আবু জেহেল হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলেছিল যে, আমরা আপনার প্রতি কোন সন্দেহ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩৪

প্রকাশ করিনা। আর আপনাকে মিথ্যাবাদীও বলিনা, বরং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তাকে মিথ্যাজ্ঞান করি। আর যেহেতু তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে তাই তাদেরকে এ আয়াতে জালেম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আমি জানি কাফেররা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারা আপনাকে কষ্ট দেয় এজন্যে আপনি ব্যথিত এবং মর্মাহত। আর তারা ঈমান আনে না এজন্যে আপনি দুঃখিত কিন্তু তারা যে শুধু আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তাই নয়, বরং এ জালেমরা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকেও মিথ্যাজ্ঞান করে। কেননা, তারা অন্য ব্যাপারে আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করেনা, শুধু নবুওয়্যতের দাবীকে মিথ্যা মনে করে, এর অর্থ হলো যিনি নবুওয়্যত দান করেছেন তাকে অবিশ্বাস করে অতএব, (হে রসূল!) আপনি ব্যথিত হবেন না।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একটি বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছেন। বর্ণিত আছে যে, রাতের অন্ধকারে আবু জেহেল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহের পশ্চাতে দাড়িয়ে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতো। এভাবে আবু সুফিয়ান এবনে সখর এবং আখনাস এবনে সোরায়েকও হাযির হতো। ভোরে যখন সূর্যের আলো দেখা গেল তখন একে অন্যকে দেখে আশ্চর্যন্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কেন এসেছ?

দেখা যায়, সকলে একই উদ্দেশ্যে তথা পবিত্র কোরআন শ্রবণের জন্যে এসেছে। অবশেষে তারা বললো, যদি আমাদের আসা যাওয়া কোরায়শ যুবকরা দেখে তবে আর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়া যাবে না। অতএব, আমরা সকলে অঙ্গীকার করি, আর এখানে আসবো না।

পরবর্তী রাতে প্রত্যেকে মনে করেছে তারা দু'জন তো আসবে না আমি যাই। এ চিন্তার কারণে প্রত্যেকেই হাযির হলো এবং প্রত্যেকে একে অন্যকে তিরষ্কার করতে লাগলো। এবং পুনরায় অঙ্গীকার করলো, "আমরা আর এখানে আসবো না"। কিন্তু তৃতীয় রাত্রেও তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাড়ীর পেছনে হাযির হলো এবং অঙ্গীকার করলো, "আর কোন দিনও আসবো না"। এরপর আখনাস এবনে সোরায়েক, আবু সুফিয়ান এবনে হারবের নিকট আসলো এবং বললো, হে আবু হানজালা! তুমি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট যা শ্রবণ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৩৪-৩৫
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৮৭

করেছ সে সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? আবু সুফিয়ান বললোঃ হে আবু সালাবা! আল্লাহর শপথ! আমি যে সব কথা শুনেছি তা আমি খুব ভাল ভাবেই বুঝি। অবশ্য কিছু কিছু কথা এমনও আছে যা আমি বুঝতে পারিনি। তখন আখনাস বললোঃ আল্লাহর শপথ! এ অবস্থা আমারও।

এরপর আখনাস আবু জেহেলের নিকট গেল এবং বললো হে আবুল হাকাম! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে যা কিছু শ্রবণ করেছ এ সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? তখন আবু জেহেল বললো দেখ, আমরা এবং বনু আবদে মনাফ সর্বদা সম্মান এবং মর্যাদার লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছি। তারা কোন অনুষ্ঠান বা দাওয়াত করলে আমরাও তা করেছি। তারা দান খয়রাত করলে আমরাও তা করেছি। তাদের সঙ্গে সর্বদা আমাদের প্রতিযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। এখন তারা বলছে, আমাদের মাঝে একজন পয়গম্বরের আগমন হয়েছে। তাঁর নিকট আসমান থেকে ওহী নাযিল হয়। আমরা এ বিষয়টির মোকাবেলা কিভাবে করবো?

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কোন অবস্থাতেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবো না এবং তাঁর নবুওয়্যতকে মেনে নেব না। আমাদের উপর তাঁর প্রাধান্যকে স্বীকার করবো না। আখনাস একথা শ্রবণ করে চলে গেল।

এতদ্বারা এ আয়াতের

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

অর্থ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হলো যে, এ জালেমরা (হে রসূল!) শুধু আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করেনা, বরং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে।[১]

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ কথা সর্বজন বিদিত যে, কোন রাষ্ট্রদূতের যদি অবমাননা করা হয় তবে তার অর্থ হয় সে রাষ্ট্রের অবমাননা করা। তাই এমন অবস্থায় সে অবমাননার প্রতিকার বা প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্ব নেয় স্বয়ং রাষ্ট্র।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু রহমতুল্লিল আলামীন হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তিনি ছিলেন দয়াল নবী, তিনি ছিলেন দয়ার সাগর, তাই কাফেরদের ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হতেন। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ হে প্রিয় রসূল! আপনি এ কাফেরদের জন্যে দুঃখিত হবেন না। কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা আপনার নয়, বরং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে মিথ্যাজ্ঞান করছে। তাদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং জেদই হলো তাদের নাফরমানীর কারণ। আপনি তাদের ব্যাপার স্বয়ং আল্লাহ পাকের হাতেই ছেড়ে দিন।[২]

১ তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা ৫১-৫২
২ ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৭০

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا

আর কাফেরদের সত্যদ্রোহীতা নতুন কিছু নয়। যুগ যুগ ধরে তাদের এ আচরণ অব্যাহত রয়েছে। (হে রসূল!) আপনার পূর্বে যে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন তাদের সঙ্গেও কাফেররা এমন অন্যায় আচরণই করেছে। তাদের প্রতি উপহাস এবং বিদ্রুপ করা হয়েছে। তাদেরকে মিথ্যা জ্ঞান করা হয়েছে। তাদের প্রতি নির্যাতন ও উৎপীড়ন করা হয়েছে। তারা ঐ অবস্থাতেও সবর করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনের কষ্ট দূর করেছেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, কাফেররা মূলতঃ আল্লাহ্র বিধানকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের লড়াই (হে রসূল!) আপনার সঙ্গে নয়; বরং স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সঙ্গে। অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে চিন্তিত বা দুঃখিত হবেন না। বরং তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ পাকের হাতে ছেড়ে দিন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনের কষ্ট দূরীভূত করার লক্ষ্যে অন্য একটি কথা বলেছেন, আর তা হল ইতিপূর্বে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে তাঁদের উম্মতের লোকেরা এমন অন্যায় ব্যবহার করেছে এবং তাঁরা সবর অবলম্বন করেছেন, অবশেষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে সাহায্য এবং বিজয়। (হে রসূল!) অবশেষে আল্লাহ্ পাক আপনাকেও সাহায্য এবং বিজয় দান করবেন। এরপর আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের অঙ্গীকারকে আরো তাগিদ করে এরশাদ করেছেন পরবর্তী বাক্যে।[১]

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ج

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কথায় কোন পরিবর্তন হয় না। (হে রসূল!) আপনাকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হবে। এতে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হবে না।

وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ

ইতিপূর্বে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছেন তাঁদের খবর আপনার নিকট পৌঁছেছে। কিভাবে তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাঁরা কত বেশী সবর করেছেন, আর কিভাবে তাঁরা আল্লাহ পাকের সাহায্য পেয়েছেন এবং অবশেষে জালেমদেরকে নিপাত করা হয়েছে। অতএব, আজ যারা আপনার প্রতি জুলুম অত্যাচারে খড়গহস্ত, পূর্ববর্তী জালেমদের ন্যায় এদেরও ধ্বংস অনিবার্য।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ

১ তফসীরে কবীর খন্ড-১২. পৃষ্ঠ-২০৬

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হারেস এবনে আমের এবনে নওফেল এবনে আবদে মোনাফ কোরায়শের আরো কিছু লোক নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় এবং বলে, অন্যান্য নবীগণ যেভাবে তাদের নবুওয়্যতের সত্যতার দলিল হিসেবে নিদর্শন বা মোজেযা প্রদর্শন করতেন, আপনিও তেমন কিছু আমাদেরকে দেখিয়ে দিন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন। তাঁর অন্তর ছিল দয়া-মায়ায় পরিপূর্ণ। তাঁর একান্ত আকাঙ্খা ছিলো যে, সকলেই হেদায়েত কবুল করুক, নাজাতের পথ ধরুক। সেজন্যে তিনিও ভেবেছিলেন, যদি আল্লাহ পাক এমন কোন নিদর্শন বা মোজেযা দান করতেন যা দেখে এ কাফেররা হেদায়েত লাভ করত তবে খুবই ভাল হত। কিন্তু তখন আল্লাহ পাকের মর্জি তা ছিলনা। তাই যারা এসেছিল তারা ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।১

এ আয়াতেও আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে (হে রসূল!) তাদের হেদায়েতের যে আকাঙ্খা আপনি করেন নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত মহৎ। কিন্তু সকলকে হেদায়েত করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে আল্লাহ পাক কোন নবী প্রেরণ না করেই হেদায়েত করতে পারতেন। আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করবেন শুধু সে হেদায়েত লাভ করবে। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে মাটিতে সুড়ঙ্গ এবং আকাশে সিঁড়ি দিয়ে তাদের জন্যে কোন বিস্ময়কর মোজেযা নিয়ে আসুন। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জির খেলাফ কেউ কিছু করতে পারেনা। অতএব, আপনিও তা পারবেন না।

একখানি হাদীসে আছে, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল হয় তবে তাঁর শানে কোন কিছুই বাড়বে না। আর যদি সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ তাঁর নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয় তবু তাঁর শান এতটুকু কমবে না। তিনি বে-নিয়ায, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অতএব, যদি কেউ শয়তানের অনুগামী হয়ে আল্লাহর নাফরমানী করে এবং নিজের ধ্বংস ডেকে আনে তবে তাতে আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি নেই। (হে রসূল!) যদি তাদের নাফরমানী আপনার জন্যে অসহনীয় হয় এমন অবস্থায় সম্ভব হলে আপনি মাটিতে সুড়ঙ্গ এবং আকাশে সিঁড়ি খুঁজে তাদের জন্যে কোন মোজেযা নিয়ে আসুন যা সম্ভব নয়।

অতএব, কাফেরদের হেদায়েতের ব্যাপার আল্লাহ পাকের হাতে ন্যস্ত করুন। আপনি তাদের জন্যে ব্যাকুল হবেন না। যারা একথাও জানেনা যে, আল্লাহ পাকের মর্জি ব্যতীত হেদায়েতের লাভ করা সম্ভব নয় আপনি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

---

১ তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২০৭

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ
وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن
يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ
أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ
تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩৬) যারা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তারাই মানে। আর আল্লাহ্ পাক মৃতদেরকে জীবিত করবেন, এরপর তারা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

(৩৭) আর তারা বলে, তাঁর নিকট কোন নিদর্শন তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে কেন আসে না? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক নিদর্শন অবতরণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তাদের অনেকেই জানেনা।

(৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা নিজের দু' বাহুর সাহায্যে যে পাখী উড়ে তার মধ্যে এমন কোন প্রকার নেই যারা তোমাদের ন্যায় দলবদ্ধ না হবে। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকে একত্রিত করা হবে।

(৩৯) আর যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে তারা বধির ও মূক। তারা রয়েছে অন্ধকারে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথ ধরিয়ে দেন।

(৪০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় অথবা কেয়ামত এসে পড়ে তখন তোমরা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ডাকবে? বল যদি তোমরা সত্য হও।

(৪১) বরং তোমরা বিশেষ করে তাঁকেই ডাকতে থাকবে। ফলে তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সে বিপদ দূরীভূত করে দেন যে জন্যে তোমরা তাঁকে ডাক। আর যাদেরকে তোমরা (আল্লাহ পাকের সাথে) শরীক কর তাদেরকে ভুলে যাও।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের ঈমান না আনার কারণ ব্যক্ত করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) যাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত ব্যাকুল, তাদের অবস্থা মৃতের ন্যায়। তারা কিছু শ্রবণ করেনা। আপনি তৌহিদের প্রতি ঈমান আনয়নের যে আহবান জানান সে আহবানে শুধু এমন লোকই সাড়া দেবে যে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে। কিন্তু যারা বধির এবং মূক তারা আপনার কথা শ্রবণ করতে পারেনা। তাদের অবস্থা মৃত মানুষের অবস্থা। তাই তারা ঈমান আনেনা। তারা সত্যকে অনুধাবন করতে পারেনা। আজ যারা সত্যকে অস্বীকার করছে, কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন তারা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে, তখন সে সত্য তাদের সম্মুখে বাস্তব হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন তারা বাধ্য হয়ে মানবে কিন্তু তখনকার ঈমান বা বিশ্বাস তাদের জন্যে কোন অবস্থাতেই উপকারী হবে না।

وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো এ কাফেররা প্রকৃত অর্থে মৃত। তাদের অন্তর জীবিত নয়। অতএব, তারা আল্লাহর রসূলের কথা শুনবেনা। তাদেরকে তো কেয়ামতের দিন হাযির করা হবে। সেদিন তারা উপলব্ধি করবে কিন্তু সে উপলব্ধি তাদের কোন কাজে আসবে না।[১]

ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

অতঃপর তাদের সকলকে আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনিই তাদেরকে তাদের নাফরমানী, অবাধ্যতা এবং সত্যদ্রোহিতার শাস্তি দেবেন। এর পূর্বে তারা হক্ব কথা শ্রবণ করবে না। অথবা এর অর্থ হলো মোমেন বা কাফের সকলকেই আল্লাহ পাক পুনর্জীবন দান করবেন এবং কেয়ামতের কঠিন দিনে সকলেরই পুনরুত্থান হবে। তখন যার যেমন আমল হবে সে তেমনই বদলা পাবে। এজন্যে কোরআনে করীমে বারে বারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যেমন- এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

১ তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩৭

(আর সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দান করা হবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।) অতএব, যারা সত্যকে গ্রহণ করতে, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে প্রস্তুত হয় না, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে। তাদের জন্যে দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ প্রতিনিয়ত যে সত্যটি প্রত্যক্ষ করে তা হলো এ পৃথিবীতে মানুষ যেমন আগমন করে তেমনি এখান থেকে প্রত্যহ চির বিদায়ও গ্রহণ করে। কারো মৃত্যু বা বিদায় গ্রহণই তার জন্যে কেয়ামত। কেননা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে আলমে বরজখে চলে যায় এবং পরকালীন জিন্দেগীর নমুনা সে দেখতে পায়। এদিকে যারা তাকে মৃত অবস্থায় দেখে তারা নিজেদের পরিণাম দেখতে পারে, নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে আর এভাবে পরকালে বিশ্বাস তথা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ প্রায়ই আসে, কিন্তু তবুও যারা বিশ্বাস করেনা, পরিণামদর্শী হয় না, এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়েই মুগ্ধ-মত্ত থাকে, পরকালীন জিন্দেগীর কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, তারা যদি ঈমান না আনে তাদের জন্যে দুঃখ করার কিছু থাকেনা।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেনঃ যেভাবে আল্লাহ পাক মৃত লোকদেরকে কবর থেকে বের করতে সক্ষম এবং কেয়ামতের দিন তিনি সকলকে একত্রিত করবেন ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক এ কাফেরদের মৃত অন্তরকে প্রাণবন্ত করে তুলতেও পারেন এবং ঈমানের বলে বলীয়ান করতে পারেন। এটি তাঁর মর্জির ব্যাপার। অতএব, (হে রসূল!) কাফেরদের ব্যাপার আল্লাহ পাকের উপর সোপর্দ করুন।[১]

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط

এ আয়াতে মুশরেকদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল আমরা যেমনটি চাই ঠিক তেমন কোন নিদর্শন বা বিস্ময়কর মোজেযা আল্লাহর তরফ থেকে আপনার নিকট কেন আসেনা? যেমন জমিন থেকে ঝর্ণা-ধারা প্রবাহিত হওয়া বা এমনি অন্য কিছু।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً

১ তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২০৯

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রকার মোজেযা নাযিল করতে সম্পূর্ণ সক্ষম কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একথা অনেক লোকই জানেনা। অথবা এর অর্থ হলো তারা যে মোজেযা চায় তা যদি নাযিল করা হয় আর তারা তবু আল্লাহর তৌহিদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করে, এমন অবস্থায় তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে, একথা তারা জানেনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন آيَةً "শব্দের অর্থ নিদর্শন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে যে কোন নিদর্শন এর অর্থ নয়; বরং তাদের বর্ণিত নিদর্শন– তথা তারা যা চায় তা কেন অবতীর্ণ হয় না? কোরায়শ নেতাদের এটিই ছিল অভিযোগ। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনেক মোজেযা তারা দেখেছে কিন্তু কাফেররা সে মোজেযাতে তৃপ্ত হয়নি। তারা তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক নিদর্শন চেয়েছে। অথচ ফরমায়েশ পূর্ণ করা আল্লাহ পাকের জন্যে জরুরী নয়।

আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তাই করেন। আল্লাহ পাক যে কোন সময় যে কোন মোজেযা প্রদর্শন করতে সক্ষম। এমন মোজেযা যা দেখলে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হবে যেমন পাহাড়কে এনে তাদের মাথার উপর তুলে ধরা, যেমন বনী ইসরাঈলের সঙ্গে তাই করা হয়েছিল। অথবা এমন মোজেযা যা দেখার পর অবিশ্বাস করলে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু এমন মোজেযা না দেখাবার মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্যে আল্লাহর রহমত। কেননা যদি এমন মোজেযা দেখানো হতো আর এরপরও তারা অবিশ্বাস করতো তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। আর আল্লাহ পাক মক্কার কাফেরদেরকে ধ্বংস করতে চান না, এটি তাঁর একান্ত মেহেরবানী, নিতান্ত করুণা।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ

এ আয়াতে কাফেরদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা বা নিদর্শন উপস্থিত না করার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, অথবা আকাশে যত পাখী আছে সবই তো মানুষের ন্যায় আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার আকৃতি এবং প্রকৃতি দান করেছেন। প্রত্যেকে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আল্লাহ পাকের নিদৃষ্ট বিধান অমান্য করার সাধ্য কারো নেই। সকলের জন্যে যে সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে তার ভেতরই সকলকে থাকতে হয়। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ম নীতি সকলকে মেনে চলতে হয়। যদিও সকল প্রাণীই তার খাদ্যের প্রয়োজন ও অন্বেষণে জীবনে মরণে এককথায় সব ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে মানুষের ন্যায়. কিন্তু মানুষকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব

দেয়ার কারণে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। মানুষ যেহেতু বিবেকবান, বুদ্ধিমান তাই সে শীর্ষস্থানীয় সৃষ্টি বা অভিজাত সৃষ্টি। অতএব, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি লক্ষ্য করে তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস করা বা ঈমান আনা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। মানুষ যদি তার স্রষ্টার প্রতি ঈমান না আনে তবে সৃষ্টির মাঝে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকেনা। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে রাজী নয় তারা ঈমান না আনার অজুহাত খুঁজে বেড়ায়। যেমন মক্কার কাফেররা বলেছে তাদের চাহিদা মোতাবেক নিদর্শন না দেখলে তারা ঈমান আনবে না।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ কোন প্রকার জীব-জন্তু এমন নেই যা হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের ন্যায় দলবদ্ধ হবেনা। যদিও নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি মানুষের নিকট অগণিত, কিন্তু আল্লাহ পাকের দফতর সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর সবই আল্লাহ পাকের এলমে রয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ আমার দফতরে কোন কিছু বাদ দেইনি, সবই লিপিবদ্ধ, সবই সংরক্ষিত।

আর মানব জাতির মধ্যে কে ঈমান আনবে আর কে আনবে না সবই আল্লাহ পাকের জানা, মানুষ যা কিছু প্রকাশ করে আর যা কিছু গোপন করে সবই আল্লাহ পাক জানেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

(আল্লাহ পাক জানেন যা কিছু মানুষ গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে।)

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

আলোচ্য আয়াতে "আল কিতাব" শব্দটির ব্যাখ্যা যদি লৌহে মাহফুজ হয় তবে এর অর্থ হবে পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সমস্ত সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। আর "আল কিতাব" অর্থ যদি কোরআনে মজীদ হয় তবে এর তাৎপর্য হবে, মানুষের দ্বীনি প্রয়োজনের যাবতীয় কথা পবিত্র কোরআনে স্থান পেয়েছে।[১]

১ ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা-১৭১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩৮
তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-২৭৫

ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

(অবশেষে প্রাণী মাত্রকে তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে।)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, জীব-জন্তুর মৃত্যুই তাদের হাশর অর্থাৎ যখন তাদের মৃত্যু হয় তখন তারা আল্লাহ পাকের নিকট চলে যায়।

কিন্তু এবনে আবি হাতেম, এবনে জরীর এবং বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন সকল প্রাণীকে হাযির করা হবে, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী সকলকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। আর সেখানে বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ পাকের ইনসাফ বা সুবিচার প্রত্যক্ষ করবে। শিং বিশিষ্ট জন্তু যদি শিং বিহীন জন্তুর উপর জুলুম করে থাকে তবে সে জুলুমের বদলা শেষ বিচারের দিন দেয়া হবে। এরপর যখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে হক্ব ছিল তা প্রদান করা হবে তখন আল্লাহ্ পাক আদেশ দেবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও। জীব-জন্তুগুলো মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে। আর তখনই কাফেররা বলবে পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

(হায় আফসোস! যদি মাটিতে পরিণত হতাম তবে কত ভাল হতো।)

অর্থাৎ আর শাস্তির সম্মুখীন হতাম না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন যার প্রতি যার হক্ব রয়েছে তা আদায় করানো হবে, এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরী থেকে শিং বিহীন বকরীর হক্ব প্রদান করা হবে। তেবরানী "আল্ আওসাতে" হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে মোকদ্দমাটির ফয়সালা হবে তা হবে দুটি বকরীর, শিং বিশিষ্ট হবে একটি, আরেকটি বকরী শিং বিহীন হবে।[১]

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ

অর্থাৎ ইসলামের ডাকে শুধু তারাই সাড়া দেবে যারা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে আর যারা মৃত তাদেরকে তো আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৩৮

করাবেন। এতদ্বারা আল্লাহ পাক কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তারা কুফর ও নাফরমানীতে এত চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেন তাদের অন্তরের মৃত্যু হয়েছে। তাই তারা ঈমান আনবে না। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে তারা বধির এজন্যে তারা সত্য শ্রবণ করতে পারেনা। এবং তারা মূক কেননা, তারা সত্য কথা বলতে পারেনা তাই তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।[১]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে শ্রবণ করা জরুরী। যেহেতু তারা কুফরী ও নাফরমানীর কারণে সত্য শ্রবণ করেনা, তাই তা গ্রহণও করেনা। আর নূরে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ط أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"আর আমি দোযখের জন্যে অনেক জ্বীন ও ইনসান তৈরী করেছি, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করেনা। তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা সত্যকে দেখেনা। তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা সত্য কথা শ্রবণ করেনা। তারা হলো চতুঃস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট"।

مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ط

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা (তার সত্য থেকে বিমুখ হওয়ার দরুন) তাকে পথভ্রষ্ট করে রাখেন। আর যাকে ইচ্ছা তাঁর দয়া মায়ার কারণে তাকে সরল সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

(হে রসূল!) আপনি এ মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে আযাব আপতিত হয় যেমন ইতিপূর্বে কোন কোন জাতির উপর বন্যা, ঘূর্ণিবায়ু বা মাটি ধ্বসে যাওয়া- এ ধরনের বিপদ এসে পড়েছে অথবা মহা বিপদ কেয়ামতই এসে পড়ে, তোমরা আত্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ডাকবে? যদি তোমরা শেরকের এ দাবীতে সত্যবাদী হও তবে তো আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেই তোমাদের ডাকা উচিত। কিন্তু তোমরা কখনও তা করবে

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-২২০

না; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমরা বিশেষ করে তাঁকেই ডাকতে থাকবে। তখন তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সেই বিপদ দূর করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে দূর না-ও করতে পারেন। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, যাকে তোমরা এখন মা'বুদ হিসেবে শরীক করছো তাকে তোমরা এমন মুহূর্তে ভুলে যাও। অর্থাৎ তোমাদের বিপদের সময় তোমরা আল্লাহ্‌কে ঠিকই ডাক আর যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক কর তাদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এখানে–

وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ

(তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে যাকে শরীক কর তাকে ভুলে যাও।) এ ভুলে যাওয়ার তাৎপর্য হলো পরিত্যাগ করা। মূলতঃ মানুষ মাত্রেরই এ বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ আসমানী জমিনী বালা-মসিবত দূরীভূত করতে পারে না, তাই কঠিন বিপদের সময় পৌত্তলিকরাও আল্লাহ্ পাককে ডাকতে বাধ্য হয়।[১]

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌র তৌহিদ বা একত্ববাদকে মেনে নেয়ার প্রতি পৌত্তলিকদেরকে আহবান জানানো হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

(হে রসূল!) আপনি এ কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে বা কেয়ামতই আসে তখন তোমরা কি করবে? তোমরা কি তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে ডাকবে? তাতো অবশ্যই তোমরা করবে না; বরং তোমরা বিপদ মুহূর্তে শুধু আল্লাহ পাককেই ডাকবে। আর যে সব জিনিসকে আল্লাহ পাকের সঙ্গে শরীক কর সেগুলোকে তোমরা ভুলে যাবে তথা বর্জন করবে। অতএব, কেন তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আন না?

কেন তোমরা যা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর এমনকি বিপজ্জনক তা বর্জন করো না?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪০

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ
أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾
فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً
فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَ
خَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ
نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ
ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾

তরজমা

(৪২) (হে রসূল!) আমি আপনার পূর্ববর্তী বহু সম্প্রদায়ের নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দুঃখ কষ্ট অভাব দ্বারা পাকড়াও করেছি যেন তারা বিনীত হয়।

(৪৩) অতঃপর আমার শাস্তি যখন তাদের নিকট আপতিত হলো, কেন তারা বিনীত হলো না? বস্তুতঃ তাদের অন্তর পাষাণ হয়ে যায় এবং শয়তান তাদের কর্মকান্ডকে তাদের চোখে সুন্দর দেখায়।

(৪৪) অতঃপর যখন তাদেরকে প্রদত্ত উপদেশ তারা ভুলে গেল তখন প্রত্যেকটি বস্তুর দ্বার তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে যখন তারা তাতে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, পরিণামে তারা তখন নিরাশ হলো।

(৪৫) অতঃপর সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটন করা হলো, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের জন্যে।

(৪৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখ যদি আল্লাহ পাক তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরকে মোহর করে

দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কে আছে যে এগুলো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে? লক্ষ্য কর আমি কিভাবে আয়াত সমূহ বর্ণনা করি, তবু তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৪৭) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যদি তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব হঠাৎ অথবা প্রকাশ্যে আপতিত হয় তবে জালেম সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ কি ধ্বংস হবে?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুশরেকদের প্রতি যে কোন সময় অতর্কিতে আযাব আসতে পারে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, কাফেরদের প্রতি আযাব নাযিল হওয়া কোন কাল্পনিক ব্যাপার নয়; বরং ইতিপূর্বে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে কাফেরদের প্রতি আযাব নাযিল করা হয়েছে। আসমানী জমিনী বালা-মসিবত, অভাব-অনটন এবং অন্যান্য প্রকার কষ্ট দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা যেন তাদের অহংকার পরিহার করে, বিনয়ের পথ অবলম্বন করে এবং সরল সঠিক পূণ্য পন্থা গ্রহণ করে।

অবিশ্বাসীদের ধ্বংস অনিবার্য

বস্তুতঃ যারা আল্লাহর প্রেরিত নবী রসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে, আম্বিয়ায়ে কেরামের আহবানে সাড়া দেয়নি এমনকি তাঁদেরকে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্ট করেছে এমন জালেমদেরকে ইতিপূর্বে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে। আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউনের দলবল, নমরূদ, সাদ্দাদ, কারুণ, হামান সহ বহু ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং জাতির ঘটনা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে যারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে। যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা তাঁর অবাধ্য এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি অনিবার্য, বিশ্বের ইতিহাস একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সূরা ওয়াল ফাজরে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۝ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۝ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ..........

অর্থাৎ "(হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার প্রতিপালক কি করেছিলেন আদ জাতির এরাম গোত্রের প্রতি? যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যার সমতুল্য ইমারত কোন দেশেই নির্মিত হয়নি এবং সামুদ জাতির প্রতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল এবং বহু সৈন্য বাহিনীর অধিপতি ফেরাউনের প্রতি, যারা দেশে সীমা লঙ্ঘন করেছিল এবং অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।

এরপর আপনার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ওঁৎ পেতে আছেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের এবং কেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসীদের কঠোর কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ পাকের বিধান এই যে, তিনি সর্বপ্রথম অপরাধীদেরকে সতর্ক করেন এবং এ সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এতদ্বারা পাপীষ্ঠদেরকে আত্মসংশোধনের একটি সুবর্ণ সুযোগ দান করেন। যদি তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাপাচার পরিহার করে তথা আত্মসংশোধন করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন।

পক্ষান্তরে, যদি তারা হেদায়েতের পথ অবলম্বন না করে, বরং তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ পাক তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামতের আরো পথ খুলে দেন। তাদেরকে উন্নতি অগ্রগতি সমৃদ্ধি দান করেন। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে তারা আত্মহারা হয়, আল্লাহর নাফরমানী এবং অবাধ্যতা আরো শত গুণে বেড়ে যায়। আখেরাতে তাদের হিসাব নিকাশ হবে- একথা তারা সম্পূর্ণ ভুলে যায়, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর লোভ-লাভে, আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় তাদের দৌরাত্ম চরম পর্যায়ে পৌঁছে। তখন অতর্কিতভাবে আল্লাহ পাকের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করে। এমন সময় তাদের বাঁচার আর কোন পথ থাকে না। হাদীস শরীফে আছে, যখন কোন ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয় আর আল্লাহ পাক তাকে আরো নেয়ামত দান করেন এমন অবস্থায় তার আনন্দিত হওয়া উচিত নয়; বরং তার এ সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে, আল্লাহ পাক তাকে অবকাশ দিয়েছেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যাকে আল্লাহ পাক রিযক বৃদ্ধি করে দেন সে একথা চিন্তা করেনা যে, এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটি পরীক্ষা। আর যাকে দারিদ্র্যের কষাঘাত সইতে হয়, সেও চিন্তা করেনা যে, এটি তার জন্যে একটি পরীক্ষা (প্রথম ব্যক্তির জন্যে শোকরের পরীক্ষা আর দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যে সবরের পরীক্ষা)।

কা'বার প্রতিপালকের শপথ! যখন পাপীষ্ঠ লোকদেরকে পাকড়াও করার ইচ্ছা হয় তখন দুনিয়াতে তাদের জৌলুস বাড়িয়ে দেয়া হয়।

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২৬

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক কোন সম্প্রদায়কে সে পর্যন্ত পাকড়াও করেন না যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আত্মহারা না হয়।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন কোন সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করতে ইচ্ছা করেন তখন তাদের রিয্ক বৃদ্ধি করে দেন, তাদের মধ্যে খেয়ানত বৃদ্ধি পায় এবং তারা অহংকারী হয়। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক অতর্কিত ভাবে তাদেরকে পাকড়াও করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাক যে সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে কায়েম রাখতে ইচ্ছা করেন এবং তাদেরকে উন্নতি অগ্রগতি দান করতে চান, তাদেরকে চরিত্রের পবিত্রতা দান করেন এবং তাদেরকে মধ্য-পন্থী হওয়ার তৌফিক দান করেন।[১]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আমি আপনার পূর্বে অনেক নবী রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের উম্মতীরা তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি সেই সম্প্রদায়গুলোকে অভাব-অনটন এবং রোগ দ্বারা পাকড়াও করেছি যেন তারা শেরক ও কুফর থেকে তওবা করে, অহংকার পরিহার করে এবং বিনীত হয়ে তওবা এস্তেগফার করে। কিন্তু এ পাষাণ হৃদয় বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি, তারা আত্মসংশোধন করেনি। তাই আমার আযাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে। শয়তান তাদের অন্যায় আচরণকে শোভনীয়, মোহনীয় করে দেখিয়েছে। ফলে তারা সঠিক পথ গ্রহণ করেনি।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ ط

যখন তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত নসিহত ভুলে যায় এবং আল্লাহর বিধান অমান্য করে, আত্মবিস্মৃত হয় তখন অভাব-অনটনে পতিত হয়েও গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে, তওবা করে না এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের প্রতি আরও নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন।

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ

আল্লাহ পাকের সকল নেয়ামতের দুয়ার তাদের প্রতি আল্লাহ পাক উম্মুক্ত করে দেন। এ অবস্থায় তারা আল্লাহর নাফরমানীতে আরো বেশী অগ্রসর হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৫

حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا

এমনকি যখন সম্পদ ও শক্তির মোহে মুগ্ধ হয়ে তারা অহংকারী হয় তখন

اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً

তাদেরকে আমি পাকড়াও করি অতর্কিত ভাবে তখন তারা নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ

'দাবের' শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো প্রত্যেক জিনিসের শেষাংশ। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো জালেমদেরকে চিরতরে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তাদের বংশসহ ধ্বংস করা হয়েছে আর তা করা হয়েছে তাদের জুলুমের কারণে। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। তাদের অন্যায় আচরণই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আঃ) প্রায় এক হাজার বছর যাবত তাঁর সম্প্রদায়কে নসিহত করেছেন। কিন্তু তারা সেই নসিহত গ্রহণ করেনি। অবশেষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব এসেছে। আর তা ছিল প্রলয়ংকরী বন্যার আযাব। পাহাড়ের উঁচু চুড়ায় উঠেও কোন নাফরমান আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

আদ জাতির কথা কোরআনে করীমেই উল্লেখ রয়েছে। বাতাস এবং তুফান এত প্রচন্ড জেগে এসেছিল যে, তাদের কেউ বাঁচতে পারেনি, এ তুফান আট দিন স্থায়ী ছিল।

সামুদ সম্প্রদায় আল্লাহর নাফরমানী করেছিল। শুধু একটি ভয়াবহ আওয়াজের মাধ্যমে সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

আর হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের বস্তিটিকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হয়েছিল। বর্তমান জর্ডানে তা দেখতে পাওয়া যায়, যার নাম হলো "বাহরে মাইয়েত" আল্লাহর গজবের কারণে ঐ নদীতে কোন প্রাণী এমনকি মাছ বা ব্যাঙ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারেনা, তবে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে এসব ঘটনা শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কোন সম্প্রদায়কে হঠাৎ করে ধ্বংস করেন না; বরং তাদের নাফরমানী এবং পাপাচারের কারণে কিছু কিছু শাস্তি তাদেরকে দেয়া হয়, যাতে করে তাদেরকে সাবধান করা যায় এবং যারা সমাজের ভাগ্যবান লোক হয়ে থাকে, তারা সত্যিকারভাবেই সতর্কতা অবলম্বন করে। কিন্তু সাধারণতঃ অন্যায় আচরণ ও পাপাচার অব্যাহত থাকে, এমনকি যারা আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল থাকে তাদের দুনিয়ার জিন্দেগীর অবস্থা উন্নততর হতে থাকে। আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামতের দ্বার তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে

দেন, আর এভাবে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অতর্কিত ভাবে আযাব আসে এবং সে আযাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পৃথিবীতে তাদের কোন বংশধর থাকেনা।[১]

এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ এ উম্মতের শেষ যমানায় বাড়ী-ঘর এবং তাদের অধিবাসীরা মাটিতে ধসে যাবে, কুকুর বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে এবং তাদের প্রতি আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষিত হবে।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমরা কি এমন অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাব যখন আমাদের মধ্যে কিছু নেককার লোকও থাকবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন দুর্নীতির প্রসার হবে, তখন এমন অবস্থায়ও আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি আসতে পারে।

অন্য হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিতে থাক, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে থাক, যদি তা না কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। আর তখন যদি দোয়াও করা হয় তবে তা কবুল হবে না।

একখানি হাদীসে রয়েছেঃ যদি কোন মন্দ কাজ হতে থাকে অথচ তারা সেই মন্দ কাজ বন্ধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা করেনা তবে মৃত্যুর পূর্বে তারা আল্লাহ পাকের কোন আযাবে পতিত হয়।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন কোন এলাকাকে উল্টিয়ে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) বিনীত ভাবে আরজ করলেনঃ এলাহী! এ এলাকায় তোমার এমন একজন বন্দা রয়েছে যে কোন দিন তোমার নাফরমানী করেনি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ একথা সত্য যে সে আমার নাফরমানী করেনি, কিন্তু অন্যরা যখন আমার নাফরমানী করেছে তখন সে ব্যথিত ও রাগান্বিত হয়নি। কেননা এটি ঈমানের সামান্যতম এবং ক্ষুদ্রতম লক্ষণ।

আর একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাললাম এরশাদ করেছেনঃ যে সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদের মধ্যে হানাহানি খুন খারাবি হতে থাকে। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাভিচার প্রাধান্য লাভ করে তাদের মধ্যে মৃত্যু বিস্তার লাভ করে। আর যারা যাকাত প্রদান বন্ধ করে তাদের প্রতি বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়।

আর একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যাদের মধ্যে ঘুষখোরী বৃদ্ধি পায় তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়।

---

১ : তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৫৮৯-৯০

তারা প্রত্যেককে ভয় করে। হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ উম্মতের ধ্বংস আসবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক।)

পূর্ববর্তী আয়াতে জালেমদের ধ্বংস করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের হাম্‌দ বর্ণিত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, এ জালেমদেরকে ধ্বংস করে তাদের জুলুম থেকে মোমেনদেরকে নাজাত দেয়া একটি অতি প্রশংসনীয় কাজ, আল্লাহর বন্দাদের প্রতি এটি তাঁর এক বিরাট নেয়ামত। মানব জাতিকে আল্লাহ পাক দয়া করে জালেমদের জুলুম থেকে রক্ষা করেন। তাই তাঁর শোকর আদায় করা একান্ত কর্তব্য। আর এ আয়াতে সে দায়িত্ব পালনেরই শিক্ষা রয়েছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যারা মুশরেক, পৌত্তলিক, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করার জঘন্য অন্যায়ে লিপ্ত, তোমরা বল যদি আল্লাহ পাক তোমাদের শ্রবণ শক্তি, তোমাদের দর্শন শক্তি কেড়ে নেন তথা তোমরা অন্ধ হয়ে যাও এবং মূক হয়ে যাও আর তিনি তোমাদের অন্তর মোহর করে দেন তথা তোমাদের বিবেক বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন তবে কে তোমাদেরকে এসব নেয়ামত ফিরিয়ে দেবে? আল্লাহ পাক ব্যতীত এ নেয়ামত সমূহ আর কেউ দিতে পারবে না। অতএব, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করা উচিত নয়। বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই হতে হবে, আর কারো নয়। প্রকৃত এবং পূর্ণ আনুগত্য শুধু আল্লাহ পাকেরই করতে হবে আর কারো নয়। ঈমান বা বিশ্বাস একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রতিই রাখতে হবে। আশা শুধু তাঁর সমীপেই রাখতে হবে। এটিই বিবেকবান, পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত করণীয় কাজ।

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

(হে রসূল!) আপনি লক্ষ্য করুন, আমি কিভাবে তৌহীদের প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি। আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন ঃ

نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

এর অর্থ হলো কিভাবে আমি তৌহীদের দলিল প্রমাণ বারে বারে পেশ করছি, কোন সময় যুক্তি দিয়ে তৌহীদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার আহবান জানাচ্ছি, কোন সময় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে তৌহীদে বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করছি। আর কখনো পৌত্তলিকতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর কখনও

পূর্বকালের পৌত্তলিক জাতি সমূহের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ হতভাগা পৌত্তলিক সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নে বিমুখ হচ্ছে।[১]

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً

(হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা ভেবে দেখ যদি তোমাদের উপর হঠাৎ আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এমন অবস্থায় যে, তোমরা বে-খবর, অপ্রস্তুত অথবা প্রকাশ্যে তোমরা আযাবে নিপতিত হও তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে?

তখন জালেম ব্যতীত আর কেউ কি ধ্বংস হবে? অর্থাৎ যারা জালেম, যারা মানবতার দুশমন, যারা সীমা লজ্ঘনকারী, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমান, আল্লাহর আযাবে তারাই তো ধ্বংস হবে।

আলোচ্য আয়াতে بَغْتَةً অর্থ হলো হঠাৎ পূর্বাহ্নে কোন আলামত না দেখিয়ে যদি আযাব আসে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে?

اَوْ جَهْرَةً

অথবা যদি পূর্বে আযাবের ঘোষণা দিয়ে আযাব নাযিল করা হয় তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত হাসান (রঃ) বলেছেন,

بَغْتَةً-اَوْ جَهْرَةً

এ দু'টি শব্দের অর্থ হলো রাত্রে বা দিনে অর্থাৎ রাত্রে বা দিনে যদি তোমাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে আযাব আসে তাহলে তোমাদের কি অবস্থা হবে?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে 'জালেম' শব্দটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা কুফর ও নাফরমানীর কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৪১-৪২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪২

وَمَا
نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا
مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

তরজমা

(৪৮) আর আমি রসূলগণকে শুধু এজন্যে প্রেরণ করে থাকি যেন তাঁরা সুসংবাদ প্রদান করে এবং ভয় প্রদর্শন করে। অতএব, যারা ঈমান আনবে এবং আত্ম সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

(৪৯) আর যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে তাদের নাফরমানীর কারণেই স্পর্শ করবে তাদেরকে আযাব।

(৫০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্ পাকের ভান্ডার রয়েছে। আর আমি গায়বী কথাও জানিনা। আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমিতো শুধু আমার নিকট যে ওহী আসে তার অনুসরণ করি (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কি এক সমান? তোমরা কি এতটুকু ভেবে দেখনা?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফেরদের এ আস্ফালনের উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক নিদর্শন কেন আসেনা? এর পরবর্তী আয়াত সমূহে বিভিন্ন ভাবে তাদের এ অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক নবী রসূগণকে এজন্যে প্রেরণ করেন যেন তারা মানুষকে সৎ কাজের সওয়াব বা শুভ পরিণতির সুসংবাদ দান করেন এবং মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন। কোন নিদর্শন এবং মোজেযা

প্রদর্শন করার ক্ষমতা তাঁদের থাকেনা। এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। যখন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন শুধু তখনই আম্বিয়ায়ে কেরাম মোজেযা প্রদর্শন করেন।

যারা নবী রসূলগণের আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে আর তাঁদের হেদায়েত মোতাবেক নিজেদের সংশোধন করে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না, তারা নিঃস্কলংক এবং নিশ্চিত জীবন যাপন করবে, শুধু দুনিয়াতেই নয়; বরং আখেরাতেও তাদের কোন ভয় থাকবে না। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং নবী রসূলগণের আহবান সাড়া দেয়না, আত্ম সংশোধনে ব্রতী হয় না, সত্যকে গ্রহণ করেনা তাদের এ অপকীর্তি এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের নাফরমানীর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, তারা শাস্তি ভোগ করবে আর সে শাস্তি হবে অতীব মারাত্মক।[১]

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মক্কার পৌত্তলিকরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অহেতুক, ভিত্তিহীন মোজেযা প্রদর্শনের দাবী জানায় তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত সমূহ নাযিল করেছেন।[২]

তিনটি কথার ঘোষণা

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে তিনটি কথার ঘোষণা রয়েছে–

আল্লাহ পাক যদি কোন ব্যক্তিকে নবুওয়্যত দান করেন তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাঁকে আল্লাহ পাক সমস্ত ভান্ডার দিয়ে দিয়েছেন, যে কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা দান করবেন। মূলতঃ মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একথা বলতো যে, যদি আপনি আল্লাহ পাকের সত্য রসূল হন, তবে আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অগাধ অর্থ সম্পদ চেয়ে নিন এবং আমাদেরকে দান করুন। এর জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আল্লাহ পাকের ভান্ডার আমার নিকট রয়েছে। বরং আল্লাহ্ পাকের ভান্ডার তাঁর নিকটই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। তাঁর হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২২৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৩

এমনিভাবে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতো, যদি আপনি সত্য রসূল হন তবে ভবিষ্যতে কি হবে তা আপনার তো জানা থাকার কথা। অতএব, আপনি আমাদেরকে ভবিষ্যতের ভাল মন্দ সম্পর্কে অবহিত করুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এর জবাবে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

(হে রসূল!) আপনি বলুন যে, আমি গায়বী খবর জানি না। ভবিষ্যতে ভাল মন্দ কি হবে তা আল্লাহ পাকই জানেন, আর কেউ নয়। এমনিভাবে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ মন্তব্য করতো পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

অর্থাৎ "তারা বলতো এই রসূলের কি হলো তিনি আহার করেন এবং বাজারেও চলা ফেরা করেন"। তারা আরও বলতোঃ তিনি বিয়ে শাদী করেন, মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও করেন। এর জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি বলুন আমি ফেরেশতা নই, আমি মানব সমাজ বহির্ভূত অন্য কোন সৃষ্টি নই যে, তোমরা মানব স্বভাব বিরোধী কোন চরিত্রের অনুসন্ধান আমার নিকট করবে, বরং আমি মানুষ, মানবীয় গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে থাকবে, এটিই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এ জবাবের তাৎপর্য কি?

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং তিনি যে আল্লাহ পাকের বন্দা এবং রসূল একথা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে করে তাঁর সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা কেউ না করে যেমন ভ্রান্ত ধারণা খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে করেছে।

আর যেহেতু কাফেররা বিভিন্ন প্রকার মোজেযা প্রদর্শনের দাবী করতো যেমন পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا

"তারা বললো, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের জন্যে জমিনে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত না করবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবোনা"।

আমি আল্লাহর রসূল

আলোচ্য আয়াতে একথা এরশাদ হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি বলুন আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডার নেই আর আমি গায়বও জানিনা এবং আমি ফেরেশতাও নই।

আর এমন অবস্থায় তোমরা যা ইচ্ছা তা চাইলে আমি তা দিতে সক্ষম নই। আমি আল্লাহর নবী ও রসূল! আমার নিকট আল্লাহর ওহী আসে, আমি তার অনুসরণ করি, এটি আমার কর্তব্য। ওহীর বাইরে আমি কিছুই করতে পারিনা।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের তরফ থেকে কোন আদেশ দিতেন না। তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ আসতো আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে। যেমন পবিত্র কোরআনেও রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى۞ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের তরফ থেকে কোন কথা বলেন না, তাঁর নিকট যা ওহী আসে তিনি শুধু তাই বলেন।

এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর উপরই আমল করতেন। অতএব, মোমেন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা কেননা, আল্লাহ পাক একথাও এরশাদ করেছেন ঃ

فَاتَّبِعُوْهُ

অর্থাৎ তোমরা তাঁর অনুসরণ কর।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এ আদেশ দিয়েছেনঃ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহর ভান্ডার আমার হাতে নেই যে, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করবো।

দ্বিতীয়ত, আমি গায়ব জানিনা যে তোমাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু জানিয়ে দেব।

এর দ্বারা পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি খৃষ্টানদের পথভ্রষ্টতার কথাও ঘোষিত হয়েছে কেননা, তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে।[২]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে দুটি বিষয় ইতিবাচক রয়েছে, আর দুটি বিষয় নেতিবাচক রয়েছে।

ইতিবাচক বিষয় দু'টি হলো ঃ

১. রসূল আল্লাহর বন্দা। তাঁর নিকট যে ওহী আসে তার অনুসরণ করা তাঁর একান্ত কর্তব্য।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা ২৩০-৩৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯০

২. রসূল মানব সমাজ বহির্ভূত কোন সৃষ্টি নন, তাই মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে থাকে, যেমন পানাহার প্রভৃতি।

আর নেতিবাচক দু'টি বিষয় হলোঃ

১. আল্লাহ পাকই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, কোন বন্দা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয় এমনকি, কোন রসূলও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন।

২. আর সর্ব বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, কোন বন্দার নেই।[১]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলুন অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কি এক সমান? কেননা যে আল্লাহ পাকের প্রত্যাদেশ মোতাবেক আমল করেনা সে যেন অন্ধ। আর যে আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক আমল করে সে যেন চক্ষুষ্মান। আর এ দু'জন কোন অবস্থাতেই সমান নয়। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ

অর্থাৎ অন্ধ এবং চক্ষুষ্মানের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো তা উপলব্ধি করা, সে সম্পর্কে চিন্তা করা, নিজেকে এমন অন্ধদের মধ্যে শামিল না রাখা বরং সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে, আমি গায়ব জানিনা। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ওহীর মাধ্যমে যে সব গায়ব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হয়েছে সেগুলোকে পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় এলমে গায়ব বলা হয় না। যেমন স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ভবিষ্যতের অনেক কিছু জানিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত নবীগণকে যত এলম প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যত এলম আসবে সবই একা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক দান করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ আগের পরের সকলের এলম আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা সত্য যে, সমগ্র সৃষ্টি জগত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, আর কারো নয়। মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা, এলম, গুণাবলী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে খৃষ্টানরা সীমা লঙ্ঘন

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-২৭৮

করেছে উম্মতে মোহাম্মদীয়া তা করেনা, করতে পারে না। যারা আল্লাহর বন্দা এবং রসূলকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করে পবিত্র কোরআনের ভাষায় তারাই অন্ধ। আর যারা শেরক পরিহার করে তারাই চক্ষুষ্মান। কোন বিবেকবান মানুষ কোন কিছুকেই আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করতে পারেনা। পয়গম্বরগণ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কথা এবং কাজে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণ করেন, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আল্লাহ পাকের মর্জির খেলাফ কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়।[১]

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৫১) আর (হে রসূল!) এ কোরআন দ্বারা এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন যারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে একত্রিত হতে ভয় পোষণ করে (তাদের সতর্ক করে দিন যে) আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই, আর তাদের কোন সুপারিশকারীও হবে না, হয়তো তারা সাবধান হবে।

(৫২) (হে রসূল!) যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আপনি তাদেরকে মজলিস থেকে তাড়িয়ে দেবেন না। আপনাকে তাদের (কাফেরদের) কিছু মাত্র হিসাব দিতে হবে না। আর তাদের উপরও আপনার হিসাবের দায় দায়িত্ব নেই যে, আপনি তাদেরকে (মোমেনদেরকে) বিতাড়িত করবেন, যদি তা করেন তবে সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাতে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে নবী রসূলগণের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা হলেন সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আপনি ভয়

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৯৭

প্রদর্শন করুন সে সব লোকদেরকে, যাদের অন্তরে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবার ভয় আছে।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদিও আম্বিয়ায়ে কেরাম সকলকেই নসিহত করেন, সকলের জন্যে রয়েছে তাঁদের উপদেশ, কিন্তু সকলে তাঁদের উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, ভবিষ্যত চিন্তা থাকে, যারা বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী হয়, যাদের বিবেক জীবন্ত থাকে শুধু তারাই আম্বিয়ায়ে কেরামের নসিহত দ্বারা উপকৃত হতে পারে।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ এ আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা নেককার, ভাগ্যবান এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে তারা অবশেষে সফলকাম হয় এবং আল্লাহ পাক তাদের সাহায্যকারী হন।

দ্বিতীয়ত, একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শ্রবণ করা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবগত হওয়া মোমেন মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য।[৩]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন যাদের অন্তরে হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার ব্যাপারে ভয় আছে। এজন্যে ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে সব মোমেন যাদের অন্তরে কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস আছে কিন্তু আমলে কিছু ত্রুটি আছে। অথবা এর উদ্দেশ্য সে সব লোক যারা হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার কথা স্বীকার করে, তা মোমেন হোক বা কাফের অথবা আহলে কিতাব, কিংবা যারা হাশর হবে কি হবে না- এ বিষয়ে দোদুল্যমান রয়েছে। তবে যারা কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করেনা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা উপকারী হয় না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ

অবশ্য আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ইমাম বয়যাবীর এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অত্যন্ত ব্যাপক, এতে সকলকেই ভয় প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। বিশেষতঃ গুনাহগার মোমেনদের ভয় প্রদর্শনের কোন কথা এতে নেই। যেমন পবিত্র কোরআনেরই অন্য আয়াতে একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৩২
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯১
৩। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯৬

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

অর্থাৎ এ কোরআন আমার নিকট ওহী রূপে প্রেরিত হয়েছে যেন আমি তা দ্বারা তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। আর সে সব লোকদেরকেও ভয় প্রদর্শন করি যাদের নিকট পবিত্র কোরআন পৌঁছে।

এ আয়াতে মোমেনদের কোন বিশেষ দলকে ভয় প্রদর্শনের প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই, বরং যারা নেক আমলের জন্যে কঠোর সাধনায় ব্রতী হন তাদের জন্যেও ভয় প্রদর্শন উপকারী হতে পারে, যেন তারা ভয় প্রদর্শনের পর ইজতেহাদ এবং সত্য সাধনায় গাফলত না করেন।

লক্ষ্যনীয়, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও বরকতময় যুগে সমস্ত পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম সত্য-সাধনায় মশগুল ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনার চরম ও পরম পর্যায়ে তাঁরা পৌঁছেছিলেন। গাফলত বা অবহেলা বলতে তাঁদের জীবনে এতটুকুও ছিলনা। অতএব, اَلَّذِيْنَ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমস্ত লোক অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ নির্দেশ হয়েছে যে, আপনি সমস্ত লোককে ভয় প্রদর্শন করুন। কেননা, বন্দা মাত্রেরই কর্তব্য হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় করা।

অথবা এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে উপস্থিতিকে যারা ভয় করে তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, তারাই ভয় প্রদর্শনের দ্বারা উপকৃত হয়।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়ার ব্যাপারকে ভয় করে না তাদের জন্যে ভয় প্রদর্শন উপকারী হয় না। পবিত্র কোরআনেরও রয়েছেঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى

(সূরা নাজেআতঃ ৪০-৪১)

"আর যারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করতো এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখতো, জান্নাতই হবে তাদের আবাস"।

অতএব, হাশরের ময়দানে উপস্থিতিকে যারা ভয় করে, ভয় প্রদর্শন দ্বারা তারাই উপকৃত হয়। তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে। যেমন সূরা বাকারার শুরুতে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ এ কিতাব পরহেযগারদের জন্যে পথ প্রদর্শক। পরহেযগারদের উল্লেখ এজন্যে বিশেষ ভাবে করা হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত দ্বারা তারাই

সত্যিকারভাবে উপকৃত হয়, যদিও পবিত্র কোরআনে হেদায়েত রয়েছে সকলের জন্যে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ আয়াত দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এর জবাবে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেনঃ এ সম্পর্কে একাধিক অভিমত রয়েছে।

এতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেই কাফেরদেরকে যাদের আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে স্থান পেয়েছে। কেননা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আখেরাতের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন। আর তাদের কেউ কেউ ভীত হতো, তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হতো। কোন কোন সময় তারা উপলব্ধি করতো যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেন তা সত্য। যারা এ মত পোষণ করেন যে, এ আয়াতের বক্তব্য মোমেনদের উদ্দেশ্যে নয়; বরং কাফেরদের উদ্দেশ্যে কেননা, মোমেনদের নিশ্চয় বিশ্বাস রয়েছে যে, তারা অবশ্যই আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে।

এদের মধ্যে কারো কারো মত এই যে, মোমেনগণের এ আয়াতের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে কোন বাধা নেই। কেননা, মোমেনগণ যদিও একথা বিশ্বাস করেন যে, হাশরের ময়দানে হাযির হতে হবে, কিন্তু যে আযাব সম্পর্কে এ আয়াতে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করেনা। কেননা তারা বিশ্বাস করে ঈমান এবং নেক আমল করা অবস্থায়ই হবে তাদের মৃত্যু।

এ আয়াত সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত হলো, এ আয়াত দ্বারা মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, মোমেনগণই বিশ্বাস করে আখেরাতের উপর। হাশর, নশর, পুনরুত্থান এবং কেয়ামতের উপর।

অতএব, মোমেনগণই কেয়ামতের দিনের আযাবকে ভয় করে।

এ সম্পর্মে তৃতীয় অভিমত হলো এ আয়াত সকলের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে। কেননা, বুদ্ধিমান মাত্রই হাশরের দিনের ভয়াবহ অবস্থাকে ভয় করে। এ ভয় সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সকলের নিকট এবং সকলকে তবলীগ করার জন্যে তিনি আদিষ্ট হয়েছেন; আর এ আয়াতে বিশেষভাবে যারা হাশরের দিনকে ভয় করে তাদের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, তারাই এ ভয় প্রদর্শন দ্বারা উপকৃত হয়। আর আখেরাতকে ভয় করার শুভ পরিণতি হলো আখেরাত তথা কেয়ামতের দিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ হয়।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৪
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা ২৩২-৩৩

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيعٌ

তাদের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী হবেনা, কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে সে অবস্থাকে তারা ভয় করে যখন আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আর কোন সুপারিশকারীও পাওয়া যাবেনা।

আয়াতের মর্মবাণী

অতএব, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো এবাদত করবে না। আর আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য প্রার্থীও হবে না, এটিই আয়াতের মর্মবাণী।

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ যাদের অন্তরে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার ব্যাপারে ভয় রয়েছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলে হয়তো তারা সাবধান হবে।

ইমাম আহমদ (রঃ), তেবরানী এবং আবু হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একবার মক্কার কোরায়শের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনি কি এদেরকে আপনার দরবারে থাকার জন্যে নির্বাচন করেছেন? তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন হযরত খোবাব (রাঃ), হযরত সোহায়েব (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত আম্মার (রাঃ)। কোরায়শ নেতারা বললোঃ যদি আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে বের করে দেন তবে আমরা আপনার নিকট হাযির হতে পারি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেকদের সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এ আয়াত মক্কার কোরায়শদের কিছু দাম্ভিক সরদারের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কয়েকজন মুশরেক প্রধান প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, আমাদেরও ইচ্ছা হয় যে আপনার খেদমতে হাযির হই, আপনার কথা-বার্তা শ্রবণ করি। কিন্তু আপনার চারিপার্শ্বে যারা বসে থাকে তারাই আমাদের উপস্থিতির পথে বাধা হয়ে আছে। সমাজ জীবনে যাদের কোন মর্যাদা নেই আমরা তাদের সাথে কিভাবে ওঠা-বসা করি? এভাবে তো আমাদের সম্মান থাকেনা। যদি আপনি তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেন তাহলে আমরা আপনার নিকট আসা-যাওয়া করতে পারি। শত হলেও আমরা সমাজের উঁচু দরের লোক, আমরা যে কারো সাথে বসতে পারি না।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি তাদেরকে সরিয়ে দিতে পারবো না। তারা বললোঃ আপনি অন্তত এ ব্যবস্থা করুন যখন আমরা আসি তখন তারা সরে যাবে আর যখন আমরা চলে যাই তখন তারা আবার আপনার নিকট আসবে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন যে, যদি এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে মক্কার কোরায়শ সরদারদের হেদায়েত নসীব হয় তবে মন্দ কি!

এদিকে হযরত ওমর (রাঃ) এ পরামর্শ দিলেন যে পরীক্ষা মূলক কোরায়শ সরদারদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি এ পন্থায় তারা সঠিক পথে আসে, দেখা যেতে পারে যে, তারা কি করে। এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। শুধু চিন্তা-ভাবনার পর্যায়েই রয়েছে। এমন সময় এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ পন্থা অবলম্বনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, (হে রসূল!) এ অহংকারী পৌত্তলিকদের ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় আপনি নেককার মোমেনদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করবেন না, এরা সে সব লোক যারা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সকাল বিকাল তথা দিন রাত আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকে। দুনিয়ার কোন লাভ-লোভের উদ্দেশ্যে তারা তা করেনা; বরং এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ ব্যতীত তাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। অতএব, আপনার মজলিস থেকে তাদেরকে কোন অবস্থাতেই সরিয়ে দেবেন না। তারা হতে পারে অভাব গ্রস্ত, দারিদ্র-পীড়িত কিন্তু তাঁরা সত্য-সাধক, তাঁরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণকারী অতএব, তাদের প্রতি বিনম্র ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি উদার হওয়া একান্ত জরুরী।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এবনে হাব্বান এবং হাকেম হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াত ছয়জন সাহাবীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাঁরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত সোহায়েব (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত মেকদাদ (রাঃ), হযরত সালেম মাওলা আবি হোজায়ফা (রাঃ)।

মক্কার কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরযী পেশ করলো, আপনি এদেরকে মজলিস থেকে বের করে দিলে আমরা আপনার অনুসারী হবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য করে বিষয়টি চিন্তা করছিলেন। এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয় ঃ

---

১ · তফসীরে কুরতুবী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩১
তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৩৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬৮

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ

আর যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের প্রতিপালককে ডাকে তথা তাঁর বন্দেগী করে, আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকে তাঁদেরকে আপনি মজলিস থেকে সরিয়ে দেবেন না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, "আল্লাহকে ডাকে"– একথার তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে ডাকে"-এর তাৎপর্য হলো ফজর এবং আছরের নামায আদায় করে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ "সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে"- এর অর্থ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। আর একথাও বর্ণিত আছে, কিছু দারিদ্র-পীড়িত মুসলমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সর্বদা থাকতেন। সম্পদশালী এবং তথাকথিত নেতৃস্থানীয় কতিপয় লোক এ আরযী পেশ করেঃ হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি এদেরকে পেছনের কাতারে সরিয়ে দেন তবে আমরা আপনার পেছনে নামায পড়তে পারি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

হযরত খোবাব এবনে আরত্ এবং হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা যখন ইচ্ছা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হতাম। যখন কোন প্রয়োজন হতো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরিফ নিয়ে যেতেন। আল্লাহ পাক আল্লাহর প্রেমিকদের এতটুকু মনের কষ্ট সহ্য করেননি। তাই আদেশ দিয়েছেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

(সূরা কাহফ)

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি নিজেকে সে লোকদের সঙ্গে রাখুন যারা আল্লাহ পাককে ডাকে।

সেদিন থেকে যতক্ষণ আমরা দরবারে হাযির থাকতাম, তিনি উঠতেন না। তিনি আমাদেরকে কাছে টেনে বসাতেন, এমনকি আমাদের হাঁটু তাঁর হাঁটু মোবারকের সঙ্গে মিশতো, এরা ছিলেন আল্লাহ ওয়ালা, যাঁদের প্রতি বিশেষ উদার ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক।[২]

ইসলামে ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

ইসলাম মানবতার উৎকর্ষ সাধনের, মানবতার মানোন্নয়নের, বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের আহবান জানায়। কিন্তু যারা মানবতার অবমাননা করে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৫
২। খোলাসাতুত তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৫৯৭

তারা শুধু মানুষকে একটি সুচতুর জন্তু রূপেই দেখে। জন্তু যেমন পানাহার করে, নিদ্রিত হয় ঠিক তেমনি মানুষও পানাহার করে এবং নিদ্রিত হয়। আর দুনিয়ার দ্রব্য-সম্ভার সঞ্চয় করাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়। এ কারণেই অর্থ সম্পদ যাদের কাছে থাকে তাদেরকে সম্মানিত মনে করা হয়। পক্ষান্তরে, যাদের কাছে অর্থ সম্পদ, সম্মান মর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম থাকে তাদেরকে অপমানিত মনে করা হয়। অথচ ইসলাম শরীফ ও রজিল মর্যাদা ও সম্মানের এ মানদন্ডকে স্বীকার করে না। ইসলাম বলে পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ط

(তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক পরহেযগার সে আল্লাহ্ পাকের নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।)ইসলাম একথাও বলে, এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আসবে যা চিরস্থায়ী জিন্দেগী হবে। সে জিন্দেগীর আরাম বা দুঃখ দু'ই চিরস্থায়ী হবে।

অতএব, যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর ব্যাপারে গাফেল তারা অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে। আর এ অর্থ-সম্পদই তাদের সম্মান মর্যাদার মানদন্ড হয়ে থাকে। আরবের পৌত্তলিক সরদাররা এ মানদন্ডেই বিচার করেছিল দারিদ্র-পীড়িত সাহাবায়ে কেরামকে। তাই তাদের কয়েকজন নেতা যথা ওতবা, শায়বা, এবনে রবিয়া, মোতএম এবনে আদি এবং হারেস এবনে নওফল গং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেবের নিকট আসে এবং বলেঃ আপনার ভ্রাতঃষ্পুত্র (হযরত) মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট আমাদেরও যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাঁর কথা শ্রবণের সাধ আমাদের অন্তরেও আছ। কিন্তু এ সাধে বাঁধ সেঁধেছে এমন কিছু লোক যারা সমাজের নিম্ন স্তরে বাস করে। আপনি তাঁকে বলুন, আমরা যখন তাঁর মজলিসে আসবো তিনি যেন তাদেরকে তখন সরিয়ে দেন। আবু তালেব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের কথা পৌঁছে দিলেন। ঐ সময় হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ এমন একটা পন্থা অবলম্বন করে দেখা যেতে পারে যে, তারা ঈমান আনে কি-না। কিন্তু যখন এ পন্থা অবলম্বনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আয়াত নাযিল হলো তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ আমার মত ভুল ছিল।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখানে পার্থক্য হয় ঈমান, আমলে সালেহ্ তথা পরহেযগারীর মাধ্যমে।[১]

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬০২

আর এতে একথাও প্রমাণিত হলো যারা সত্য-সাধক, যারা সর্বদা আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে মশগুল থাকে, যাঁরা ওলী আল্লাহ, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদের সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। আর এমন দুনিয়া-ত্যাগী সাধক মানুষদের কোন প্রকার কষ্ট দেয়া থেকে আত্মরক্ষা করাও একান্ত জরুরী।

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রঃ) এজন্যেই বলেছেন ঃ

حب درویشان کلید جنت است

دشمن ایشان سزاے لعنت است

অর্থাৎ দরবেশদের প্রতি ভালবাসা হলো জান্নাতের চাবি। আর তাদের প্রতি শত্রুতার শাস্তি হলো লা'নত।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্ পাকের জিকর করে, তাঁদেরকে আপনি আপনার মজলিশ থেকে সরিয়ে দেবেন না।

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

তাদের একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র জিকর করতে থাকে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তারা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় এছাড়া আর কিছুই তাদের কাম্য নয়, তাঁরা আল্লাহ পাকের নিকট শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিরই প্রার্থী হন।

এবাদত কবুল হওয়ার জন্যে এখলাস পূর্বশর্ত

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এখলাস ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে কোন এবাদত কবুল হয় না অর্থাৎ সকল এবাদতের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবাদত করা হয় যথা দুনিয়াতে সুনাম অর্জন করা, জনপ্রিয়তা লাভ করা অথবা দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্ধার করা, নিজের প্রাধান্য বিস্তার করা, মানুষের মধ্যে নেককার হিসেবে পরিচিত হওয়া তবে আল্লাহ পাকের দরবারে এমন এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা, এবাদত কবুল হওয়ার জন্যে এখলাস পূর্বশর্ত। আর আল্লাহ ওয়ালাগণের বৈশিষ্ট্য হলো তারা আল্লাহ পাকের দরবারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর জন্যে প্রার্থী হন না। আল্লাহ পাকের দরবারে অন্য কিছু চাওয়া তাঁদের বৈশিষ্ট্য বিরোধী কাজ। যেমন হযরত গওসুল আযম (রঃ) বলেছেনঃ

چنه خواہم خوبی دنیا نه خواہم راحت عقبی

اگر خواہم ترا خواہم نه خواہم باغ رضواں را

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নিকট দুনিয়ার কোন সৌন্দর্য চাই না। আর আখেরাতের কোন আরামও চাই না, যদি কিছু চাই তবে তোমার নিকট শুধু তোমাকেই চাই।

অন্য একজন সাধক বলেছেনঃ

خلاف طريقت بود كه اوليا = شمنا كنند از خدا جزخدا

"আল্লাহ পাকের নিকট তাঁকে ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া আওলিয়ায়ে কেরামের তরীকতের খেলাফ কাজ"।

কেননা আওলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ মত্ত মাতোয়ারা থাকেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু তাঁদের কাম্য হয় না, এটি তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য।

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

যে সব মুশরেকরা দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে বের করার শর্ত পেশ করেছিল, এ শর্ত পূর্ণ করা হলে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাযির হবে, এমন অবস্থায় তাদের ঈমান আনয়নের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ (হে রসূল!) কাফেরদের ঈমান আনয়নের আকাঙ্ক্ষায় দারিদ্র-পীড়িত মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে বের করার প্রশ্ন উঠেছে, তারা ঈমান আনয়ন করুক বা না করুক, আপনি দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে বের করবেন না। কেননা কেয়ামতের দিন এ কাফেরদের হিসাব আপনার দায়িত্বে থাকবে না। যেমন আপনার হিসাব নিকাশও তাদের দায়িত্বে থাকবে না। যখন মুশরেকদের আমলের ব্যপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না তখন তাদের ঈমান আনয়নের আকাঙ্ক্ষায় মোমেনদেরকে মজলিস থেকে বের করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। যদি কাফের মুশরেকদের হিসাবের ভার আপনার উপর ন্যস্ত হতো তাহলে মোমেনদেরকে কাফেরদের ঈমান আনয়নের প্রয়োজনে মজলিস থেকে বের করতে পারতেন, যখন এমন অবস্থা নয় তখন তাদেরকে বের করবেন না।

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

এখন যদি আপনি তাদেরকে বের করেন তবে যারা বে-ইনসাফ বা অবিচারক আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে নেককার পরহেযগার মোমেনদের প্রতি অবিচার করা হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও এ আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় এতে সতর্কবাণী রয়েছে সেই জালেমদের জন্যে যারা দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহর প্রেমিক মোমেনদেরকে

মজলিস থেকে দূরে সরাবার প্রস্তাব করেছিল। অবশেষে কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদেরকে নিজ নিজ জীবনের হিসাব-নিকাশ অবশ্যই দিতে হবে।[১]

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا أَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَآءَكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ ۙ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَ
أَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْـَٔايٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ
سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

তরজমা

(৫৩) আর এভাবেই আমি এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রেখেছি যেন তারা বলে, এরাই কি সে সব লোক? আমাদের মাঝে যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক দয়া করেছেন। আল্লাহ্ পাক কি কৃতজ্ঞ লোকদেরকে ভাল ভাবে জানেন না?

(৫৪) (হে রসূল!) যারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান আনে তারা যখন আপনার নিকট আসে তখন তাদেরকে বলুনঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ করে ফেলে, এরপর তওবা করে এবং আত্মসংশোধন করে তবে (আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করবেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। (৫৫) আর এরূপেই আমি আয়াত সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি (যেন সকলে বুঝতে পারে) এবং পাপীষ্ঠদের পথ পরিস্কার হয়ে যায়।

তফসীরুল কোরআন

আর এভাবে আমি এক দলকে আরেক দল দ্বারা পরীক্ষা করি যেমন দারিদ্র-পীড়িত লোকদের দ্বারা বিত্তবানদের পরীক্ষা, আর বিত্তবানদের দ্বারা গরীবদের পরীক্ষা। যারা বিত্তবান তারা গরীব দুঃখী মানুষকে ধন-সম্পদের ভিত্তিতেই

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী র০) ।৩ ২ পৃষ্ঠা-২৬৯

যোগ্যতার বিচার করে। আল্লাহ্ পাক এর জবাবে এরশাদ করেছেনঃ বিত্তবান হওয়া অথবা দরিদ্র হওয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট পছন্দনীয় হওয়ার দলিল নয়; বরং এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে একটি পরীক্ষা মাত্র। সম্পদশালীদের কর্তব্য হলো দরিদ্র লোকদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখা, আর দারিদ্র-পীড়িত মানুষের কর্তব্য হলো ধন-সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রতি হিংসা না করা।

ইমাম বয়যাবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যেভাবে আমি দুনিয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন দলের মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে রেখেছি কেউ ধনবান হয়েছে আর কেউ হয়েছে কাঙ্গাল ঠিক এভাবে দ্বীনি ব্যাপারেও লোকদেরকে পরীক্ষায় রেখেছি। তারা পরস্পরের পরীক্ষার কারণ হয়েছে। যেমন সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদেরকে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ দিয়েছি এবং বিত্তবানদের উপর তাদেরকে ফজিলত দিয়েছি। বিত্তবানরা তাদেরকে হীন এবং নীচ মনে করার কারণে ঈমানের সম্পদ থেকে মাহরুম হয়েছে। তাই তারা বলেছে এরাই কি সে সব লোক? আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক কৃপা বর্ষণ করলেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর দানে ধন্য করার জন্যে এদের ব্যতীত আর কোন লোককে পেলেন না?

আলোচ্য আয়াতে অনুগ্রহ বা কৃপা বলতে হেদায়েত এবং ঈমান লাভের তৌফিককে বোঝানো হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিছেছেনঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো দূরাত্মা কাফেররা বলেছে যদি ইসলাম সত্য হতো তবে এ ফকির মিসকীনদের পূর্বে আমরাই তা গ্রহণ করতাম। আমাদের পূর্বে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারতো না। কিন্তু গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন দূরাত্মা কাফেররা জানে না যে, আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টি মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি নয়, বরং তাদের অন্তরের প্রতি। যারা গরীব, নিঃস্ব, হৃত সর্বস্ব তাদের অন্তর আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ, তাঁর প্রতি ঈমানই তাদের অমূল্য সম্পদ। তাই তারা আল্লাহ্ পাকের দানে ধন্য। আর কে আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর গুজার, আর কে অকৃতজ্ঞ তা আল্লাহ্ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ

যাদের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে আর এ ভিত্তিতে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ঈমানদার হওয়ার তৌফিক দান করেন, আর যাদের মধ্যে ঈমান আনয়নের এবং শোকর গুজার হওয়ার যোগ্যতা নেই যে কারণে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ঈমানের তৌফিক দান করেন না, উভয় দল সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কি অবহিত নন?

অবশ্যই তিনি অবহিত। এজন্যেই তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত নসীব করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় ফেলে রাখেন।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াত একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, ভাল এবং মন্দের যোগ্যতা মানুষের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই প্রদান করা হয়। এজন্যে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ পাকের একটি নাম হলো "হাদী"। যারা এ মোবারক নামের আলো পেয়েছে তারা হেদায়েত লাভ করেছে। আর তাঁর আরেকটি নাম হলো "মোদেল"। এ নামের ছায়া যাদের প্রতি পড়েছে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

বস্তুতঃ যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যের সীমা রেখার মধ্যে তাকে থাকতেই হবে।[১]

এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রমাণিত হয়েছে–

১. কারো পুরনো ছেঁড়া পোষাক পরিচ্ছদ দেখে তথা প্রকাশ্যে দুর্বল ও হীন অবস্থা দেখে তাকে হেয় মনে করার কোন অধিকার কারোই নেই। কেননা, কোন কোন সময় এমন পোষাক পরিচ্ছদে এমন লোকও থাকেন যারা আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত সম্মানিত এবং পছন্দনীয়। হাদীস শরীফে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ অনেক জীর্ণ শীর্ণ অবস্থার লোক এমনও আছেন যারা আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং মকবুল। যদি তারা কোন কাজের ব্যাপারে শপথ করেন তবে আল্লাহ পাক তাদের শপথ পূর্ণ করে দেন।

২. শরাফত, ভদ্রতা, সম্মান এবং অভদ্রতা ও অপমানের মানদন্ড শুধু অর্থ-সম্পদ নয়। অর্থ-সম্পদকে সম্মান মর্যাদার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে তা হবে মানবতার অবমাননা। সম্মান ও মর্যাদার প্রকৃত মানদন্ড হলো চরিত্র মাধুর্য এবং সৎ কর্ম।

৩. কোন সংস্কারক এবং সত্যের আহবায়ক বা মোবাল্লেগের কর্তব্য হলো সকলের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। এ পর্যায়ে পক্ষ এবং বিপক্ষের সব লোকই অন্তর্ভুক্ত হবে। সকলের নিকটই আল্লাহর বাণী পৌঁছাতে হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা সত্য যে, যারা দ্বীনি দাওয়াত গ্রহণ করবেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণের যে আহবান জানান হয় সে আহবানে যারা সাড়া দেবেন, তাদের হক্ব বা অধিকার অধিকতর হবে। অন্যদের খাতিরে তাদেরকে কম গুরুত্ব দেয়া অনুচিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অমুসলিমদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে মুসলমানদের প্রশিক্ষণ এবং সংশোধনের কাজকে মুলতবী করে রাখা যাবে না।

১ তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৪৭-৪৮

৪. আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহ বৃদ্ধি পায় তাঁর শোকর গুজারীর মাধ্যমে। যারা চায় যে, আল্লাহর নেয়ামত তাদের প্রতি আরো বৃদ্ধি হোক তাদের একান্ত কর্তৃব্য হলো কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।[১] কেননা, কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ

(যদি তোমরা শোকর গুজার হও, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দেব।)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেনঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ

আল্লাহ পাক কি তাঁর শোকর গুজার বন্দাদের সম্পর্কে অবহিত নন? অর্থাৎ অবশ্যই তিনি অবহিত। তিনি খুব ভাল ভাবেই জানেন কে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, আর কে অকৃতজ্ঞ। কার অন্তরে আল্লাহ্ পাকের প্রতি শোকর গুজারীর ভাব রয়েছে। আর কে নাফরমান, এ সবই তিনি সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে জানেন। যাঁরা আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার বন্দা, হতে পারে তাদের নিকট সম্পদ বা ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য নেই কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ঈমানের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। আর যারা অহংকারী, কাফের তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন, তারা তাদের অহংকার, অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞতার করণেই ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[২]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি মোহাজেরদের একটি দলের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। সকলের নিকট প্রয়োজন মোতাবেক পোষাক ছিল না। তাই একে অন্যকে আড়াল করে বসেছিলেন। একজন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তাঁকে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখে তেলাওয়াতকারী ব্যক্তি নীরব হয়ে গেলেন।

তিনি সালাম দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি করছিলে? আমি আরজ করলামঃ একজন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন এবং আমরা শ্রবণ করছিলাম। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ্ পাকের শোকর যে, তিনি আমার উম্মতে এমন লোক তৈরী করে দিয়েছেন যাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হওয়ার হুকুম আমাকে

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬০৪-০৫
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭০

দান করেছেন। এরপর তিনি সকলের সঙ্গে বসে গেলেন এবং তিনি ইশারা করলে সকলে তাঁর চারপার্শ্বে বসলো। তিনি সকলের মাঝে রইলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ হে নিঃস্ব মোহাজেরগণ! আমি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পূর্ণ নূর লাভের সুসংবাদ দিচ্ছি।

বিত্তবানদের অর্ধেক দিন পূর্বে দরিদ্র লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আখেরাতের অর্ধেক দিন দুনিয়ার পাঁচশত বছরের সমান হবে।[১]

وَاِذَا جَاۤءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

শানে নুযুল

পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) ইতিপূর্বে কাফেরদের প্রস্তাব সম্পর্কে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পূর্ববর্তী পরামর্শ ভুল ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আর হযরত একরামা (রঃ)-এর মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে সে সব লোকদের সম্পর্কে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিস থেকে দারিদ্র-পীড়িত মুসলমানদেরকে বের না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মোহাজেরীনদেরকে দেখতেন তখন নিজেই সালাম দিতেন। কেননা আলোচ্য আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত সালেম (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ), হযরত মাস'আব এবনে ওমায়ের (রাঃ), হযরত হামজা (রাঃ), হযরত জাফর (রাঃ), হযরত আরকাম এবনে আরকাম (রাঃ) এবং হযরত আবু সালমা এবনে আবদুল আসাদ (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে।

আয়াতের মর্মবাণী

যেহেতু হযরত ওমর (রাঃ) পূর্বের পরামর্শের জন্যে নিজেকে গুনাহগার মনে করছিলেন তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যখন আপনার নিকট আমার আয়াত সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী লোক আসে আপনি তাদেরকে বলবেন, তোমাদের প্রতি সালাম। তাদের পূর্ব কৃত ভুল ভ্রান্তির ব্যাপারে শুধু যে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না তাই নয়; বরং পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের অঙ্গীকার তাদেরকে শুনিয়ে দিন। আর আল্লাহ পাকের এ বিধান সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করুন যে, যদি

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৪৯

অজ্ঞাতসারে তাদের দ্বারা কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, আর তারা সেই মন্দ কাজ থেকে তওবা করে, ভবিষ্যতের জন্যে আত্ম সংশোধন করে তবে আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়ঃ

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর নবীর কাজ হলো সৎ কাজের জন্যে মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করা এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা। তাই এ আয়াতে নিরীহ নির্ধন মুসলমানগণকে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। শুধু তাই নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন পূণ্যবান মোমেনগণ আপনার নিকট আসে তখন আপনি তাদেরকে বলুন- "সালামুন আলাইকুম"। এ বাক্যটি দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. তাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সালাম পৌঁছে দিন, এতদ্বারা নিঃস্ব নির্ধন মোমেনদের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। অহংকারী কাফেরদের রুক্ষ ব্যবহারে তাদের অবজ্ঞা অবহেলায় নিরীহ মোমেনদের মন আহত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ ঘোষণার কারণে স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়েছেন।

২. এর অন্য অর্থ হলো (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী শুনিয়ে দিন এবং সর্ব প্রকার বালা মসিবত থেকে আল্লাহ পাক তাদেরকে নিরাপদ রাখবেন, তাদেরকে এ সুসংবাদও জানিয়ে দিন।

এ আয়াতে উল্লেখি يتنا। শব্দটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, সমগ্র সৃষ্টি জগৎই আল্লাহ পাকের একত্ববাদের জীবন্ত নিদর্শন। তাই আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের কোন সীমা বা শেষ নেই। যে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার প্রয়াসী হয় সে যে কোন নিদর্শন দেখেই তাঁর মা'রেফাত হাসিল করতে পারে। আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের শুমার করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। কেননা, মানুষের সকল শক্তিই সীমিত। আর আল্লাহ পাকের একত্ববাদের জীবন্ত নিদর্শন সমূহ অনন্ত অসীম। মানুষ যদি আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার পথে সাধনা করে তথা আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হয় তবে তার সাধনা অব্যাহত থাকবে। সে এ পর্যায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকবে কিন্তু এর শেষ মঞ্জিলে পৌঁছা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না।

তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যার মধ্যে আপনি এ গুণ লক্ষ্য করবেন যে, সে আল্লাহর পথের সাধক, সে আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন সমূহে বিশ্বাসী, সে আল্লাহর মা'রেফাত হাসিল করতে প্রয়াসী তবে তাকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পূর্ণ

নিরাপত্তার খোশখবরী দান করুন এবং এ সুসংবাদ দান করুন যে, এমন লোকের দ্বারা যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয়েও যায় তবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন।[১]

এরশাদ হয়েছে ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ

অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা নিজের দায়িত্ব হিসেবে স্থির করেছেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এবং মসনদে আহমদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পয়দা করার পর প্রত্যেকের তকদির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং একটি গ্রন্থে যা আল্লাহর আরশে সংরক্ষিত হয়েছে লিখে দিয়েছেন ঃ

اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ

অর্থাৎ আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত যে, কোন মানুষ এমনকি ফেরেশতাও আল্লাহ্ পাকের শান মোতাবেক এবাদত করতে সক্ষম নয়। বস্তুতঃ আমাদের এবাদতের মধ্যেতো দোষ-ক্রটিই থাকে অনেক। ফলে দরবারে এলাহীতে পেশ করার যোগ্যও হয় না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ আমাদের প্রতি নাযিল হচ্ছে। এটি সেই রহমতই যা তিনি আমাদের প্রতি নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞাতসারে কোন মন্দ কাজ করে আর পরে তওবা করে এবং আত্মসংশোধন করে তবে আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করবেন, শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করবেন। কেননা তিনি গফুর তথা অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আর তিনি রহীম তথা অত্যন্ত দয়াবান।

গুনাহ মাফ হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত

আলোচ্য আয়াতে গুনাহ মাফ হওয়ার জন্যে দু'টি শর্ত পেশ করা হয়েছেঃ

১. তওবা অর্থাৎ কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে।

হাদীস শরীফে তওবার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে ঃ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯২

انما التوبة الندم

তওবা হলো লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। অর্থাৎ কৃত অন্যায়ের জন্যে আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হওয়া।

২. আত্মসংশোধন করা অর্থাৎ– ভবিষ্যতে এমন অন্যায় না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা এবং অন্যায় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং যদি মানুষের কোন হক্ব বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে তা আদায় করা। আর যদি নামায, রোজা হজ্জ্ব, যাকাত তথা কোন ফরজ আদায়ের ব্যাপারে গাফলত হয়ে থাকে তবে তার কাজা আদায় করা।

মূলতঃ প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ তওবার জন্যে যা জরুরী তা হলো অতীতের গুনাহর জন্যে লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আর ভবিষ্যতের জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করা।

এর পাশাপাশি একথাও জরুরী যে, নামায কাজা হয়ে থাকলে কাজা আদায় করা, যাকাতের ব্যাপারে গাফলত হলে তা আদায় করা। এমনিভাবে হজ্জ্ব ফরজ হয়ে থাকলে হজ্জ্ব করা। যদি শারীরিক অসুবিধার কারণে নিজে হজ্জ্ব করতে হক্ষম না হয় তবে হজ্জ্বে বদলের ব্যবস্থা করা। যদি কোন মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে তবে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হওয়া। যদি এমন অবস্থা হয় যে, সে ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে তবে তার জন্যে দোয়ায়ে মাগফেরাত করতে থাকা। এর দ্বারা আশা করা যায় যে, সে সন্তুষ্ট হবে। আর এ ব্যক্তি তার হক্ব থেকে নিস্কৃতি পাবে।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ

আর এভাবে আমি আয়াত সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে 'আয়াত' শব্দটির অর্থ সত্যের দলিল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা তৌহীদ। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে তৌহীদের দলিল প্রমাণ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যারা সরল সঠিক পূণ্য পন্থা গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্যে সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান। কিন্তু যারা সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়, যারা পাপীষ্ঠ তাদের পথও এতদ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর কোন লোকের গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার তথা গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকার কোন সুযোগ রয়নি। যেমন আল্লাহ পাক সূরা বাকারাতে কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

(নিশ্চয় গোমরাহী থেকে সুস্পষ্টভাবে হেদায়েত প্রকাশিত হয়েছে।)

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾
قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ
الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ
بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

তরজমা

(৫৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক তাদের এবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করিনা। যদি তা করি তবে আমি বিপথগামী হবো এবং সুপথে থাকতে পারবো না।

(৫৭) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে আমার নিকট যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে আমি তার উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ তোমরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ। তোমরা যা সত্ত্বর চাও তা আমার নিকট নেই। হুকুম বা কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহ্ পাকেরই (আর কারো নয়)। তিনিই হক্ব কথা বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

(৫৮) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যা সত্ত্বর চাও যদি তা আমার নিকট থাকতো তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে মীমাংসা হয়েই যেত। আল্লাহ পাক জালেমদে সম্পর্কে খুব ভাল ভাবেই জানেন।

(৫৯) গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্জী তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তা জানেনা। প্রান্তরে এবং সমুদ্রে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর

অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরেনা। মাটির অন্ধকারে যে দানাটিই পড়ে আর তাজা এবং শুস্ক যা কিছু আছে সবই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।

(৬০) আর তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আর দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন। এরপর দিনে তিনি তোমাদেরকে পুনঃ জাগ্রত করেন নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্যে। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফেরদের পথভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে এবং মূর্তি পূজা তথা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে সত্যকে প্রকাশ করার জন্যে বিস্তারিত বিবরণ দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফেরদের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ রয়েছে।[২]

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! আপনি কাফেরদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে, শেরক সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর বন্দেগী কর নিঃসন্দেহে তা মহা পাপ। আমার বিবেক বুদ্ধি এবং আমার নিকট আল্লাহর যে ওহী আসে তা আমাকে এমন মানবতা বিরোধী আচরণে বাধা দেয়।

অতএব, তোমরা যত চেষ্টা কর না কেন আমার দ্বারা এমন অন্যায় কাজ হবে না। তোমাদের মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারবো না। তোমাদের খেয়াল খুশি মাফিক আমি চলতে পারবো না। যদি আমি তোমাদের মত অন্যায় কাজে লিপ্ত হই তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই এভাবে আমি আমার সর্বনাশ ডেকে আনতে পারি না।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা.

---

১ : তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৩
২ : তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৬

আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিশ্বাস করতে হয় যে, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা। সৃষ্টি সবই তাঁর, তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগতের অধিকর্তা, সকলের রিয্‌ক দাতা। তাঁর এসব গুণাবলীতে কোন সৃষ্টি শরীক হতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর নখদর্পণে। আর সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্পূর্ণ তাঁর কর্তৃত্বাধীন, তাঁর নেতৃত্বাধীন। কোন সৃষ্টিই তাঁর এলম বা ক্ষমতার আওতার বাইরে নয়। আল্লাহ পাকের এ গুণাবলীর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই একজন মানুষ মোমেন হতে পারে।

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের এসব গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার এবং কাফেররা যে অন্যায় অসুন্দর পথে রয়েছে তার বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য অনেক কিছুর নিকট তারা মাথা নত করে, স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা করে, এতে মানবতার অবমাননা হয়। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সেরা সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। এমনি অবস্থায় মানুষ যদি কোন সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে তবে এর চেয়ে বড় অবমাননাকর কাজ আর কি হতে পারে! তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসারী হতে পারি না। তোমাদের জীবন ধারা, তোমাদের পূজা পাঠ, তোমাদের শেরক কুফর সম্পূর্ণ মহা পাপ, যদি আমি তোমাদের কথা মেনে চলি তবে আমি পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রকাশ্য নিদর্শন ও দলিল প্রমাণ আমার নিকট রয়েছে। তোমরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করছো। এ পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল ও সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা হলো পবিত্র কোরআন, যার মোকাবেলা করা পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব হয়নি এবং কোন দিন হবে না। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন তার মোকাবেলায় মাত্র তিনটি আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আনয়নের চ্যালেঞ্জ করেছে।

কিন্তু এ পর্যন্ত কোন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সাহস করেনি। পবিত্র কোরআন তার শিক্ষার দিক থেকে পরিপূর্ণ, যুগোপযুগী, তার শিক্ষা সার্বজনীন। এতে রয়েছে সর্বকালের মানুষের সমস্যার সমাধান, সকল জিজ্ঞাসার জবাব। হেদায়েত এবং বিধি-নিষেধের দিক থেকে পবিত্র কোরআন অদ্বিতীয়। ভাষার অলংকার এবং বর্ণনা-শৈলীর দিক থেকে অপূর্ব, অনন্য সাধারণ।

অতএব, পবিত্র কোরআনের বিরোধিতার অনিবার্য পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ পরিণতি ভোগ করার জন্যে তোমরা প্রস্তুত থাক। কাফেররা বিদ্রুপ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বার বার একথাটি বলতো যে, যদি আপনি আপনার দাবীতে সত্যবাদী হন তবে আমাদের শাস্তির জন্যে আল্লাহর আযাব নিয়ে আসুন। তার জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ

অর্থাঃ তোমরা যে আযাব দেখার জন্যে তাড়াহুড়া করছো সে আযাব আমার হাতে নেই, তা আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। এ আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা তখন আযাব নাযিল করবেন, সেই নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে আযাব নাযিল করার কোন ক্ষমতা আমার নেই।

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ

অর্থাৎ হুকুম বা সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। তোমাদের প্রতি আযাব কখন নাযিল হবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনিই সঠিক এবং উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যে আযাবকে অনতিবিলম্বে দেখতে চাও তা যদি আমার নিকট থাকতো তবে তো আমার এবং তোমাদের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। অর্থাৎ আযাব আসতো, তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। আমার এবং তোমাদের মধ্যে যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব রয়েছে তা শেষ হয়ে যেতো। অথবা এর অর্থ হলো আমার নিকট যদি সে আযাব থাকতো তবে কেয়ামত আজই কায়েম হতো।

হক্ব ও বাতিল তথা সত্য ও অসত্যের ব্যাপারেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যেতো, আর কেয়ামতের দিন আমার ও তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ের ফয়সালা হওয়ার কথা তা এখনই হয়ে যেতো। আর আল্লাহ্ পাক জালেমদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে যে বিলম্ব হচ্ছে তা জ্ঞানের বা শক্তির অভাবে নয়; বরং হেকমতের কারণে। আল্লাহ পাক বিজ্ঞানময়, তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর প্রতিটি কর্ম হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, তিনি মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই তাঁর শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত যেমন নির্ভুল হয় তেমনি হয় সময়োপযোগী। তাই এ সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই গ্রহণ করেন।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

"আর গায়বের কুঞ্জী সমূহ একমাত্র আল্লাহ্ পাকের নিকটই রয়েছে"।

গায়ব কি?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, গায়ব হলো সে বস্তু যা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি, যেমন কেয়ামতের অবস্থা, বৃষ্টি হওয়া না হওয়া, মানুষ আগামী কাল কি করবে, আর কখন কোথায় মানুষের মৃত্যু হবে– এসব ব্যাপার গায়বের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, সে বিষয়ও গায়বের অন্তর্ভুক্ত যা অস্তিত্ব লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেননি যেমন মায়ের উদরে ছেলে থাকা কি মেয়ে।

আল্লামা বগবী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গায়বের কুঞ্জী পাঁচটি, যা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না।

১. মায়ের উদরে কি আছে তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

২. আল্লাহ ব্যতীত একথাও কেউ জানেনা যে, সে আগামী কাল কি কাজ করবে।

৩. আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা যে, বৃষ্টি কখন হবে।

৪. কেউ একথা জানেনা যে, তার মৃত্যু কোথায় হবে।

৫. আল্লাহ পাক ব্যতীত একথাও কেউ জানেনা যে, কেয়ামত কবে হবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) মসনদে আহমদে এবং ইমাম বোখারী (রঃ)-ও এই হাদীস শরীফ সংকলন করেছেন। এভাবে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এটি সেই পাঁচটি বিষয়ের একটি যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। অর্থাৎ কেয়ামত হলো সেই পাঁচটি জিনিসের একটি যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একথাও লিখেছেন যে, মূলতঃ এলমে গায়ব এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি অথবা অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু আল্লাহ পাক তা কারো নিকট প্রকাশ করেননি, এসবই গায়বের অন্তর্ভুক্ত।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "মাফাতেহুল গায়ব" শব্দটির অর্থ জমিনের গুপ্ত ভাণ্ডার এবং আযাব নাযিল হওয়ার এলম। আর আতা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ সেই সওয়াব ও আযাব যা অবশেষে মানুষকে দেয়া হবে, কিন্তু এখন মানুষের নিকট গোপন রয়েছে।

"মাফাতেহুল গায়ব" শব্দের ব্যাখ্যায় আরো অভিমত রয়েছে যেমন এ জীবনের সময় কবে শেষ হবে, কোন লোকের নেককার হওয়া বা বদকার হওয়া। আর মানুষের মৃত্যু কিভাবে ঘটবে প্রভৃতি।[১]

لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ

অর্থাৎ এসব গায়বী বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না, হ্যাঁ যদি আল্লাহ পাক কাউকে এর এলম দান করেন তবে সে জানতে পারে আর লক্ষ লক্ষ গায়বী বিষয় সম্পর্কেও যদি কাউকে অবগত করা হয় তবে তাও একটা সীমিত ব্যাপার, আর আল্লাহ পাকের জ্ঞান ভান্ডার অনন্ত অসীম, তা শুধু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা দু'টি কথা প্রমাণিত হলো ঃ

১. অদৃশ্য জ্ঞানের ভান্ডার এবং কুঞ্জিকা আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে, মানুষ চিন্তা-চর্চা গবেষণা করে তার চাবি হস্তগত করতে পারে না।

২. কোন সৃষ্টি যেমন গায়ব বা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে এলম রাখেনা, তেমনি সে বিষয়ে কোন শক্তিও কোন সৃষ্টির নেই। সর্বময় শক্তির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ পাক আর সর্ব বিষয়ের জ্ঞান এবং সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে, আর কারো নেই।

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط

পূর্ববর্তী আয়াতে এলমে গায়ব সম্পর্কে ঘোষণা ছিল, আর এ আয়াতে পৃথিবীতে যা বর্তমান রয়েছে তার সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, পৃথিবীর স্থল ভাগ এবং সামুদ্রিক ভাগ তথা সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মানব দানব, বৃক্ষ-তরুলতা এক কথায় আল্লাহ্ পাক সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এরপর বিষয়টি সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا

অর্থাৎ কোন বৃক্ষ থেকে কোন পাতাও যদি ঝরে তা-ও আল্লাহ পাকের এলমে থাকে। পৃথিবীতে যত বৃক্ষ, যত পাতা আছে তার সংখ্যা আল্লাহ পাকই জানেন। কোন্ পাতা ঝরে যায়, আর কত পাতা রয়ে যায় তা-ও আল্লাহ পাক জানেন।

وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ

অর্থাৎ জমিনের অভ্যন্তরে যে দানাটি রাখা হয় তা-ও আল্লাহ পাক জানেন। শুকনো অথবা ভেজা যা কিছু মাটিতে পড়ে তা-ও লিপিবদ্ধ রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

১ : তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৩

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে رَطْب শব্দটি পানি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর يَابِسٍ শব্দটি মরুভূমি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো জীবিত এবং মৃত। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ পাক জানেন সকল বৃক্ষের প্রতিটি পাতাকে, প্রতিটি দানাকে, প্রতিটি ভেজা ও শুষ্ক বস্তুকে। সবই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের এলম।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এলমে সবই সংরক্ষিত রয়েছে। যেভাবে কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ হলে তা সংরক্ষিত হয়ে যায়, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা ঠিক এমনিভাবে সমগ্র সৃষ্টি জগতের সবকিছু আল্লাহ পাকের এলমে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত আছে।

এতদ্ব্যতীত, স্থান-কাল সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না আর আল্লাহ পাক সবই জানেন। মানুষ যখন তার মায়ের উদরে থাকে, তার সে অবস্থান সম্পর্কে সে কিছুই জানেনা, মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে, তখন এ পৃথিবী সম্পর্কেও সে কিছুই জানেনা। আর কবে তার মৃত্যু হবে? কোথায় তার মৃত্যু হবে? কোথায় তাকে দাফন করা হবে? কবরে তার কি অবস্থা হবে? হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানের পর তার কি অবস্থা হবে, পুলসিরাত কিভাবে পার হবে, অবশেষে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান কোথায় হবে সে কিছুই জানেনা।

আর আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এমনিভাবে কাল হলো ৩টি ঃ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত। মানুষ অতীত সম্পর্কে কিছুই জানেনা, বর্তমান সম্পর্কেও সে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল নয় আর ভবিষ্যত তার সম্পূর্ণ অজানা। আল্লাহ পাক অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবই জানেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

"আর আল্লাহ পাক জানেন মানুষের অতীত ও বর্তমান অবস্থা"।

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

"মানুষ যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে সবই তিনি জানেন"।)

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ

"আর আসমান-জমিনে একটি শষ্য-কণা পরিমাণ কোন জিনিসও আপনার প্রতিপালকের এলম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়"।

وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

"আর নিশ্চয় আল্লাহ পাকের জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে"।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

"আল্লাহ পাক জানেন তোমাদের চোখের চুরি, এবং তোমাদের মনের গহনে যে সব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক যেভাবে তাঁর মহান এলমের কথা ঘোষণা করেছেন, পরবর্তী আয়াতে তেমনি তাঁর কুদরত বা ক্ষমতার কথা এরশাদ করেছেনঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى ج

"আর তিনিই রাত্রিকালে তোমাদেরকে তাঁর কবলে নেন এবং দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু কর সবই তিনি জানেন"।

এরপর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্যেই তোমাদেরকে সেখানে উঠানো হয়, অবশেষে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তোমাদের যাবতীয় কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

মানুষের জীবনও মৃত্যুর দৃষ্টান্ত প্রত্যহ মানুষের সম্মুখে আসে। কেননা, নিদ্রা এবং মৃত্যু খুবই কাছাকাছি, প্রতি রাতে আল্লাহ পাক মানুষের রুহকে ক্ষণিকের জন্যে তাঁর কবলে নিয়ে নেন, ফলে সে নিদ্রিত হয়, তার ইন্দ্রিয় চেতনা ক্ষণিকের জন্যে হলেও দূরীভূত হয়। সে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থায় তার চারিপার্শ্বের অবস্থা সম্পর্কে এমনকি, নিজের অবস্থা সম্পর্কেও সে বে-খবর হয়ে থাকে।

নিদ্রা এবং মৃত্যু উভয় অবস্থায়ই মানুষের আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ পাকের কবলে থাকে। নিদ্রা শেষ হলে বা ভঙ্গ হলে আল্লাহ পাক আত্মাকে পুনরায় মানুষের দেহে ফিরিয়ে দেন ফলে সে জাগ্রত হয় এবং জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। যেহেতু প্রতিটি মানুষের জন্যে এ পৃথিবীতে একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে, তাই সে নির্ধারিত সময় যা শুধু আল্লাহ পাকের এলমেই রয়েছে তা পূর্ণ করার জন্যে নিদ্রা শেষে তার আত্মাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য, তা হলো দিনে মানুষ তার কর্ম তৎপরতার কারণে ক্লান্ত হয় এবং রাতে বিশ্রামের কারণে সে ক্লান্তি দূর হয়। নিদ্রা শেষে সে জাগ্রত হয়ে এক নতুন সতেজ জীবন লাভ করে। আমরা প্রতিনিয়ত এ দৃশ্য

দেখি। এটি জীবন, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের একটি জীবন্ত নমুনা, যেভাবে মানুষ প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পর সে পুনর্জীবন লাভ করবে। এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তাকে হাযিরী দিতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানুষকে অবগত করানো হবে। জীবনে নেক আমল করলে তার শুভ পরিণতি সে লাভ করবে। পক্ষান্তরে জীবনে মন্দ কাজ করলে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমালুল কোরআন

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ থেকে اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ পর্যন্ত

১. যদি কেউ কাতান কাপড়ের উপর লিপিবদ্ধ করে মাথার নীচে রেখে ঘুমিয়ে থাকে আর আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করেঃ অমুক বিষয় আমি জানতে চাই। হে আল্লাহ! আমাকে জানিয়ে দাও, তবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ্ পাক স্বপ্ন যোগে তাকে বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করবেন।

২. যে অজু অবস্থায় এ আয়াত সমূহ লিপিবদ্ধ করে নিজের হাতের বাজুতে বেঁধে রাখবে এবং পবিত্র বিছানায় নিদ্রিত হবে, সকালে যে তার সঙ্গে দেখা করবে সে তাকে আশ্চর্যজনক কোন কথা বলবে।

৩. রিয্‌ক বৃদ্ধির জন্যে দু' রাকাআত নামায এভাবে পড়বে যে, সূরা ফাতেহার পর প্রথম আয়াত প্রথম রাকাআতে পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর দ্বিতীয় আয়াত পাঠ করবে আর অধিক পরিমাণে পাঠ করবে "আসতাগ ফিরুল্লাহাল গাফুরার রাহীম"। ইনশাআল্লাহ রিয্‌ক বৃদ্ধি পাবে।

وَهُوَ الْقَاهِرُ
فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ
الْحَقِّ ۗ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ
مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا
مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ
كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

তরজমা

(৬১) তিনি স্বীয় বন্দাগণের উপর পরাক্রমশালী। আর তিনিই প্রেরণ করেন তোমাদের জন্যে রক্ষক। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার মৃত্যু ঘটায় আর তারা কোন প্রকার ত্রুটি করেনা।

(৬২) এরপর তাদেরকে সেই আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। মনে রেখো, হুকুম শুধু তাঁরই আর তিনি অতি সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(৬৩) (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলভাগ ও সমুদ্র ভাগের অন্ধকার থেকে, যখন তোমরা অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে চুপিসারে তাঁকে ডাক দিয়ে বল, যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর তবে আমরা অবশ্যই শোকর গুজার বন্দা হবো।

(৬৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকই সে বিপদ থেকে এবং সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করে থাকেন, কিন্তু তবু তোমরা শেরক কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াত সমূহেও আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, পৃথিবীতে যত সৃষ্টি রয়েছে তার একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ পাক। যার কোন অস্তিত্ব ছিলনা তাকে অস্তিত্ব দান করা তাঁরই কাজ। তিনি সর্বশক্তিমান। সর্বত্র বিরাজমান। ঠিক এমনিভাবে সৃষ্টি মাত্রেরই লয় হয় তাঁরই ইচ্ছায় এবং মর্জিতে, অতএব সৃষ্টি এবং লয়, উত্থান এবং পতন সবই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের একক ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়। আর এ অর্থেই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক

আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের উপর পরাক্রমশালী। সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করেন এবং যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা তিনি পৃথিবী থেকে তাকে বিদায়ও করেন। ঠিক এমনিভাবে দিনকে তিনি রাতে এবং রাতকে তিনি দিনে পরিবর্তন করেন। আলোকে অন্ধকারে এবং অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করেন। এসবই তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জির ব্যাপার। ফকীরকে তিনি করেন বাদশাহ আর বাদশাহকে করেন ফকির। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"(হে রসূল) আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! তুমিই ক্ষমতার মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দান কর। আর যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। আর যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত কর আর যাকে ইচ্ছা তাকে অপমানিত কর। যাবতীয় কল্যাণ শুধু তোমারই হাতে, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"।

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط

বন্দাদের উপরে আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতার আরেকটি প্রমাণ এই যে, আল্লাহ পাক বন্দাদের হেফাজতের জন্যে এবং তাদের কার্যকলাপ সংরক্ষণের জন্যে রক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেন। যারা একদিকে বন্দাদের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, অন্যদিকে আল্লাহ পাক যাকে জীবিত রাখার মর্জি করেন ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সে ব্যক্তির হেফাজত করতে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

(নিশ্চয় তোমাদের উপর রয়েছে হেফাজতকারী ফেরেশতা কেরামুন কাতেবীন।)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ তাঁর বন্দাদের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন আর তারা হলেন কেরামুন কাতেবীন। আর এ ফেরেশতাগণ

বন্দাদের কর্মকান্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(সূরা কাফঃ ১৭-১৮)

অর্থাৎ স্মরণ রেখো, দু'জন (ফেরেশতা) গ্রহণকারী তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম তৎপরতা লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটই রয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ ফেরেশতাদের কাজ হলো মানুষের কর্মকান্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা।

মানুষের যাবতীয় কর্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ

মানুষের জীবনে ভাল মন্দ যত কাজই হয় সকল কাজেরই বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষিত হয় যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا

"কেয়ামতের দিন লোকেরা বলবে, এই কিতাবের কি হলো, ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়া হয়নি, সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

এজন্যেই সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا..............

(প্রতিটি মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কেয়ামতের দিন আমি তার জন্যে বের করব এক কিতাব যা সে পাবে উম্মুক্ত। (তাকে বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট।)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে দু'জন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছেন, একজন ডান কাঁধে, আকেজন বাম কাঁধে। যখনই সে কোন ভাল কথা বলে তখন ডান দিকের ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করেন। আর যখন সে কোন মন্দ কথা বলে তখন ডান দিকের ফেরেশতা বাম দিকের ফেরেশতাকে বলে একটু অপেক্ষা কর, হয়তো সে তওবা করবে। কিন্তু যদি তওবা না করে তবে বাম দিকের ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করেন।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৪

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ মানুষের সঙ্গে মোতায়েন ফেরেশতার দায়িত্ব হলো মানুষের কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা, তার রিয্‌কের হেফাজত করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবন সংরক্ষণ করা। বর্ণিত আছে যে, হেফাজতকারী ফেরেশতা সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকেন। এমনকি, মায়ের উদরেও যখন মানুষ থাকে তখনও তার হেফাজতে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। হযরত ওসমান (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হেফাজতকারী ফেরেশতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি এরশাদ করেছেনঃ তারা হলেন কেরামুন কাতেবীন।[১]

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ

অর্থাৎ যখন কোন বন্দার মৃত্যুর সময় হয়ে যায়, তখন যে ফেরেশতাগণ এতদিন তার হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেছেন, তারাই তার মৃত্যু ঘটান। এতে তারা কোন প্রকার ত্রুটি করেন না; বরং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তারা মানুষের জীবনের অবসান ঘটান যা তার নির্দিষ্ট সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও হয় না পরেও হয় না।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ মানুষের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণের তিনটি ভাগ রয়েছে ঃ

১. যারা মানুষের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন,

২. যারা মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন,

৩. যারা মানুষের রূহ কবজ করার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেন। এঁরা হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর নেতৃত্বে কাজ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে رُسُلُنَا শব্দটি দ্বারা মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর সাহায্যকারী ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আবুশ্ শেখ ইমাম নখয়ী (রঃ)-এর সূত্রে একথাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লামা সয়ূতি (রঃ) ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যেসব ফেরেশতা মানুষের কাছে থাকেন, তারাই তার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেন এবং যখন মৃত্যুর সময় হয় তখন তারাই রূহকে কবজ করে মালাকুর মওত হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর সোপর্দ করেন।

আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ মালকুল মওত হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর নেততে্ব দায়িত্ব পালন করেন।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬০৪

এবনে হাব্বান এবং আবুশ্ শেখ বর্ণনা করেন যে, রবী এবনে আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় মালাকুল মওত কি একাই সমস্ত রূহ কবজ করেন?

রবী বললেন, সমস্ত রূহের দায়িত্ব একমাত্র মালাকুল মওতের উপরই অর্পিত, কিন্তু তাঁর সহযোগী অনেক ফেরেশতা রয়েছেন যারা তাঁর নেতৃত্বে দায়িত্ব পালন করেন।

আর মালাকুল মওত আজরাঈল (আঃ)-এর এক কদম হয় পৃথিবীর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য। হযরত রবী এবনে আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মোমেনদের রূহ কোথায় থাকে?

তিনি বলেন, সিদরাতুল মোনতাহার নিকট।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে তিনটি আয়াত হয়েছে–

১. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তার মৃত্যু ঘটায়।

২. يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ তোমাদের মৃত্যু ঘটায় মালাকুল মওত যার প্রতি তোমাদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

৩. اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ আল্লাহ পাকই প্রাণী মাত্রকে মৃত্যু মুখে পতিত করেন।

প্রথম আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফেরেশতাগণ মানুষের মৃত্যু ঘটায়।

আর দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছে, রূহ কবজ করার এ দায়িত্ব পালন করেন মালাকুল মওত আজরাঈল (আঃ)।

আর তৃতীয় আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে এ কাজটির সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ পাকের সঙ্গে রয়েছে।

ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেছেনঃ প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তিনটি আয়াতের মর্মে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, রূহ কবজকারী হলেন ফেরেশতাগণ। তারা হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন। আর রূহ হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর দায়িত্বে থাকে। অন্য ফেরেশতাগণ রূহ বের করার কাজে সহযোগিতা করেন এবং রূহ বের করে আজরাঈল (আঃ)-এর সোপর্দ করেন। আর এসব কর্মকান্ডের মূল কর্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন। তাঁর আদেশ-ক্রমেই সংশ্লিষ্ট সকল ফেরেশতা তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

ইমাম কুরতবী (রঃ) এ পর্যায়ে আরো একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসে রয়েছে, মৃত্যুপথ যাত্রীর নিকট চারজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন ডান পা থেকে আরেকজন বাম পা থেকে তৃতীয় ফেরেশতা ডান হাত থেকে এবং চতুর্থ ফেরেশতা বাম হাত থেকে রূহ বের করে আনেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৬

কালবী বর্ণনা করেনঃ মালাকুল মওত রূহকে কবজ করার পর রহমত অথবা গজবের ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। তফসীরকারগণ হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মালাকুল মওতের ক্ষমতা সারা পৃথিবীর সব কিছুর উপর এভাবে রয়েছে যেমন কোন জিনিস কারো হাতে থাকে এবং সে যা খুশী তা ঐ হাতের জিনিসের সাথে করতে পারে। হযরত আজরাঈল (আঃ) সকল রূহ কবজ করেন তবে তাঁর সঙ্গে রহমত এবং আযাবের ফেরেশতা থাকেন। পবিত্র রূহ কবজ করার পর রহমতের ফেরেশতাদের হাতে অর্পণ করেন আর অপবিত্র রূহ হলে আযাবের ফেরেশতাদের হাতে অর্পণ করেন। এবনে আবিদ্দুনিয়া, আবুশ্ শেখ প্রমুখ অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন।

হযরত বারা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসেও রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়ার সাথে কোন মোমেন বন্দার সম্পর্ক যখন ছিন্ন হওয়ার সময় আসে এবং আখেরাতের নিকটবর্তী হয় তখন সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ তার নিকট অবতরণ করেন। জান্নাত থেকে আনা কাফন এবং খুশবু তাদের নিকট রাখেন এবং একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে পড়েন।

এরপর মালাকুল মওত এসে মৃত্যুপথ যাত্রীর শিয়রে বসেন এবং বলেন, হে পবিত্র রূহ! আল্লাহ পাকের মাগফেরাত এবং সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে পড়। তখন রূহ ঠিক এভাবে বের হয়ে আসে যেমন কস্তুরী থেকে পানির ফোটা বের হয়ে আসে। মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রহমতের ফেরেশতার হাতে দিয়ে দেন এবং তারা বেহেশতী কাফনে এবং খুশবুতে রূহকে জড়িয়ে নেন। আর এই হাদীসে কাফেরদের সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ এসে একটু দূরত্বে বসে পড়েন। এরপর মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আঃ) তার শিয়রে বসে রূহ কবজ করে আযাবের ফেরেশতাগণের নিকট সোপর্দ করেন। ক্ষণিকের জন্যেও নিজের হাতে রাখেন না।

এবনে আবি হাতেম যোহায়ের এবনে মোহাম্মদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হয়েছেঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে এবং এ দু'য়ের মাঝে দু'দল সৈন্য বাহিনী যুদ্ধরত হয় এবং ধ্বংস হয় (এমন অবস্থায় একই সময়ে মালাকুল মউত কোথায় কোথায় যায় এবং কার জান কবজ করে)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করলেনঃ মালাকুল মওতের জন্যে পৃথিবীকে এভাবে পরিবেষ্টন করা হয়েছে যেমন তোমাদের সম্মুখে একটি তশতরী। দুনিয়ার কোন জিনিসই তাঁর নিকট থেকে ছুটতে পারে না।

এবনে আবিদ্দুনিয়া এবং আবুশ্ শেখ আসয়াস এবনে আসলামের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মালাকুল মওতকে যার নাম আজরাঈল, যার দু'টি চোখ সম্মুখে আর দু'টি চোখ পেছনে রয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এক ব্যক্তি থাকে প্রাচ্যে আর একজন থাকে প্রতীচ্যে। পৃথিবীর কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ে অথবা দু'দল সৈন্য বাহিনী পরস্পর লড়াই করে, এমনি অবস্থায় আপনি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেন? তখন আজরাঈল (আঃ) বলেনঃ আমি রূহ গুলোকে আল্লাহর অনুমতিতে ডাকি, আর সমস্ত রূহ আমার নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ে।

আসয়াস এবনে আসলাম বলেন, মালাকুল মওতের সম্মুখে পৃথিবীকে তশতরীর ন্যায় সমান করে দেয়া হয়েছে। তিনি যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে রূহকে পাকড়াও করেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে মালাকুল মওত বলেন, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীকে আমার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। যেমন তোমাদের সম্মুখে তশতরী রাখা হয়, তোমরা তার যে কোন প্রান্ত থেকে ইচ্ছা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করতে পার ঠিক এভাবে পৃথিবীকে আমার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আবুশ্ শেখ এবং আবু নাঈম মুজাহেদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মালাকুল মওতের জন্যে পৃথিবীকে একটি তশতরীর ন্যায় করে দেয়া হয়েছে, সে যেখান থেকে ইচ্ছা রূহকে নিয়ে নিতে পারে। আল্লাহ্ পাক তার জন্যে কিছু সাহায্যকারী ফেরেশতাও তৈরী করে দিয়েছেন, যারা রূহকে কবজ করে এবং এরপর তাদের থেকে মালাকুল মওত সেই রূহ নিয়ে নেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, হাদীস শরীফের আলোকে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যেভাবে সূর্যের সম্পর্ক সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটির বস্তুর সাথে সমান ভাবে রয়েছে, ঠিক এভাবে মালাকুল মওতের জন্যে পৃথিবীকে তার নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়েছে। যদি তিনি প্রাচ্যের কোন এলাকায় কোন লোকের রূহকে কবজ করার কাজে মশগুল হন ঠিক ঐ একই সময়ে তিনি প্রতীচ্যে বা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে অন্য রূহকে কবজ করতে পারেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর কোন কোন ওলীকেও এ শক্তি দান করেছেন। তাঁরা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। আল্লাহ্ পাক মালাকুল মওতের জন্যে কিছু সাহায্যকারী ফেরেশতা তৈরী করে দিয়েছেন। যারা তাঁর বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় কাজ করেন এবং মানুষের রূহ কবজ করেন। প্রত্যেক মৃত্যুপথের যাত্রীর নিকট সে মোমেন হোক বা কাফের ফেরেশতাদের একটি দল বেহেশত বা দোযখের কাফন নিয়ে হাযির হন এবং রূহকে নিয়ে আসমানের দিকে গমন করেন। আলোচ্য আয়াতে "রুসুল" শব্দটির ব্যাখ্যা মালাকুল মওতের সাহায্যকারী অথবা সেই ফেরেশতা যারা মালাকুল মওত

থেকে রূহ নিয়ে আসমানের দিকে গমন করেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ যদিও আলোচ্য আয়াতে 'রুসুল' শব্দটি বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে একা মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে।

وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ

ফেরেশতাগণ তাদের কর্তব্য পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করেনা অর্থাৎ কোন প্রকার অবহেলা বা আদেশ পালনে বিলম্ব করেনা।

উল্লেখ্য, আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত মানুষের রূহ কবজ করার কোন শক্তি ফেরেশতাদের নেই। তেবরানী এবং আবু নাঈম হযরত হারেস এবনে খাজরাপের সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার আজরাঈল (আঃ)-কে দেখলেন, একজন আনসারী সাহাবীর শিয়রে উপবিষ্ট। তখন তিনি মালাকুল মওতকে বললেনঃ আমার সাহাবীর সঙ্গে তুমি বিনম্র ব্যবহার কর, সে মোমেন।

তখন মালাকুল মউত হযরত আজরাঈল (আঃ) জবাব দিলেনঃ আপনি মনকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং নয়ন যুগলকে শীতল রাখুন এবং উপলব্ধি করুন যে, আমি প্রত্যেক মোমেনের সঙ্গেই বিনম্র ব্যবহার করি।

হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি জেনে রাখুন, আমি যখন কোন মানুষের রূহ কবজ করি আর মৃত ব্যক্তির রূহ নিয়ে ঐ ঘরেই দণ্ডায়মান হয়ে বলিঃ হে বিলাপকারী! আল্লাহ্র শপথ, আমরা এ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করি নাই আর তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তার রূহ কবজ করি নাই এবং তার মৃত্যু মুখে পতিত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করি নাই আর এ ব্যাপারে আমাদের কোন ভুলও হয়নি (সবই আল্লাহ পাকের কাজ, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার)। এখন যদি তোমরা আল্লাহ পাকের কর্মে সন্তুষ্ট থাক তবে সওয়াব পাবে আর যদি অসন্তুষ্ট হও তবে গুনাহগার হবে এবং গুনাহ্র বোঝা বহন করবে। আমরা তো তোমাদের বোঝা বহন করবো। আমরা তো তোমাদের কাছে বার বার আসব। অতএব, তোমাদের ভয় করা উচিত এবং সাবধান হওয়া উচিত। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, বাড়ী-ঘরে থাক অথবা তাবুতে থাক, বিস্তৃত ময়দানে বা পাহাড়ে, আমরা দিবা-রাত্রি তোমাদের অনুসন্ধান করি। এমনকি, মানুষ নিজেকে এতটা চেনেনা যতটা আমি তাদের ছোট বড়কে চিনি। আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি একটি মাছির প্রাণ সংহার করতে চাই তবে আল্লাহর হুকুম ব্যতীত করতে পারিনা। আল্লাহ পাকই রূহ কবজ করার আদেশ করেন। এবনে আবিদ্দুনিয়া এবং আবুশ্ শেখও হাসানের সূত্রে এ বর্ণনা পেশ করেছেন।

জাফর এবনে মোহাম্মদ বর্ণনা করেন, আমার নিকট এ রেওয়ায়েত এসেছে যে, মালাকুল মওত নামাযের সময় (মসজিদ সমূহে) মানুষের অনুসন্ধান করেন। অতঃপর মৃত্যুর সময় এসে তাকে দেখেন। যদি মৃত্যু পথ যাত্রী ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে সে ব্যক্তির নিকট থেকে শয়তানদেরকে তিনি পলায়নে বাধ্য করেন। এবং সে ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।[১]

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ ؕ

অতঃপর সকলকে আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যেতে হবে, যিনি মানুষের প্রকৃত মালিক অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুমেই সকলকে হাযির হতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে। আর আল্লাহ পাকই যে সকলের সত্যিকার মালিক এ সত্য সেদিন কাফের, মুশরেক, মোমেন সকলেই ভালভাবে উপলব্ধি করবে। সেদিন সবার ভুল ভেঙ্গে যাবে। সকলেই বাস্তবের কষাঘাতে এ সত্য উপলব্ধি করতে বাধ্য হবে যে, সত্যিকার মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক। তাই পরবর্তী বাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে–

اَلَا لَهُ الْحُكْمُ قف

(মনে রেখো, হুকুম শুধু আল্লাহ পাকেরই, আর কারো নয়।)

وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ

আর তিনি অতি সত্বর হিসাব গ্রহণ করবেন। অতি দ্রুত হিসাব নিতে তিনি সক্ষম। সমগ্র বিশ্ব মানবের হিসাব নিতে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ সক্ষম।

একখানি হাদীসে আছে, দুনিয়ার অর্ধেক দিনের সময়ের মধ্য আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের হিসাব নেবেন।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ এ বাক্যটি দ্বারা কাফেরদের একটি ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে। যারা মনে করত যে দুনিয়ার মানুষের হিসাব নিকাশের ন্যায় আখেরাতের হিসাবও অত্যন্ত কঠিন, জটিল এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হবে। কিন্তু আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব গ্রহণে কোন বিলম্ব করা হবে না, বরং অতি সত্বর এবং অতি দ্রুত প্রত্যেকের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

অতএব, সতর্কতা অবলম্বন করা বিবেকবান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৯

"(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদেরকে স্থল ও সামদ্রিক ভাগের অন্ধকার থেকে নাজাত দেয়? তোমরা আল্লাহ্ পাককে ডাক অত্যন্ত মিনতি সহকারে এবং এ ফরিয়াদ কর, যদি আল্লাহ পাক এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন তবে আমরা অবশ্যই তাঁর শোকর গুজার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব"।

রক্ষা কর্তাকে?

আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি এদেরকে জিজ্ঞাসা করুন কে তোমাদের রক্ষাকর্তা? পৃথিবীর স্থল ও সামুদ্রিক ভাগে যখন তোমরা বিপদগ্রস্ত হও তখন সে বিপদ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করেন? আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এখানে 'জুলুমাত' শব্দটির ব্যাখ্যা হলো বিপদাপদ।

অর্থাৎ তোমরা মরুভূমিতে থাক অথবা সমুদ্রে সফর কর, যখন ঝড়-তুফান, রাতের অন্ধকার অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় অথবা সমুদ্রে ঝড় ওঠে অথবা দুশমন যখন তোমাদের উপর হানা দেয় তখন তোমরা চরম বিপদের মুহূর্তে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, বিনীত ভাবে কাকুতি মিনতি প্রকাশ কর এবং এ ফরিয়াদ কর যে, আল্লাহ পাক যদি এ বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন তবে অবশ্যই আমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব।

তখন ঐ বিপদ মুহূর্তে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর যাদের সম্মুখে তোমরা মাথা নত কর তাদেরকে তোমরা আদৌ স্মরণ করনা কেননা, তোমরা জান এ কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ তোমাদের উপকার করতে পারে না, তোমরা গোপনে অত্যন্ত এখলাসের সঙ্গে বিপদমুক্তির জন্যে দোয়া করতে থাক।[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "জুলুমাত" শব্দটির ব্যাখ্যা হলো রাতের অন্ধকার এবং সমুদ্রে মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখনকার কঠিন সময়, অথবা দুশমনের মোকাবেলায় যখন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয় এসব বিপদ মুহূর্তে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছুকে ভুলে যাও। বিপদমুক্তির জন্যে এক আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করতে থাক।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ মানুষ যখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন কয়েকটি কাজ করে–

(এক) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করে।

(দুই) শুধু দোয়া নয়; বরং ক্রন্দনও করে।

(তিন) আর সে ক্রন্দন হয় অত্যন্ত এখলাস এবং আন্তরিকতার সঙ্গে।

(চার) এমন সময় আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হওয়ার অঙ্গীকার করে।[২]

তাই এরশাদ হয়েছে لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ (যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর তবে আমরা তোমার শোকর গুজার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো)।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬০
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৯

শোকরের তাৎপর্য

শোকর বা কৃতজ্ঞতার তাৎপর্য হলো যিনি নেয়ামত দান করেন সেই দাতার দানের কথা স্বীকার করা এবং দানের হক্ব আদায় করা এবং দাতার সন্তুষ্টির কাজে তাঁর দানকে ব্যবহার করা।

আল্লাহ্ পাক মানুষকে দান করেছেন তার যথাসর্বস্ব অতএব, দরবারে এলাহীতে সর্বক্ষণ শোকর আদায় করা বন্দা মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছিল কে তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন আর এ আয়াতে রয়েছে তার জবাব, এরশাদ হয়েছেঃ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে রক্ষা করেন বিপদের অন্ধকার থেকে এবং সর্ব প্রকার বিপদ থেকে। তোমরা জান আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কেউ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারেনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক কর।

এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে শেরক ও কুফরের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান রয়েছে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ
بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾
وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ
مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۗ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ
الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

তরজমা

(৬৫) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের উপর থেকে অথবা তলদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে অপর দলের

সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে একমাত্র তিনিই সক্ষম। (হে রসূল!) লক্ষ্য করুন, আমি কিভাবে আয়াত সমূহকে সবিস্তারে বর্ণনা করছি যেন তারা তা অনুধাবন করতে পারে।

(৬৬) (হে রসূল!) আপনার সম্প্রদায় তাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে অথচ তা ধ্রুব সত্য। আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কার্য নির্বাহক নই।

(৬৭) প্রত্যেক সংবাদেরই সময় নিদৃষ্ট আছে আর অদূর ভবিষ্যতে তোমরা তা জানতে পারবে।

(৬৮) (হে রসূল!) আপনি যখন দেখেন যে তারা আমার আয়াত সমূহ সম্পর্কে উপহাস মূলক কথা বার্তায় লিপ্ত তখন আপনি তাদের থেকে দূরে সরে পড়বেন যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় মশগুল হয়। আর যদি শয়তান আপনাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পর পাপীষ্ঠদের সঙ্গে বসবেন না।

তফসীরুল কোরআন

মক্কার পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করতে তৎপর ছিল। কোরআনে করীমে বারবার তাদের সম্পর্কে আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাদের নাফরমানী এত বেড়ে গিয়েছিল যে, আযাবের কথাশুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার স্থলে তারা আযাব কবে আসবে প্রশ্ন করতে লাগলো। এমনকি আল্লাহ্ পাকের বাণী নিয়ে উপহাস করতে লাগলো।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাক যে কোন সময় তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে সক্ষম। আর সেই আযাব তিন প্রকারে আসতে পারে।

তিন প্রকার আযাব

১. যে আযাব উপর থেকে আসবে অর্থাৎ আসমান থেকে।

২. যা তোমাদের নিম্নদেশ থেকে আসবে।

৩. যা তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে বের হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, উপর থেকে তথা আসমান থেকে শিলা বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ঝড়-ঝঞ্ঝা আসার কারণে ইতিপূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। যেমন নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় প্রলয়ঙ্করী প্লাবনের কারণে এবং আদ জাতি তুফান এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার কারণে ধ্বংস হয়েছে। লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছে। আবরাহা এবং তার সৈন্য বাহিনী যারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছিল তাদের উপর আবাবীল পাখী দ্বারা কঙ্কর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং ক্ষণিকের মধ্যে তারা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল।

হযরত নূহ (আঃ)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে শুধু যে অতি-বৃষ্টির কারণে মহাপ্লাবনের শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাই নয়; বরং জমিনের অভ্যন্তর থেকেও পানি বের হয়ে এসেছিল। পরিণামে উপর এবং নীচ উভয় দিক থেকেই তাদের উপর আযাব আপতিত হয়েছিল। ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল তথা নিম্নদেশের আযাবে তারা পতিত হয়েছিল। এমনিভাবে কারুণকে তার সমস্ত সম্পদ সহ জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উপর থেকে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো জালেম বাদশাহ, নিষ্ঠুর শাসনকর্তা তাদের উপর বসিয়ে দেয়া হবে। আর নীচের আযাব অর্থ চাকর-বাকর, গোলাম, খাদেম-খেদমতগার ইত্যাদি অবিশ্বাসী, খেয়ানতকারী এবং কাম-চোর হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) কৃত এ তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় মেশকাত শরীফে সংকলিত একখানি হাদীস দ্বারা। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كَمَا تَكُونُونَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের আমল ভাল মন্দ যেমন হবে তোমাদের শাসনকর্তাও তেমন হবে। যদি তোমরা নেককার হও আল্লাহ পাকের অনুগত হও তবে তোমাদের শাসন কর্তাও দয়াদ্র হবেন, সুবিচার পছন্দ করবেন। পক্ষান্তরে তোমরা যদি বদকার হও তবে তোমাদের উপর নিষ্ঠুর, জালেম শাসনকর্তা চাপিয়ে দেয়া হবে যেমন প্রবাদ বাক্য আছে, أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ

আর এ প্রবাদ বাক্যটি উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

আবু নাঈমের সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি সকল বাদশাহদের মালিক এবং বাদশাহ। সকল বাদশাহদের অন্তর আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে। যখন আমার বন্দাগণ আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তখন তাদের শাসনকর্তাদের অন্তরে আমি দয়া-মায়া সৃষ্টি করে দেই। আর যখন আমার বন্দারা আমার নাফরমানী করে তখন আমি তাদের শাসনকর্তাদের অন্তরকে কঠোর করে দেই এবং তারা সেই নাফরমান বন্দাদেরকে সর্ব প্রকার কষ্ট দেয়। এজন্যে তোমরা শাসনকর্তাদের মন্দ বলে সময় নষ্ট করোনা; বরং আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ কর এবং আত্মসংশোধনে আত্মনিয়োগ কর।

আর এভাবে আবু দাউদ শরীফ এবং নাসায়ী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আল্লাহ্ পাক কোন শাসনকর্তার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাকে তিনি উত্তম উজির এবং উত্তম সহযোগী দান করেন। যদি শাসনকর্তার কোন ভুল হয় তবে তারা তাকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন সে সঠিক কাজ করে তখন তারা তাকে সাহায্য করে। আর যখন কোন শাসনকর্তার অদৃষ্ট মন্দ হয় তখন মন্দ লোকদেরকে তার উজির এবং সহযোগী বানিয়ে দেয়া হয়।

এই হাদীস সমূহের যে মর্মার্থ তা হলো, মানুষকে পৃথিবীতে তাদের শাসনকর্তার তরফ থেকে যে বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয় তা উপর থেকে আসা আযাব। আর যে কষ্ট চাকর–বাকর, খাদেম-খেদমতগারদের মাধ্যমে হয় তা নীচ থেকে আসা আযাব। আর এগুলো কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেকই মানুষের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন, আমার দ্বারা যখন কোন গুনাহ্ হয়ে যায় তার প্রতিক্রিয়া আমি লক্ষ্য করি আমার চাকর–বাকরের মধ্যে, আমার অশ্বের মধ্যে যার উপর আমি আরোহন করি। এমনকি, বোঝা বহনকারী গাধার মধ্যে। কেননা, এরা সবাই আমার নাফরমানী করতে শুরু করে। এজন্যেই মাওলানা রুমী (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন যে, আল্লাহ পাক কোন কোন সময় উপরস্থ্ কর্মকর্তাদের দ্বারা অথবা নিম্নস্থ্ চাকর–বাকর দ্বারা মানুষের কষ্টের উপকরণ সৃষ্টি করেন। এতে উদ্দেশ্য হলো তোমরা যেন আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ কর, তোমরা যেন সতর্ক হও এবং আত্মসংশোধন করে আখেরাতের কঠিন কঠোর আযাব থেকে রক্ষা পাও। অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো আত্ম সংশোধনে ব্রতী হওয়া, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত হওয়া।[১]

বর্ণিত আছে, যখন জিব্রাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে আসেন, আযাবের এ ঘোষণা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত হন এবং বলেন, যদি এ অবস্থা হয় তবে আমার উম্মত কিভাবে রক্ষা পাবে? তখন জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করেন যে আমিও তো আল্লাহর একজন বন্দা মাত্র। তবে আপনি দোয়া করুন। আমি আমীন বলার জন্যে হাযির আছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্যে দোয়া করলেন। একটু পর জিব্রাঈল (আঃ) খবর দিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার উম্মতের প্রতি উপর থেকে তথা আসমান থেকে আযাব

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬১
তফসীরে নেকতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৬২৭-২৯
তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২২
তফসীরে মাজদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৪

আসবে না। যেমন নূহ (আঃ) এবং লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর এসেছিল। আর যেভাবে কারূণকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিয়ে আযাব দেয়া হয়েছিল তেমন আযাবও আপনার উম্মতের জন্যে আসবে না। তবে তারা আত্মকলহ এবং অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে।[১]

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ط

অর্থাৎ তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে যুদ্ধের স্বাদ ভোগ করতে দেবেন।

এ আয়াতে তৃতীয় প্রকার আযাবের উল্লেখ রয়েছে যা মানুষের নিজেদের মধ্য থেকেই হয় অর্থাৎ আত্মকলহ, অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের সংঘর্ষের মাধ্যমে তোমাদের শাস্তি বিধান করা হবে। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ যখন আয়াতের প্রথম অংশ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الكريم

হে আল্লাহ! তোমার নিকট এমন আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর যখন আয়াতের দ্বিতীয় অংশ

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ط

নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পূর্বে ঘোষিত আযাব থেকে এটি সহজ। (বোখারী শরীফ)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় হিজরতের ৩৫ বছর পর। জমল এবং সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ কালে যখন মুসলমানগণ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হন।[২]

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 'বনি মুয়াবিয়া' মসজিদের দিকে যাচ্ছিলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। আমরাও নামায পড়লাম। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করলেন। দোয়া শেষ করে তিনি এরশাদ করলেন, আমি দোয়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে তিনটি জিনিস ছেয়েছিলাম। আমার

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৬০৫-০৬
১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬১

উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে (নূহ (আঃ)-এর উম্মতের মত) ধ্বংস করোনা। আল্লাহ পাক আমার এ দোয়া কবুল করেছেন। আমি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছিলাম আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করোনা। তিনি আমার এ দোয়া কবুল করেছেন। আমি দোয়া করেছিলাম আমার উম্মতকে পরস্পর যুদ্ধ করার আযাবে নিক্ষেপ করো না। আল্লাহ পাক আমার এ দোয়া কবুল করলেন না।

আবদুল্লাহ এবনে আবদুর রহমান আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মসজিদে তিনটি দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক দু'টি দোয়া কবুল করেছেন এবং একটি দোয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেছেন, আমার উম্মতের উপর কোন অমুসলিম শত্রু চাপিয়ে দিও না। আল্লাহ পাক এ দোয়া কবুল করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, দুর্ভিক্ষ দ্বারা আমার উম্মতকে ধ্বংস করোনা। আল্লাহ পাক এ দোয়া কবুল করলেন। আমার উম্মতকে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দিওনা। আল্লাহ পাক এ দোয়া কবুল করেননি।[১]

এবনে আবি হাতেম যায়েদ এবনে আসলামের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ আমার পরে তোমরা কাফের হয়োনা এবং একে অন্যকে খুন করোনা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। এ সাক্ষ্য দেয়ার পরও কি আমরা এমন অন্যায় কাজ করতে পারি? তখন একজন বললেন, এমন হতেই পারেনা। আমরা সকলে মুসলমান, আমরা একে অন্যকে হত্যা করতে পারিনা।

জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের আত্মকলহ এবং পরস্পরের সংঘর্ষকে আল্লাহর আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে। এজন্যে অন্য আয়াতে জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

(আর তোমরা আল্লাহ পাকের রজ্জুকে একত্রিত হয়ে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর, পরস্পর দলাদলি করো না।) অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

১ তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৬১-৬২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪

মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একখানি হাদীসে এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ

সমস্ত মোমেনগণ একটি মাত্র দেহের ন্যায়। যদি দেহের এক অংশে ব্যথা হয় তবে অন্য অংশে তা অনুভূত হয়, ঠিক এমনিভাবে কোন একজন মুসলমানের কষ্ট হলে সে কষ্ট অনুভব করবে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমান। মুসলিম জাতি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী। কালেমায়ে তৈয়্যেইবার সোনালী সূত্রে গ্রথিত, তাই তারা হবে ঐক্যবদ্ধ, এটিই স্বাভাবিক। এটিই পবিত্র কোরআনের শিক্ষা আর এটিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ। যতদিন মুসলিম জাহান এ মহান আদর্শের অনুসারী ছিল ততদিন মুসলিম জাতি এক অজেয় শক্তি হিসেবে সু-পরিচিত ছিল। উন্নতি অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি তাদের পদ চুম্বন করেছিল।

কিন্তু যখন মুসলমানগণ আত্মকলহে লিপ্ত হল তখন থেকে মুসলিম জাতির অবনতি শুরু হল। অথচ বর্ণ বংশ ভাষা প্রভৃতি কারণে ইসলামী ঐক্যে ফাটল ধরে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন সকলেই এক সমান। অতএব, জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখা প্রকৃত মোমেনের জন্যে যত সহজ অন্যদের জন্যে তত সহজ নয়।

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ

(হে রসূল!) আপনি দেখুন তো আমি কিভাবে যুক্তি সমূহ বিভিন্ন দিক থেকে বয়ান করে থাকি যেন ওরা বুঝতে পারে।

অর্থাৎ সুসংবাদ প্রদান এবং সতর্কবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে আমি দলিল সমূহ বর্ণনা করে থাকি যাতে করে তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারে।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ

আর (হে রসূল!) আপনার সম্প্রদায় এই কোরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করে। অথবা এর অর্থ হলো আপনি যে আযাবের কথা বর্ণনা করেছেন তাকে মিথ্যা জ্ঞান করে–

وَهُوَ الْحَقُّ ط

অথচ তা ধ্রুব সত্য।

قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহর আযাবকে তোমাদের মিথ্যা জ্ঞান করার কারণে আযাব অবতরণ করা আমার কাজ নয় বা আযাবের নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করাও আমার কাজ নয়। আমার কাজ শুধু আল্লাহ পাকের আযাবের সত্যতা সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ বাক্যটির অর্থ হলো, তোমাদেরকে ইসলামের আওতায় নিয়ে আসা আমার দায়িত্ব নয়। অথবা এর অর্থ হলো, যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে তোমাদের শাস্তি-বিধান করা আমার দায়িত্ব নয়।[২]

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ

মনে রেখো, সকল ঘটনার জন্যে অবশ্যই একটা সময় নিদৃষ্ট রয়েছে। শীঘ্র হোক অথবা বিলম্বে হোক নিদৃষ্ট সময়ে তা ঘটবেই। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে কাফেরদের শাস্তির ব্যাপারে যে ঘোষণা রয়েছে তা অবশ্যই একদিন ঘটনায় পরিণত হবে, তবে কখন হবে তা আল্লাহ পাকই জানেন।

وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

অদূর ভবিষ্যতে তোমরা তা অবশ্যই জানতে পারবে এবং আল্লাহ পাকের কালামের সত্যতা তোমরা তখন অবশ্যই উপলব্ধি করবে।

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

বাতিল-পন্থীদের মজলিস বর্জনীয়

অর্থাৎ (হে রসূল!) যখন আপনি দেখেন যে, কাফেররা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ সম্পর্কে উপহাস করে তখন তাদের মজলিস বর্জন করুন। এমন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে বিদ্রুপ করে বা তাতে দোষারোপ করে তারা আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনে।

অতএব, এমন হতভাগা লোকদের পরিবেশ থেকে ঘৃণা ভরে দূরে থাকা প্রকৃত মোমেনের কর্তব্য। যদি ভুলবশতঃ এমন মজলিসে হাযির হতে হয় তবে স্মরণ হওয়া মাত্র সেখানে থেকে দূরে সরে আসা একান্ত কর্তব্য। কেননা যে মজলিসে আল্লাহর দ্বীনকে বিদ্রুপ করা হয় সে মজলিস প্রকৃত মোমেনের জন্যে চির বর্জনীয়। উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকরা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাপারে

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৭৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬২

বিদ্রুপ করতো তাই এ প্রসঙ্গে কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, এমন দূরাত্মা লোকদের সঙ্গে (হে রসূল!) আপনি বসবেন না।

প্রশ্ন হতে পারে তাহলে এমন পথভ্রষ্ট লোকদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত কিভাবে পৌঁছানো হবে? এর জবাবে এরশাদ হয়েছে–

حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط

অর্থাৎ যতক্ষণ তারা ইসলামের বা পবিত্র কোরআনের প্রতি উপহাস করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মজলিস বর্জন করতে হবে। যখন তারা অন্য প্রসঙ্গে কথা বলবে তখন তাদের মজলিসে বসার অনুমতি রয়েছে।

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ

আল্লাহ্‌র বিধানকে উপহাস্‌কারী জালেমদের সঙ্গে বসার উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা যদি শয়তান ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজলিস বর্জন করুন।

যদিও এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিন্তু এ আদেশ সকলের জন্যেই প্রযোজ্য। এমনকি, যদি শয়তান এ আদেশ ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মজলিস বর্জন করা একান্ত কর্তব্য।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ
اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا
شَفِيْعٌ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬৯) কলহকারীদের কর্মকান্ডের জবাবদেহীর দায়িত্ব পরহেযগারদের নয়। তবে তাদেরকে উপদেশ দেয়া পরহেযগারদের কর্তব্য যেন তারাও সতকর্তা অবলম্বন করে।

(৭০) যারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশায় পরিণত করেছে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী তাদেরকে ধোকা দিয়েছে, (হে রসূল!) আপনি তাদের সংসর্গ বর্জন করুন এবং পবিত্র কোরআন দ্বারা তাদেরকে নসিহত করুন যেন কেউ নিজের কর্মকান্ডের জন্যে ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ পাক ভিন্ন কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। এমনকি তারা যদি বিনিময়ে সব কিছুও দিতে চায়, তবু তা গ্রহণ করা হবে না। এরাই সে সব লোক, যারা তাদের কৃতকর্মের জন্যে ধ্বংস হবে। তাদের কুফরীর কারণে রয়েছে তাদের জন্যে অতি উষ্ণ পানীয় এবং মর্মান্তিক শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাতে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এ আদেশ রয়েছে যে, কাফেররা যখন পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সম্পর্কে উপহাস করে তখন মুসলমানদের কর্তব্য হলো তাদের মজলিস বর্জন করা আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, যখন তোমরা তাদের মজলিস বর্জন করলে, তাদের থেকে দূরে সরে পড়লে তখন তোমাদের দায়িত্ব পালন করলে। তাই তাদের শেরক ও কুফরের হিসাব নিকাশের দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবেনা।[১]

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ যখন পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হলো তখন মুসলমানদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিলো যে, কাফেররা পবিত্র কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনেও পবিত্র কোরআনের আয়াত সম্পর্কে উপহাস করে থাকে এমনি অবস্থায় আমরা কিভাবে কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে যাবো এবং কিভাবে তওয়াফ করবো? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে এ আত্ম জিজ্ঞাসা জাগে যে কাফেররা যদি কুফর ও শেরক অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের উপহাস করতে থাকে আর আমরা তাদেরকে এহেন অন্যায় থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট না হই তবে আমরা গুনাহগার হবো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদেরকে এজন্যে জবাবদেহি করতে হবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৬
২ তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৩
তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৬

এরশাদ হয়েছে–

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ যারা প্রকৃত মুসলমান তারা যদি কাফেরদের মজলিস বর্জন করে এবং তাদের থেকে দূরে সরে আসে তবে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের প্রতি বিদ্রুপকারীদের পাপের ভাগী তারা হবেনা। এবং কাফেরদের জন্যে যে আযাব আসবে সে আযাবও তাদেরকে ভোগ করতে হবে না কিন্তু মুসলমানদেরকে এ পর্যায়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও চলবে না; বরং কাফেরদেরকে সৎ পথের সন্ধান দিতে থাকতে হবে। নসীহত করে তাদেরকে মন্দ পথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হতে হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও এ ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামের প্রথম যুগে কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, বর্তমান যুগেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বলা হয়, এসব মজলিস থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় এবং সুযোগ হলে তাদেরকে নসীহত করা কর্তব্য যেন তারা সাবধান হয় এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কথা এবং কাজ থেকে বিরত থাকে। আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, বেদ্বীন লোকদের মজলিস বর্জন করা যেমন কর্তব্য তেমনি তাদেরকে নসীহত করাও কর্তব্য। আর কাফেররা যে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে তার জন্যে মুসলমানগণকে দায়ী হতে হবে না। তবে মুসলমানদের কর্তব্য হলো তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا

পূর্ববর্তী আয়াতে যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের প্রতি বিদ্রুপ করে তাদের মজলিস বর্জনের নির্দেশ ছিলো আর এ আয়াতে এমন দূরাত্মা কাফেরদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ রয়েছে। এরশাদ হয়েছে, যারা নিজেদের ধর্মকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছে তাদের সংসর্গ বর্জন কর। প্রশ্ন হলো যারা এমন অন্যায় করেছে তারা কারা? হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তারা হলো ইহুদী, নাসারা এবং পৌত্তলিক। তারা নিজেদের মোমেন পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে খেল তামাশায় পরিণত করেছে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে (১) দ্বীন ইসলাম যা তাদের জন্যে সত্য ধর্ম হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যারা তাকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং এ সত্য ধর্ম সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন, যারা তাকে উপহাস করেছে, তাদের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করা মোমেন মাত্রেরই কর্তব্য।

(২) যারা প্রকৃত এবং সত্য দ্বীনকে পরিহার করে নিজেদের ধর্মকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে।[১]

অতএব, যারা প্রকৃত এবং সত্য দ্বীনকে পরিহার করে নিজেদের ধর্মকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে তাদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করা কর্তব্য। তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন, দ্বীন ইসলামের কোন বিধানকে উপহাস করা, মূর্তিপূজা করা, খেল-তামাশার জন্যে দু' ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করা, এমনিভাবে খেল-তামাশাকে দ্বীন মনে করা অথবা নামায রোযার ন্যায় একান্ত করণীয় কাজের ব্যাপারে গাফলত করা অথবা সুদ, ঘুষ, জুয়া, পরচর্চা প্রভৃতি পাপাচারকে সাধারণ এবং সামান্য মনে করা, এমনিভাবে তাকওয়া পরহেযগারীকে অপ্রয়োজনীয় কাজ মনে করা এবং যা শরীয়তে নেই এমন কাজকে শরীয়তের বিধান মনে করা তথা অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করা- এসবই আলোচ্য আয়াতের আওতায় আসে।[২]

আলোচ্য আয়াতে উপরোল্লিখিত সমস্ত অন্যায় কাজ বর্জন করার নির্দেশ রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ যারা উপরোল্লিখিত পাপাচারে লিপ্ত হয় তাদেরকে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন প্রতারিত করেছে।

এ জীবন ও জগৎ ক্ষণস্থায়ী

তারা মনে করেছে এ জীবন ও জীবনের যাবতীয় সম্পদ ও শক্তি, এখানকার ঐশ্বর্য এবং তার প্রাচুর্য সবই বুঝি চিরস্থায়ী কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়; বরং জীবন ও জগতের সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান যখন মানুষের জীবনের অবসান ঘটায়, যখন পরকালীন জিন্দেগীর সূচনা হয় সমাধিস্থ হওয়ার মাধ্যমে তখন এখানকার সব কিছুই বিদায় নেয়, সব সত্যই মিথ্যায় পরিণত হয়, তখন মানুষ মাত্রকে আক্ষেপ করতে হয় এই বলে, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

"হায়! যদি এ জীবনের জন্যে কিছু করে পাঠাতাম, তবে কত ভালো হতো"! যাহোক, আলোচ্য আয়াতে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

১. যারা তাদের ধর্মকে খেল–তামাসায় পরিণত করেছে এবং এ পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে তাদের সংসর্গ বর্জন কর।

১। তানবীরুল মেকাবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১২
২। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৬০৮-০৯

২. তাদেরকে পবিত্র কোরআন দ্বারা নছিহত কর কেননা, তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণামে এমন শাস্তি ভোগ করবে যে তারা তখন চোখে পথ দেখতে পাবে না। চারিদিকে অন্ধকার দেখা দেবে। কেননা, অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

(সূরা মুদ্দাস্যের)

অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ

"প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে যে সে কি নিয়ে এসেছে"।

সেই কঠিন মুহূর্তে কোন সাহায্যকারী, সুপারিশকারী পাওয়া যাবে না।

وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ

এমনকি, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে যদি কেউ মুক্তি পেতে চায় তবে তা-ও সম্ভব হবে না।

অর্থাৎ তাদের থেকে মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না এবং তারা মুক্তি লাভও করবে না।

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا

অর্থাৎ এরাই সে সব লোক যারা তাদের কৃতকর্মের কারণে ধৃত হবে, তাদের জন্যে অত্যন্ত উষ্ণ পানীয় এবং মর্মান্তিক আযাব রয়েছে যা তাদের কুফর ও নাফরমানীর বিনিময়ে তারা ভোগ করবে।

মন্দ সংসর্গ বর্জনীয়

এ আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে, যারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় অথবা আখেরাতের জিন্দেগীর ব্যাপারে গাফেল থাকে তাদের সংসর্গ বর্জন করা কর্তব্য। এ আয়াত সমূহে মুসলমানদেরকে মন্দ সংসর্গ থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে কেননা, মন্দ লোকের সংসর্গ বিষাক্ত। দুনিয়ার ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, পৃথিবীতে অনেক অপরাধের অন্যতম কারণ হয় মন্দ বা কু-সংসর্গ। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মানুষ যখন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তখন তার বিবেক তাকে দংশন করে তখন সে মন্দ কাজ পরিহার করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যখন মন্দ কাজ তার অভ্যাসে পরিণত

হয় তখন মন্দ কাজ যে মন্দ তার অনুভূতিও লোপ পায়। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি সর্ব প্রথম গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো চিহ্ন পড়ে যেমন সাদা কাপড়ে কালো দাগ। এ সময় গুনাহ্‌র কাজ তার অন্তরে অসহনীয় মনে হয়।

কিন্তু যখন একের পর এক গুনাহ হতেই থাকে আর এ কারণে অন্তরে কালো দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিণামে সে ব্যক্তি ভাল মন্দের মধ্যে আর পার্থক্য করেনা; বরং ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতাই সে হারিয়ে ফেলে।

অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলা যায় যে, মানুষকে এ অবস্থায় পতিত হতে হয় বিশেষভাবে মন্দ সংসর্গের কারণে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মন্দ সংসর্গ পরিহার করার নির্দেশ দান করেছেন।

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ
عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى
الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ
هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

তরজমা

(৭১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমরা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের ভালও করতে পারেনা মন্দও করতে পারেনা? আল্লাহ পাক আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এরপরও কি আমরা সে ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান দুনিয়াতে দিশেহারা করে হয়রান করেছে। সে তখন হয়েছে কিং কর্তব্যবিমূঢ়। তার সঙ্গীরা তাকে সঠিক পথের দিকে ডেকে বলে, আমাদের কাছে চলে এসো। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ আর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের নিকট আত্মসমর্পণ করি।

(৭২) আর আমাদেরকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সঠিকভাবে নামায কায়েম করবে এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে চলবে আর তিনিই তো সেই আল্লাহ যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে।

(৭৩) তিনিই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন সঠিকভাবে এবং সেদিনকেও যেদিন বলবেনঃ 'হও' ফলে তা হবে। তাঁর কথাই সত্য আর (স্মরণ কর) সেদিনকে যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিনকার রাজত্ব এবং কতৃত্ব শুধু তাঁরই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবগত। আর তিনিই প্রজ্ঞাময় এবং সব বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পৌত্তলিকরা মুসলমানদেরকে বলেছিলো, দ্বীন ইসলাম ছেড়ে দাও এবং আমাদের দলে ফিরে আসো। তাদের একথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদের দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, পৌত্তলিকরা এমন কিছুর নিকট মাথা নত করে যা তাদের উপকার, অপকার বা ভালো মন্দ কিছুই করতে পারেনা। এটি নির্বুদ্ধিতা এবং নিতান্ত মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, হাতে বানানো মূর্তি অথবা পাথর অথবা বৃক্ষ প্রভৃতিকে কেউ উপাস্য মনে করবে, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

(হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে বলুন, তবে কি আমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের উপকারও করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা? যখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়েত করেছেন, সত্য দ্বীনের, মানবতার কল্যাণের তথা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তৌফিক দিয়েছেন, তখন আমাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে পুনরায় গোমরাহীর দিকে ফিরে যাওয়া। একথা অবাস্তব, অসম্ভব, অচিন্তনীয়। যে একবার ঈমানের পথ পেয়েছে, যে সরল সঠিক পূণ্য পন্থার সন্ধান পেয়েছে, যে তৌহীদের উপর বিশ্বাস করেছে, সে পুনরায় শেরক ও পৌত্তলিকতার দিকে ফিরে যেতে পারেনা। হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্ঠ এবং সর্ব হারা হতে পারে না।

আল্লাহ না করুন, যদি কখনো কারো ভাগ্য মন্দ হয় সে হেদায়েতের রাজপথ ছেড়ে দিয়ে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় তার দশা হবে সে ব্যক্তির ন্যায় যাকে মাঠে ময়দানে ভূত প্রেত পেয়েছে, তাকে পথহারা এবং দিশেহারা

করেছে। সে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দিশেহারা অবস্থায় ঘোরাফেরা করছে, তাকে তার আপনজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সে পথভ্রষ্ঠ এবং বিপথগামী হয়েছে। তার বন্ধু-বান্ধব তাকে সঠিক পথের দিকে ডাকলেও তাদের ডাকে সে সাড়া দিতে পারেনি এমনি অবস্থায় তার ধ্বংস অনিবার্য, তার বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

বস্তুতঃ পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর মুসাফিরদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপই। কেননা, ইসলাম তথা তৌহীদের প্রতি ঈমানই হলো আখেরাতের মুসাফিরের সঠিক পথ, যে এ পথ হারালো সে ধ্বংসের পথ গ্রহণ করলো। আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ব্যতীত কোন মানুষ আখেরাতে নাজাত পাবে না। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না। শেরক ব্যতীত অন্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করতেও পারেন"।

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেন ঃ

وَالْعَصْرِ۞ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ..........

"সময়ের শপথ! সমগ্র মানব জাতি ক্ষতিগ্রস্ত, তবে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সে ঈমান মোতাবেক নেক আমল করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়"।

তৌহীদের প্রতি দাওয়াত দিতেই আগমন করেছেন সকল আম্বিয়া এবং রসূলগণ। অবশেষে আবির্ভাব হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইমামুল আম্বিয়া হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের।

তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানব জাতির নিকট। অনাগত ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে, সকলের নিকটই তাঁর পয়গাম পৌঁছবে। তিনি মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করে সৎ কাজে মশগুল হয়ে, পাপাচার পরিহার করে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন।

যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা ভাগ্যবান হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে, শয়তানের কবলে পড়ে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, পথভ্রষ্ঠতার তেপান্তরে দিশেহারা হয়ে ঘোরাফেরা করেছে, তারা সঠিক পথ কখনও পায়না এমনকি আপনজনদের দরদ-ভরা ডাক তাদের মনে দাগ কাটেনা তাই তারা সঠিক পথের

দিকে আসেনা, তারা বিরোধিতা করে শান্তি-দূত, মুক্তি-দূত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের।

অতএব, হে পথভ্রষ্ঠ পৌত্তলিক সম্প্রদায়! তোমরাই বলো আমরা কিভাবে সত্যকে পরিত্যাগ করে মিথ্যাকে গ্রহণ করতে পারি? কিভাবে হেদায়েতকে বাদ দিয়ে পথভ্রষ্ঠতাকে গ্রহণ করতে পারি, তোমরা ধ্বংসের পথ ধরেছ, আমরা সে পথে যেতে পারি না।

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকের প্রদর্শিত পথই সরল সঠিক পথ, হেদায়েতের পথ, চির শান্তি, চির নাজাতের পথ। আর আমাদের প্রতি আদেশ রয়েছে যেন আমরা সর্ব শক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। কেননা, এতেই রয়েছে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ। আর এটিই হলো মানবতার উৎকর্ষ সাধনের, মানুষের শান্তি ও মুক্তির পথ। তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে

حَيْرَانَ

শব্দ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা বাতিল পন্থী, যারা পথহারা, যারা মুশরেক বা পৌত্তলিক তাদের মনে শান্তি থাকেনা। মনের শান্তি আত্মবিস্মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা তাঁর স্মরণ ব্যতীত শান্তি লাভের কথা চিন্তাও করা যায় না। তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"সতর্ক হও! আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যমেই মানব মন শান্তি লাভ করে"। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে ভুলে থাকে, তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, তারা সর্বদা অশান্তিতে কাল যাপন করে। তাদের ভাগ্যে শান্তি জোটেনা। শান্তির মালিকের সঙ্গে যারা আড়াআড়ি করে শান্তির বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, শাস্তি তাদের অবধারিত, অশান্তি তাদের প্রাপ্য।[১]

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

আর আমাদের প্রতি এ আদেশও হয়েছে, যে তোমরা নামায কায়েম কর এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক। নামায হলো ইসলামের খুঁটি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে নামায সঠিকভাবে আদায় করে না, সে যেন ইসলামের খুঁটিকে বিনষ্ট করে দেয়। আর আল্লাহর ভয় হলো

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৭৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৬

ইসলামের মূল শিক্ষা। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাককে ভয় করার তথা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার তাগিদ রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত হওয়া আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়া নির্ভর করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণের উপর। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণী হলো আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করি, যেন আমরা আল্লাহ পাকের অনুগত হতে পারি, তাঁর সান্নিধ্য, নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

এর পাশাপাশি একথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবশেষে তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

অর্থাৎ তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েমের আদেশের মাধ্যমে সকল প্রকাশ্য এবাদতের প্রতি তাগিদ করা হয়েছে আর আল্লাহকে ভয় করার আদেশের মাধ্যমে আত্ম সংশোধন ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১]

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি সঠিক ভাবে সৃষ্টি করেছেন আসমান জমীনকে, তিনি সর্বশক্তিমান। হাশরের দিনকে যখন তিনি বলবেন, "হও" তখন তা অনতিবিলম্বে হয়ে যাবে। সেদিন তাঁর কর্তৃত্ব ব্যতীত কারো কর্তৃত্ব থাকবে না। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করবেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

আজকের দিনের কর্তৃত্ব কার? আর নিজেই জবাব দেবেন–

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

এক আল্লাহ্ পাকের যিনি প্রবল পরাক্রমশালী। কেয়ামতের কঠিন দিন সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৭

"সেদিন একের জন্যে অপরের কিছু করার সামর্থ্য থাকবেনা, সমস্ত কর্তৃত্ব হবে এক আল্লাহ্ পাকের"।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

(সূরা তারেক)

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন গোপন বিষয় সমূহ পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন শক্তি সামর্থ্য থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও নয়"।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ

(সূরা আবাসা)

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে এবং তার মাতা ও পিতা থেকে, তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে"।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ

(সূরা আবাসা)

"সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে"।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

(সূরা নাবা)

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে আর কাফেররা বলবে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম"।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

(সূরা কেয়ামা)

"সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে থাকবে তাকিয়ে, আর কোন কোন মুখমন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ"।

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمُسْتَقَرُّ

(সূরা কেয়ামা)

"সেদিন মানুষ বলবে, আজ পলায়নের স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়-স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট"।

এমনিভাবে আরো বহু আয়াতে কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা ভয় কর সেদিনকে যেদিন আল্লাহ পাক كُنْ তথা "হও" বললে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টি জগত অস্তিত্ব লাভ করবে। হাশরের দিন অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ পাকের আদেশের পর এক মুহূর্তও বিলম্ব হবেনা এবং সমগ্র মানব জাতিকে তার জীবনের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশের জন্যে দন্ডায়মান হতে হবে।[১]

قَوْلُهُ الْحَقُّ ط وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ

(তাঁর কথা সত্য আর সমস্ত কর্তৃত্ব শুধু তাঁরই। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।)

'তাঁর কথা সত্য' একথার তাৎপর্য হলো তিনি যা বলেন তাই হয়, তাঁর কোন কথার ব্যতিক্রম হয় না এবং কেউ তাঁর কোন কথা পরিবর্তন করতে পারে না।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তিনি "কুন" বলে যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর যা হয় তা হেকমত পূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ হয়।

আসমান জমীনে কোন কিছুই তাঁর হেকমত ব্যতীত ঘটেনা।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি 'ছুর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ এটি হলো শিঙ্গা যাতে কেয়ামতের দিন ফুঁক দেয়া হবে।

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া প্রসঙ্গে

আবুশ্ শেখ, এবনে হাব্বান "কেতাবুল আজমতে" ওহাব এবনে মোনাব্বেহ'র সূত্রে লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক শিঙ্গাকে সাদা, চমকদার মুক্তা দিয়ে তৈরী করেছেন, এরপর আরশকে হুকুম দিয়েছেন, শিঙ্গাকে ধর। সাথে সাথে আরশের সঙ্গে শিঙ্গা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেল। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, كُنْ (হও) তখন সঙ্গে সঙ্গে ইসরাফিল (আঃ) পয়দা হলেন। আল্লাহ পাক ইসরাফিল (আঃ)-কে আদেশ দিলেন। শিঙ্গা তুলে নাও। ইসরাফিল (আঃ) তাই করলেন। পৃথিবীতে যত প্রাণ এসেছে এবং আসবে তার সংখ্যার সমান ছিদ্র রয়েছে শিঙ্গায়। কেননা, দু'টি রূহ একটি ছিদ্র দিয়ে বের হবে না।

আসমান জমীনকে গোলাকার করলে যত বড় হবে তত বড় স্থান রয়েছে শিঙ্গার মাঝখানে। ইসরাফিল (আঃ) সেখানেই তাঁর মুখ রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক ইসরাফিল (আঃ)-কে বলেছেন, আমি তোমাকে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছি।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৯

তাই ইসরাফিল (আঃ) আরশের সম্মুখ ভাগ দিয়ে প্রবেশ করে তাঁর ডান পা আরশের নীচের দিকে এবং বাম পা সম্মুখের দিকে বাড়িয়ে রেখেছেন। জন্ম লাভের পর থেকে কখনো তিনি চোখের পলক পর্যন্ত ফেলেননি, আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছেন।

আহমদ এবং তেরবানী উত্তম সনদের সাথে হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি যখন শিঙ্গাওয়ালা ফেরেশতা শিঙ্গায় মুখ দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে এবং কান লাগিয়ে অপেক্ষা করছে যে, কখন তাকে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। একথা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা বল ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

(আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক।)

এভাবে উপরোক্ত বিবরণটি আহমদ, আর হাকেম তাঁর মোস্তাদরাকে এবং বায়হাকী আল বা'সে এবং তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের সূত্রে উপস্থিত করেছেন। ঐ বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা বল ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

"আল্লাহ পাক আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক, আমরা তাঁর প্রতিই ভরসা করি"।

তিরমিযী, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং আবু নাঈম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বাজ্জার এবং হাকেম হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যহ দু'জন ফেরেশতা যারা শিঙ্গার দায়িত্বে রয়েছেন তারা অপেক্ষা করছেন যে কখন হুকুম হয় এবং তারা শিঙ্গায় ফুঁক দেন।

এবনে মাজাহ এবং বাজ্জার এ বিবরণকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু'জন ফেরেশতার হাতেই দু'টি শিঙ্গা রয়েছে। তারা উভয়েই অপেক্ষা করছেন, কখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আদেশ আসে।

হাকেম হযরত এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী উভয়

ফেরেশতা দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন। একজনের মাথা প্রাচ্যে এবং পা প্রতীচে। আর দ্বিতীয় জনের মাথা প্রতীচ্যে এবং পা প্রাচ্যে। তারা উভয়ে অপেক্ষা করছেন কখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার হুকুম আসে আর তারা শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। এ বর্ণনা সমূহ দ্বারা একথা বোঝা যায় যে শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন, তাদের নিকট দু'টি শিঙ্গা রয়েছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে এবনে জরীরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ সঠিক হলো এই যে, শিঙ্গায় হযরত ইসরাফিল (আঃ) নিজেই ফুঁক দেবেন। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইসরাফিল (আঃ) অপেক্ষা করছেন কখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আদেশ আসে।

কেয়ামতের পূর্বে যা ঘটবে

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক আসমান জমিনের সৃষ্টি সুসম্পন্ন করার পর শিঙ্গা সৃষ্টি করলেন এবং ইসরাফিলকে তা দিলেন। যিনি তাতে মুখ লাগিয়ে মহান আরশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আদেশ হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! "ছুর" কি?

তিনি বললেন, তা হলো একটি শিঙ্গা। আরজ করলাম তা কেমন? তিনি এরশাদ করলেনঃ অনেক বড়। আল্লাহর শপথ! যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, জমীন আসমান গোলাকার করলে যত বড় হবে শিঙ্গার প্রস্থ তত বড়। শিঙ্গায় তিন বার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁক হবে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্যে আর দ্বিতীয় ফুঁক হবে বেহুশ করার জন্যে আর তৃতীয় বার ফুঁক দেয়া হবে আল্লাহ পাকের দরবারে একত্রিত হওয়ার জন্যে।

আল্লাহ পাক যখন সর্ব প্রথম শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আদেশ দেবেন তখন সারা পৃথিবীর মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তবে যাকে আল্লাহ পাক ঠিক অবস্থায় রাখেন তার কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়ার আদেশ না আসা পর্যন্ত ফুঁক অব্যাহত থাকবে, বন্ধ হবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে রয়েছেঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

(সূরা নাযেআত)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৬৬-৬৭

"সেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে, তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গা ধ্বনি সেদিন কত হৃদয় সন্ত্রস্ত হবে, তাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে"।

এরপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন মানুষ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে, মায়েরা তাদের দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের ভুলে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। কিশোর যুবকরা ভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। শয়তানরা আত্মরক্ষার্থে পৃথিবীর এক প্রান্তে পলায়ন করবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ তাদেরকে প্রহার করে ফেরত নিয়ে আসবেন। তারা একে অন্যকে ডাকবে কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারবেনা। মানুষ চরম ভয়ে থাকবে। এদিকে জমিন চতুর্দিক থেকে ফেটে যেতে লাগবে। এমন বিপদ দেখা দেবে যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। মানুষ কতবড় বিপদে পড়বে তা এক আল্লাহ পাকই জানেন। মানুষ আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে, দেখবে আসমানের অংশ উড়ছে। নক্ষত্রপুঞ্জ ভেঙ্গে পড়ছে।

সূর্য এবং চন্দ্রের আলো নিস্প্রভ হয়ে যাবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কিন্তু যারা মৃত তাদের এসব খবর হবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

"আসমানে জমিনে যারা আছে সকলেই সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে তবে যাকে আল্লাহ পাক বিপদ থেকে রক্ষা করবেন"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ আল্লাহ পাক কাকে সেদিন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তারা হলেন শহীদগণ। সেদিন যারা জীবিত থাকবে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, শহীদগণ জীবিত থাকলেও তারা আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে রিয্ক দান করেন। আর আল্লাহ পাক সেদিনের ভয় ভীতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন কেননা, এটি হবে আল্লাহর আযাব আর আযাব হয় পাপীষ্ঠ লোকদের জন্যে। একথাটিকে আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ.........

وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

(সূরা হজ্জ্ব)

"হে মানব জাতি! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন এক মহা ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা দেখবে যে প্রত্যেক স্তন্যদানকারিনী মা ভুলে যাবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার

গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন"।

আর এ অবস্থা সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, এরপর আল্লাহ্ পাক ইসরাফিলকে (আঃ) পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার আদেশ দেবেন। ইসরাফিল শিঙ্গায় ফুঁক দিলে আসমান জমীনের সমস্ত অধিবাসী তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে। তবে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের মর্জি হবে সে হুশ বহাল থাকবে।

মালাকুত মওত হযরত আজরাঈল (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয়ে বলবেন, হে আল্লাহ! সব মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক সবই জানেন, তবু জিজ্ঞাসা করবেন, বাকি আছে কে? আজরাঈল (আঃ) আরজ করবেন, তুমি আছ, মৃত্যু কোন দিন তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং জিব্রাঈল ও মিকাঈল বাকি রয়েছে। আর আমিও রয়েছি।

তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ জিব্রাঈল ও মিকাঈলের মৃত্যু হওয়া উচিত। তখন আরশ আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! জিব্রাঈল, মিকাঈলও মৃত্যু মুখে পতিত হবে? তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, কথা বলোনা, আরশের নিচে যারা আছে সকলকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। এরপর মালাকুল মওত আরজ করবেনঃ হে পরওয়ারদেগার! জিব্রাঈল এবং মিকাঈলও মৃত্যুবরণ করেছে।

আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, এখন কে বাকি আছে? আজরাঈল (আঃ) আরজ করবেনঃ হে আল্লাহ! তুমি আছ, কিন্তু মৃত্যু তোমার নিকট আসবেনা, আর আমি এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ বাকি রয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হতে হবে। তখন তাদেরও মৃত্যু হবে। আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেনঃ এখন কে বাকি আছে? হে আল্লাহ! তুমি আছ, কিন্তু কখনও তোমার মৃত্যু আসবেনা। আর আমি আছি। আল্লাহ্ পাক আরশকে আদেশ দেবেন, ইসরাফীল থেকে শিঙ্গা নিয়ে নাও। আর ইস্রাফিলকে বলবেন, তুমিও সৃষ্টি অতএব, তুমিও মরে যাও, আর তখনই ইস্রাফিলের মৃত্যু হবে। আর এরপর এক আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জীবিত থাকবে না।

এরপর আসমান জমিনকে গুটিয়ে ফেলা হবে, যেভাবে তাবিজের কাগজকে ভাঁজ করা হয়, পৃথিবী ও আসমানকে এভাবে তিনবার খোলা হবে এবং তিনবার গুটানো হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি জব্বার, আমি জব্বার, আমি জব্বার, (তিন বার এ বাক্যটি উচ্চারণ করবেন) এরপর এরশাদ করবেনঃ "আজ কার কর্তৃত্ব"? কিন্তু জবাব দেয়ায় জন্যে কেউ থাকবেনা, তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ

"আজকের ক্ষমতা এক আল্লাহ্ পাকের, যিনি প্রবল পরাক্রমশালী" এরপর তিনি অন্য আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করবেন এবং তাকে ছড়িয়ে দেবেন, বিস্তৃত করবেন। তাতে কোন ত্রুটি থাকবেনা। এরপর একটি ভয়ানক আওয়াজ হবে তখন নতুন সৃষ্ট

জমিন পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। যা জমিনের অভ্যন্তরে ছিল তা সেখানেই থাকবে আর যা জমিনের বাইরে ছিলো তাও বাইরে থাকবে। এরপর আল্লাহ্ পাক আরশের নিম্নদেশ থেকে পানি নাযিল করবেন। আসমানকে তিনি হুকুম দেবেন বৃষ্টিপাতের জন্যে। একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকবে, এমনকি জমিনের উপরে বারো গজ পানি জমে যাবে। এরপর দেহ্ সমূহকে হুকুম করা হবে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্যে, যেভাবে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়, ঠিক তেমনি দেহগুলো পূর্বের ন্যায় জীবন লাভ করবে। সর্বপ্রথম আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণকে জীবিত করবেন।

এরপর আল্লাহ পাক ইস্রাফীলকে হুকুম দেবেন যে, শিঙ্গা নিয়ে নাও। ইস্রাফীল শিঙ্গা হাতে নেবেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর আদেশ ক্রমে জীব্রাঈল ও মীকাঈলকে জীবিত করবেন। এরপর সমস্ত রূহকে ডাকা হবে। মুসলমানদের রূহ নূরের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। আর কাফেরদের রূহ অন্ধকার হবে। সমস্ত রূহকে শিঙ্গায় ফেলে দেয়া হবে। এরপর ইস্রাফীলকে আদেশ করা হবে, মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দিতে, এ ফুঁক হবে পুনর্জীবনের ফুঁক। তখন মধু মক্ষীকার ন্যায় রূহগুলো দ্রুত এগিয়ে আসবে। আসমান জমিন সে রূহ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এরপর হুকুম হবে রূহ সমূহ্ যেন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সমস্ত রূহ দেহে প্রবেশ করবে। এরপর জমিন ফেটে যেতে থাকবে এবং মানুষ জমিনের অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে শুরু করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম আমার কবরের মাটি ফাটবে। এরপর সমস্ত লোক আল্লাহ্ পাকের দরবারে একত্রিত হবে। কাফেররা বলবে, "এদিন তো অত্যন্ত কঠিন মনে হয়"। মানুষ তখন নগ্ন থাকবে।

সমস্ত মানুষ একই স্থানে দন্ডায়মান হবে। এমনি অবস্থায় সত্তর বছর অতিবাহিত হবে। আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না এবং তাদের কোন ফয়সালাও করবেন না। মানুষ ক্রন্দন করতে থাকবে, হাহাকার ও আর্তনাদ করতে থাকবে এমনকি, শেষ পর্যন্ত তাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু শেষ হওয়ার পর রক্ত প্রবাহিত হবে। মানুষ তখন তার দেহের ঘামে ডুবে যাবে। চিবুক পর্যন্ত ঘাম পৌছবে। তখন লোকেরা বলবে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সুপারিশের জন্যে সচেষ্ট হওয়া উচিত যাতে করে কোন একটা ফয়সালা হয়।

এরপর মানুষ পরস্পর বলতে থাকবে আদম (আঃ) ব্যতীত আর কে আছে যে আজ আল্লাহ্ পাকের দরবারে কথা বলতে পারেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে স্বহস্তে তৈরী করেছেন। তাঁর দেহে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম কথা বলেছেন। তখন লোকেরা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট হাযির হবে এবং তাঁর নিকট নিজেদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করবে।

কিন্তু তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করতে অস্বীকৃতি জানাবেন। তিনি বলবেন আমি এর যোগ্য নই, এরপর একেক জন নবীর নিকটে লোকেরা যাবে কিন্তু যাঁর কাছেই যাবে তিনিই সুপারিশ করতে অস্বীকৃতি জানাবেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এরপর লোকেরা আমার নিকট আসবে। আমি সুপারিশ করার জন্যে যাবো এবং (ফোহোস) নামক স্থানে সেজদা রত হবো। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ফোহোস কি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আরশের সম্মুখ ভাগ।

তখন আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। তিনি আমার বাজু ধরে উঠাবেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি কি চাও? আমি আরজ করবোঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে শাফাআতের সুযোগ দেয়ার অঙ্গীকার করেছ। আমাকে সে সুযোগ দান কর এবং মানুষের ব্যাপারে ফয়সালা করে দাও।

আল্লাহ পাক আদেশ করবেনঃ হ্যাঁ তুমি সুপারিশ করতে পার। আমি মানুষের ব্যাপারে ফয়সালা করবো।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এরপর আমি ফিরে এসে সকল মানুষের সাথে দণ্ডায়মান হবো। আমরা দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবো, এমন সময় আসমান থেকে একটি বিকট শব্দ হবে, আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হবো, এরপর পৃথিবীর সমস্ত জ্বীন ও মানুষের দ্বিগুণ সংখ্যক ফেরেশতা নাযিল হবে, তারা জমিনের নিকট চলে আসবে। জমিন তাদের নূরে আলোকময় হবে। তারা কাতার বন্দী হবেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করবো আল্লাহ পাক কি তোমাদের মাঝে আছেন? তারা বলবেন– না তবে তিনি আগমন করবেন।

দ্বিতীয়বারও আসমান থেকে ফেরেশতাগণ অবতরণ করবেন, পূর্বে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের দ্বিগুণ হবে তাদের সংখ্যা। আর জ্বীন ও মানব জাতিও সংখ্যায় দ্বিগুণ হবে। জমিন তাদের নূরে চমকে উঠবে। তারা অতি সুন্দর সুশৃংখল ভাবে দণ্ডায়মান হবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করবো আল্লাহ পাক কি তোমাদের মাঝে রয়েছেন? তারা বলবেন–না তবে তিনি আগমন করবেন।

এরপর তৃতীয় বার পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ ফেরেশতা অবতরণ করবেন। এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের আবির্ভাব হবে, আটজন ফেরেশতা তাঁর সিংহাসন বহনকারী হবে। অথচ বর্তমানে তাঁর সিংহাসন বহনকারী ফেরেশতা হলেন চারজন। তাদের পায়ের শেষ ভাগ জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। জমিন এবং আসমান আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দেহের অর্ধেকের মোকাবেলায় হবে। তাদের স্কন্ধে আল্লাহ পাকের আরশ থাকবে। তাদের রসনায় থাকবে আল্লাহ পাকের তসবীহ এবং হাম্‌দ। তারা বলবেন ঃ

سُبْحَانَ ذِى الْعَرْشِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوْتُ

এরপর আল্লাহ পাক তাঁর মহান সিংহাসনে আত্মপ্রকাশ করবেন। একটি আওয়াজ হবে, হে জ্বীন ও মানব জাতি! আমি যখন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত নীরব ছিলাম। তোমাদের সকল কথা শ্রবণ করেছি। তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেছি। এখন তোমরা নীরব হও, তোমাদের আমলনামা শ্রবণ করানো হবে, যদি তা ভাল প্রমাণিত হয় তবে আল্লাহর শোকর আদায় কর, আর যদি মন্দ প্রমাণিত হয় তবে নিজেদেরকেই তিরষ্কার কর। এরপর আল্লাহ পাক জাহান্নামকে আদেশ দেবেন, তখন একটি অতি অন্ধকারময় আকৃতি প্রকাশ পাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ........هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

"হে বণী আদম! আমি কি তোমাদেরকে আদেশ দেইনি? যে তোমরা শয়তানের উপাসনা করোনা। সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর। এটিই সরল সঠিক পথ। এ শয়তান তোমাদের অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে। তোমরা কি তা বুঝতে পারোনি? এ হলো সেই জাহান্নাম যার সম্পর্কে তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছে"।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

"হে পাপীষ্ঠের দল! তোমরা নেককার লোকদের থেকে দূরে সরে যাও"।

এরপর আল্লাহ পাক উম্মত সমূহকে আলাদা করে দেবেন। আল্লাহ পাকের এরশাদ হলোঃ হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি উম্মত সমূহকে অধঃমুখী হয়ে পড়ে থাকতে দেখবেন। প্রত্যেক উম্মতের নিকট তাদের আমলনামা থাকবে এবং আজ প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের বিনিময় পাবে।

এখন আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ফয়সালা শুরু করবেন। কিন্তু জ্বীন এবং মানব জাতির ফয়সালা এখন হবে না। এখন জংলী ও চতুঃস্পদ জন্তুদের মধ্যে

ফয়সালা করবেন। একটি অত্যাচারী শিং বিশিষ্ট বকরী অন্য বকরীর প্রতি জুলুম করেছে, সে বকরী থেকে মজলুম বকরীর বদলা নিয়ে দেবেন। ঠিক এভাবে সকল জানোয়ারদের মধ্যে ফয়সালা যখন শেষ হবে তখন আল্লাহ পাক আদেশ করবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও (তখন সবই মাটি হয়ে যাবে)। এ সময় কাফেররা বলবেঃ

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

(সূরা নাবা)

"হায় আক্ষেপ! যদি আমরাও মাটি হয়ে যেতাম (আর আযাব থেকে রক্ষা পেতাম)"।

যাহোক, এরপর আল্লাহর বন্দাদের মধ্যে ফয়সালা শুরু হবে। সর্ব প্রথম হত্যাকান্ডের মোকদ্দমা পেশ করা হবে।[১]

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আলোচ্য আয়াতে "গায়ব" অর্থ যা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি। আর শাহাদাত অর্থ যা অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর যা অস্তিত্ব লাভ করেছে তা সবই আল্লাহ পাকের সম্মুখে রয়েছে। আসমান জমিনের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

আর তিনি বিজ্ঞানময় এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকেফহাল অর্থাৎ যাকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন তার হেকমত সম্পর্কে তিনি অবগত। আর যাকে অস্তিত্ব দান করেননি তার মধ্যে কি হেকমত রয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত। আর সমগ্র সৃষ্টি জগতের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্য দুটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তিনিই "হাকীম" অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি আদেশ হেকমতপূর্ণ। তাঁর প্রতিটি কাজ তাৎপর্যবহ। আর "খাবির" অর্থ হলো সৃষ্টি জগত সম্পর্কে এবং তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত।[৩]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০
২ তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৮
৩ তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১১৩

وَاِذْ قَالَ
اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا
رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ
هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ
اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ
فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

তরজমা

(৭৪) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন, আপনি কি মূর্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেন? আমি আপনাকে ও আপনার জাতিকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় দেখছি।

(৭৫) এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আসমান এবং জমিনের পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৭৬) এরপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন সে নক্ষত্র দেখতে পেলো। বললো, এ-তো আমার প্রতিপালক। এরপর যখন তা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন সে বললো, আমি তো অদৃশ্যগামীদের পছন্দ করি না।

(৭৭) আবার যখন চন্দ্রকে উদ্ভাসিত হতে দেখলো তখন বললো, এ যে আমার প্রতিপালক। পরে যখন তা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে পথ না দেখান তবে আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

(৭৮) আবার যখন সে সূর্যকে উদ্ভাসিত হতে দেখলো তখন বললো, এ যে আমার প্রতিপালক, সবার মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরে যখন তা-ও অদৃশ্য হয়ে গেলো তখন বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাদের শরীক করছো তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(৭৯) নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠ ভাবে শুধু তাঁর দিকেই মুখ ফিরিয়েছি যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন আর আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরু থেকেই তৌহীদের সত্যতা এবং শেরকের বাতুলতা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ আয়াতেও তৌহীদ সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সম্মান করতো এবং তাঁর বংশধর হওয়ার কারণে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করতো। আর যেহেতু তিনি মানব জাতিকে তৌহীদের প্রতি আহবান করেছেন এবং তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ব পুরুষ, আর তাঁর দ্বারাই আল্লাহ পাক পবিত্র কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়েছেন, তাই তাঁর ফজিলত এবং উচ্চ মর্তবা সর্বজন স্বীকৃত। কী মুসলিম কী মুশরেক, কী ইহুদী নাসারা সকলেই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যেন মুশরেকদের সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ হয়।[১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় মূর্তি পূজার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রের পূজাও করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল জীবন ও মৃত্যু, সৌভাগ্য–দুর্ভাগ্য, সাফল্য-অসাফল্য, জয়-পরাজয় এসবের ব্যাপারে নক্ষত্রপুঞ্জের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই তাদের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের পূজা জরুরী। তাদের মধ্যে কেউ মূর্তি পূজা করতো, আর কেউ নক্ষত্রকে তাদের ভাল-মন্দের নিয়ামক মনে করে পূজা করতো।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের এ বাতিল আকীদার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেনঃ তোমরা স্বহস্তে যা তৈরী কর এরপর তারই পূজা কর, এর চেয়ে বড় মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতা আর কি হতে পারে! তিনি তাঁর পিতাকে তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন এবং বললেন, হে আমার পিতা! কেন এমন বস্তুর পূজা কর যা তোমাদের কথা শ্রবণ করেনা, তোমাদেরকে দেখতে পায় না এবং তোমাদের কোন উপকারও করতে পারেনা।

এরপর তিনি নক্ষত্রপুঞ্জের পূজার বাতুলতা ঘোষণা করে বললেনঃ যেভাবে তোমাদের হাতে তৈরী মূর্তি পূজা করার যোগ্য নয়, ঠিক তেমনি নক্ষত্রপুঞ্জও

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড–২, পৃষ্ঠা-৪৮৪

মানুষের বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এ নক্ষত্রপুঞ্জ একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরই বিদায় গ্রহণ করে। আর যা বিদায় গ্রহণ করে তা কোন অবস্থাতেই মানুষের উপাস্য হতে পারেনা। এ নক্ষত্রপুঞ্জ আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ পাক এগুলোর জন্যে যে বিধান দিয়েছেন তার বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতাই তাদের নাই। এমন অবস্থায় তাদেরকে উপাস্য মনে করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ

আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা আজরকে বলেছিলেন, যে মূর্তিগুলোকে তোমরা স্বহস্তে তৈরী কর তাদেরকে উপাস্য বলে মেনে নেয়া পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম

আলোচ্য আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম আজর বলা হয়েছে। তাঁর বংশ পরিচয় এভাবে রয়েছেঃ ইব্রাহীম (আঃ) (খলিলুল্লাহ) এবনে তারেখ এবনে নাহোর এবনে সরজ এবনে রাউ এবনে ফালেহ এবনে বের এবনে আরফেকশাজ এবনে সাম এবনে নূহ (আঃ)।[১]

যেহেতু তৌরাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা নাম 'তারেখ' লেখা হয়েছে আর পবিত্র কোরআনে রয়েছে আজর তাই এ সম্পর্কে তফসীর বিশেষজ্ঞগণ দু'টি পথ অবলম্বন করেছেন।

১. এমন কোন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যা দ্বারা এ মতভেদ দূর হয় এবং দু'টি নামের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

২. গভীরভাবে গবেষণা করে এ পর্যায়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ভাবন করা যে, এর মধ্যে কোন্ নামটি সঠিক। অথবা উভয় নামই সঠিক তবে হয়ত দু' ব্যক্তির নাম।

যারা প্রথমোক্ত মত অবলম্বন করেন তাদের মতে, দু'টি নাম একই ব্যক্তির। তারেখ হলো তার প্রকৃত নাম আর আজর হলো তার গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিতকারী নাম। এদের মধ্যে কারো কারো মতে, ইব্রানী ভাষায় মূর্তি প্রেমিক ব্যক্তিকে আজর বলা হয়, যেহেতু তারেখ নামক এ ব্যক্তি শুধু মূর্তি পূজকই ছিল না; বরং মূর্তি প্রস্তুতকারকও ছিল আর এ ব্যপারে দক্ষ এবং অভিজ্ঞও ছিল তাই তাকে আজর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর এ নামেই সে খ্যাতি অর্জন করে।

কারো কারো মতে, আজরের অর্থ হলো নির্বোধ। আর তারেখের মধ্যে নির্বুদ্ধিতা ছিল তাই আজর নামে বিখ্যাত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এ কারণেই আজর নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

১। কাসাসুল কোরআন কৃত মওলনা মোহাম্মদ হেফজুর রহমান খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫১

বিখ্যাত বিদ্বান সুহাইলী তাঁর "রওজুল আন্‌ফ" গ্রন্থে এ মতই পোষণ করেছেন।

আর যারা দ্বিতীয় মত পোষণ করেছেন তাদের বক্তব্য হলো আজর সে মূর্তির নাম যার পূজারী ছিল তারেখ।

মুজাহেদ (রঃ) এ অভিমত পোষণ করেন। অন্য একটি মত এই, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা নাম হলো তারেখ। আর তাঁর পিতৃব্যের নাম হলো আজর। যেহেতু আজর শৈশবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে লালন পালন করেছিলেন, পিতার ন্যায়ই তাঁর দেখা-শুনা করেছিলেন তাই কোরআনে করীম আজরকেই পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন হাদীস শরীফে আছে–

العم صنو ابيه

অর্থাৎ পিতৃব্য পিতার ন্যায়ই।

আল্লামা আবদুল ওয়াহাব নাজ্জারের মতে উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের মধ্যে মুজাহেদ (রঃ)-এর মতই অধিকতর প্রামাণ্য। কেননা, মিশরের প্রাচীন দেবতার নামগুলোর মধ্যে একটি দেবতার নাম হলো আজুরেস, হয়তো সে অনুসারেই এ মূর্তির নাম রাখা হয়েছে আজর।

অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল তারেখ। "কাসাসুল কোরআন" নামক গ্রন্থের লেখক বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী আল্লামা হেফজুর রহমান (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু কোরআনে করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় আজরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা বলা হয়েছে, তাই পিতার নাম অন্য কিছু বলার এবং এক্ষেত্রে নিতান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে বা তৌরাত ও বাইবেলের বর্ণনায় প্রভাবান্বিত হয়ে অন্য কোন নাম রাখার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি যদি মূর্তি প্রেমিককে আজরও বলা হয় অথবা কোন মূর্তির নামও আজর হয় তারপরও আজরকে আজর বললে তথা ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম আজর হলে আপত্তি করার কোন ন্যায্য কারণ নেই। কেননা মূর্তি পূজকরা মূর্তির নামেই তাদের সন্তানদের নামকরণ করতে অভ্যস্ত ছিল।

মূলতঃ কালদী ভাষায় "আদার" বলা হয় শ্রেষ্ঠ পূজারীকে। আরবী ভাষায় তাই আদারকে 'আজর' বলা হয়েছে। যেহেতু তারেখ মূর্তি নির্মাণকারী এবং শ্রেষ্ঠ পূজারী ছিল তাই আজর নামেই সে খ্যাতি লাভ করে। অথচ এটি নাম ছিল না ছিল খেতাব, যখন খেতাবই নামের স্থান নিয়ে নিল তখন পবিত্র কোরআনে তার নাম আজর বলেই ঘোষণা করা হলো।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমন মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী ছিলেন যে, যখন মূর্তি পূজার ব্যাপারে তাঁর সাথে তাঁর পিতার বিতর্ক হয় তখন তাঁর পিতা রাগান্বিত হয়ে বলেছিল পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا

অর্থাৎ হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের প্রতি অসন্তুষ্ট? যদি তুমি বিরত না হও তবে আমি তোমার প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করবো এবং আমার সম্মুখ থেকে তুমি দূরে সরে যাও।

এমন হৃদয় বিদায়ক এবং কষ্টদায়ক কথা সত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পৈত্রিক সম্পর্কের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে বলেছেন পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا

(সূরা মরয়ম)

আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি অচিরেই আপনার জন্যে আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি আমার উপর অতীব দয়াবান। এমন অবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে এ ধারণা করা কি সম্ভব যে তিনি তাঁর পিতাকে নির্বোধ খেতাব দেবেন?

অতএব, একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে, যাকে ইতিহাস "তারেখ" বলেছে তিনি আজরই, আর কেউ নয়।[১]

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, অনেক অনুসন্ধানের পর যে সত্য প্রতিভাত হয় তা হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতৃব্য ছিল আজর। আর আরবরা পিতৃব্যকে পিতা বলে থাকে। এজন্যে আজরকে পিতা বলা হয়েছে। আজরের আসল নাম নাখোর। নাখোর পূর্বে তৌহীদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু নমরূদের উজির হওয়ার পর তৌহীদের উপর বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার লোভ লালসায় মত্ত হয়ে কাফের হয়ে যায়।

ইমাম রাজী (রঃ)-ও আজরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতৃব্য বলেছেন। ইমাম রাজী (রঃ)-এর পূর্বে জোরকানী শরহুল মাওয়াহেব গ্রন্থে লিখেছেন যে, আজর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতৃব্য হওয়ার দলিল এই যে, শেহাব হায়সমী আজরকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতৃব্য বলেছেন।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, সঠিক সনদসহ আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), এবনে জরীর (রঃ) এবং

১। কাসাসুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৪

সুদ্দী (রঃ) এ মত পোষণ করতেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল তারেখ।

আল্লামা সয়ুতি একথাও লিখেছেন যে, এবনুল মুনজেরের তফসীরে আমি একজন সাহাবীর কথা পেয়েছি যে, আজর ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতৃব্য।

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ কামুসে রয়েছে যে আজর ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতৃব্য ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল তারেখ বা তারেহ।

উভয় নাম এক ব্যক্তির ছিল।[১] এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম আজর নয় তারেখ ছিল। আর তাঁর মাতার নাম ছিল শানী। আর স্ত্রীর নাম ছিল সারা, আর হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতার নাম ছিল হাজেরা। তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বাঁদী।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো লিখেছেন, আজর ছিল একটি মূর্তির নাম, যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা এ মূর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী ছিল তাই আজর নামেই সে খ্যতি লাভ করে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি রয়েছে তানবীরুল মেকবাস নামক তফসীর গ্রন্থে। সেখানে আজরের পরিচিতি দিয়ে বলা হয়েছে তিনি হলেন তারেখ এবনে নাহোর।[৩]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, কারো কারো ধারণা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম আজর নয়; বরং তাঁর পিতৃব্যের নাম। কিন্তু তাদের নিকট এ বক্তব্যের পক্ষে তেমন কোন সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় দলিল প্রমাণ নেই।[৪]

ইমাম রাজী (রঃ) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হয়তো আজর এবং তারেখ উভয় নামই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতারই ছিল। আর এ সম্ভাবনাও আছে যে তাঁর আসল নাম ছিল আজর এবং খেতাব ছিল তারেখ। আর এটিই খ্যাতি লাভ করে আসল নামটি অখ্যাত থেকে যায়।

আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে প্রকৃত নামই উল্লেখ করেছেন অথবা এর বিপরীতও হতে পারে অর্থাৎ আসল নাম ছিল তারেহ আর আজর ছিল খেতাব। এ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৭৪
৩। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১১৩
৪। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৭

খেতাবটি খ্যাতি লাভ করে। তাই আল্লাহ পাক এ নামই উল্লেখ করেছেন। আর আজর নামটি ছিল মূর্তির, ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা তার শ্রেষ্ঠ পূজারী ছিল। তাই ঐ মূর্তির নামেই তার খ্যাতি হয়।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো বলেছেন, আসলে শব্দটি ছিল আবেদু আজর অর্থাৎ আজর নামক মূর্তির পূজারী। সহজ এবং সংক্ষেপ করতে লোকেরা আবেদ শব্দটি সরিয়ে দিয়েছে তাই শুধু আজর রয়েছে। আর একথাও বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল তারেহ আর তাঁর পিতৃব্য ছিল আজর।

ইমাম রাজী (রঃ) সমস্ত মতের উদ্ধৃতি দেয়ার পর বলেছেন, ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা আজর ছিলেন না, অন্য ব্যক্তি ছিলেন।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশ তালিকা সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং তাতে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত সকলেই তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। আজর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতৃব্য ছিল, পিতা নয়।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক, যাহ্যাক এবং কালবীর বর্ণনা হলো আজর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নামই ছিল। আর তারই নাম তারেখও ছিল। যেভাবে ইসরাঈল এবং ইয়াকুব একই ব্যক্তির দু'টি নাম ছিল।

মোকাতেল এবনে হাব্বান বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল তারেখ। আর তার খেতাব ছিল আজর।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর পিতা আজরের সঙ্গে মোলাকাত হবে। তার চেহারা বালু মিশ্রিত হবে যা দোযখী হওয়ার নিদর্শন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলবেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আমার কথা অমান্য করোনা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা বলবে, আজ আমি তোমার কথার বরখেলাফ কিছু করবো না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করবেন এই বলে, হে আমার মালিক! তুমি তো আমাকে বলেছিলে যেদিন মানুষকে একত্রিত করা হবে সেদিন আমাকে অপমানিত করবে না। আমার পিতার এই অবস্থা, এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে! আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি কাফেরদের জন্যে জান্নাত হারাম করেছি। এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এ বিবরণ পেশ করে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা জানা যায় যে আজরই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা।[২]

(আল্লাহ্ পাকই সর্বজ্ঞানী।)

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৯

পবিত্র কোরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রসঙ্গ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তৌহীদের আহবায়ক। তিনি আল্লাহ পাকের ঘর কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণ করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম আমগন করেছেন এমনকি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও তাঁরই বংশধর ছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম তাঁর পিতাকে তৌহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর যুগের বাদশাহ ছিল জালেম নমরূদ। নমরূদ তাঁর তৌহীদের আহবানে সাড়া দেয়ার স্থলে তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লাহ পাক সে অগ্নিকুন্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করেছিলেন। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে স্বপ্নে তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ্ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করতে উদ্যত হয়ে তিনি এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের সত্যিকার প্রেমিক। তাই প্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাঁকে বারে বারে, তাঁর আদর্শ হলো মহান, তাই কোরআনে করীমের বহু আয়াতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে এর একটি তালিকা প্রদত্ত হলো।

১। সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০।

২। সূরা আলে-এমরান, আয়াত ঃ ৩৩, ৩৫, ৬৭, ৬৮, ৮৪, ৯৫, ৯৭।

৩। সূরা আন নিসা, আয়াত ঃ ৫৪, ১২৫, ১৬৩।

৪। সূরা আল-আন্‌আ'ম, আয়াত ঃ ৭৪, ৭৫, ৮৩, ১৫১।

৫। সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৭০, ১১৪।

৬। সূরা হুদ, আয়াত ঃ ৬৯, ৭৫, ৭৬, ৭৮।

৭। সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ১৪, ৩৬।

৮। সূরা আন্ নাহ্ল, আয়াত ঃ ১৬, ১২০, ১২৩।

৯। সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ঃ ২১, ৫১, ৬০, ৬২, ৬৯।

১০। সূরা আশ্ শোয়ারা, আয়াত ঃ ২৬, ৬৯।

১১। সূরা আল-আহযাব, আয়াত ঃ ৩৩, ৭০।

১২। সূরা ছোয়াদ, আয়াত ঃ ৩৮, ৪৫।

১৩। সূরা আজ-যুখরফ, আয়াত ঃ ২৬, ৪৩।

১৪। সূরা আন্ নাজ্‌ম, আয়াত ঃ ৩৭, ৫৩।

১৫। সূরা আল-মুমতাহেনাহ, আয়াত ঃ ৬০।

১৬। সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ ৬, ১২, ৩৮।

১৭। সূরা আল-হিয্‌র, আয়াত ঃ ১৫, ৫১।

১৮। সূরা মরয়ম, আয়াত ঃ ৪, ১৯, ৪৬, ৫৮।

১৯। সূরা আল-হজ্জ, আয়াত ঃ ২২, ২৬, ৪৩, ৭৮।

২০। সূরা আল আন্‌কাবুত, আয়াত ঃ ১৬, ২৯, ৩১।

২১। সূরা আস সাফ্‌ফা-ত, আয়াত ঃ ৩৭, ৮৩, ১০৪, ১০৯।

২২। সূরা আশ শুরা, আয়াত ঃ ১৩, ৪২।

২৩। সূরা আয যারিয়াত, আয়াত ঃ ২৪, ৫১।

২৪। সূরা আল-হাদিদ, আয়াত ঃ ২৬, ৫৭।

২৫। সূরা আল আ'লা, আয়াত ঃ ১৯, ৮৭।

সর্বমোট পবিত্র কোরআনের ২৫টি সূরায় ৬৩ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আলোচনা রয়েছে।[১]

أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন, আমি আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায়কে দেখছি হাতে তৈরী করা পাথরকে উপাস্য বলে মেনে নিচ্ছেন অর্থাৎ মূর্তি পূজা করছেন। অথচ এটি সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা এবং পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয় কেননা, যা মানুষ হাতে তৈরী করে তা কিভাবে মানুষের উপাস্য হতে পারে?

وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

আর এভাবে অর্থাৎ যেভাবে মূর্তি পূজার অসারতা, হীনতা ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক তেমনি আমি বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য-দ্বার তাঁর নিকট খুলে দিয়েছি, বিশ্ব সৃষ্টির পরিচালনার বিস্ময়কর বিষয়গুলো তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছি। ফলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব, অদ্বিতীয়তা, একত্ববাদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি জগতের অক্ষমতা এবং অধীনতার প্রকৃত রূপ তিনি লক্ষ্য করেছেন। পাশাপাশি তাঁর স্বজাতির পৌত্তলিকতা বা শেরক এবং মূর্তি পূজা ও নক্ষত্র পূজার বাতুলতা উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন।

বস্তুতঃ বিশ্ব সৃষ্টির ত্রুটিহীন, সুদৃঢ়, সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত, পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্য করলে এ সত্য অনুধাবন করতে বাধ্য হতে হয় যে, নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির মূলে কোন স্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা, মহা ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী পরিচালক অবশ্যই রয়েছেন যাঁর ক্ষমতা অনন্ত অসীম, যিনি এক, অদ্বিতীয়, যিনি কল্যাণকামী, সূক্ষ্মদর্শী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

১। কাসাসুল কোরআন খন্ড-১ পৃষ্ঠা ১৬৭-৬৮

সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁর কর্তৃত্বাধীন, তাঁর হুকুমের বরখেলাফ করার ক্ষমতাও কারো নেই।[১]

ملكوت

আলোচ্য আয়াতের 'মালাকুত' শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতা, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কর্তৃত্ব, আসমান ও জমিনে তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও আধিপত্য।

মুজাহেদ (রঃ) এবং হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আসমান জমিনে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার জীবন্ত নিদর্শন সমূহ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ঘটনাটি এভাবে ঘটে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে একটি পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় এবং সৃষ্টি-রহস্যের উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দেয়া হয়। ফলে আসমান জমিন, আকাশ পাতাল তথা আরশ থেকে ফরস পর্যন্ত সব কিছু তাঁকে দেখানো হয় এমনকি, বেহেশতে তাঁর জন্যে যে স্থান নিদৃষ্ট রয়েছে তা-ও তাঁকে দেখানো হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ এভাবেই আমি দেখিয়ে দিয়েছি ইব্রাহীমকে জমিন ও আসমানের পরিচালনা ব্যবস্থা।

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে আধুনিক বিজ্ঞানীদের পরিবেশিত তথ্য উপস্থাপন করে প্রমাণ করছেন যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করেন।

আল্লামা ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেছেনঃ নক্ষত্রমন্ডলীর গতিবিধি পারস্পরিক আকর্ষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয়। সূর্যের আকর্ষণ নক্ষত্রপুঞ্জকে সূর্যের দিকে টেনে থাকে। তাই সূর্যের চার দিকে যে নক্ষত্রপুঞ্জ পরিভ্রমণ করে চলেছে তার মূলে কোন অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তি তার ক্ষমতা যে কার্যকর করছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর একমাত্র সে অদৃশ্য শক্তিই নক্ষত্রপুঞ্জকে তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণের বিপরীতে তাদের কক্ষ-পথে বন্দী করে রেখেছে। এভাবে নক্ষত্রপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রণ করা, একই কক্ষ-পথে রেখে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করানো এবং তাতে কোন রকম পরিবর্তন না হওয়া একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, সব কিছু এক অদৃশ্য শক্তিরই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৭৭

নিউটন আরো বলেছেন, লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, সূর্য এবং নক্ষত্রমন্ডলীর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে তা সত্ত্বেও নক্ষত্রের গতি বিধি এবং দ্রুততা এবং সূর্যের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ও অসাধারণ সামঞ্জস্য বর্তমান রয়েছে এবং যে শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান রয়েছে তার কৃতিত্বের দাবীদার প্রকাশ্যে কেউ নেই। অতএব, একথা মেনে নিতে আদৌ কোন দ্বিধা হয় না যে, সৌর জগতের তথা নক্ষত্রমন্ডলীর সৃষ্টি এবং পরিচালনা কোন অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দী, অজেয়, মহাজ্ঞানীর মহাশক্তির অবদান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পবিত্র কোরআনের সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

..........وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

"এবং সূর্য পরিভ্রমণ করে তার নির্দৃষ্ট গন্তব্যের দিকে, তা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ। আর চন্দ্রের জন্যে আমি নিদৃষ্ট করেছি বিভিন্ন মঞ্জিল। অবশেষে তা শুস্ক, বক্র, পুরনো খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে থাকে"।

وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-কে সৌর জগতের তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের এ রহস্য সমূহ এজন্যে দেখিয়েছি যেন সে পূর্ণ এবং প্রকৃত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বস্তুতঃ যিনি মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের তৌহীদের প্রতি আহবান জানাবেন তিনি তৌহীদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগৎ যে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতার জীবন্ত সাক্ষী এ সত্য তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করবেন। এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁর সম্মুখে সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সবই তাঁকে দেখিয়েছেন, যেমন আল্লাহ পাকের কুদরতের অপূর্ব মহিমা দেখাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শবে মে'রাজে মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করিয়ে দরবারে এলাহীতে হাযির করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ

"আমি তাঁকে দেখাতে চেয়েছি আমার নিদর্শন সমূহ"।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج

যখন রাতের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করলো তখন সে নক্ষত্র দেখে বললো, এ-তো আমার প্রতিপালক, এরপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বললো যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করিনা।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا

এরপর যখন সে চন্দ্রকে অত্যন্ত সমুজ্জল রূপে উদীয়মান দেখলো তখন বললো, এ যে আমার প্রতিপালক, কিন্তু যখন চন্দ্রও অস্তমিত হলো তখন সে বললো, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথ না দেখান তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج

এরপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমান রূপে উদিত হতে দেখলো তখন সে বললো, "এ হলো আমার প্রতিপালক, এটি সর্ব বৃহৎ"। কিন্তু সূর্য যখন অস্তমিত হলো তখন সে বললো, তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি একনিষ্ঠ ভাবে সেই মহান সত্ত্বার দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

দু'টি কথা

এখানে দু'টি কথা আছে–

১. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একথাগুলো কখন বলেছিলেন?

২. একথাগুলো কি অর্থে বলেছেন?

(এক) আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন শিশু ছিলেন, সেজন্যে এগুলো তাঁর জন্যে কুফরী কলেমা ছিল না। কেননা তিনি তখন সাবালক হননি, তাই শরীয়তের বিধান কার্যকর করার বয়স তাঁর হয়নি।

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, এ সময়টি ছিল তাঁর সাবালক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত।

মওলানা আবু বকর (রঃ) খোলাসাতুত তাফাসীর নামক গ্রন্থে লিখেছেন, একথা তিনি তখন বলেছেন যখন তাঁর বয়স ছিল পনের মাস।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এসব কথা সঠিক নয় কেননা, নবী রসূলগণ কোন সময়ই এমন কথা বলেন না যাতে শেরক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ

অর্থাৎ আমি ইব্রাহীমকে তাঁর বাল্যকালেই হেদায়েত প্রাপ্ত বানিয়েছি।

মুজাহেদ (রঃ) এ ব্যাখ্যাই পোষণ করতেন। এবনে আতা বলেছেন, পয়দা হওয়ার আগেই আল্লাহ পাক তাঁকে নির্বাচন করেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পয়দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের একজন ফেরেশতা তাঁকে বলেছেনঃ অন্তর দিয়ে আল্লাহর মা'রেফাত হাসিল কর এবং রসনা দ্বারা তাঁকে স্মরণ কর।

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে নমরুদ এবনে কেনআন ছিল ইরাকের বাদশাহ। এ নমরূদই সর্ব প্রথম নিজের জন্যে একটি মুকুট তৈরী করেছিল এবং মানুষকে তাকে পূজা করার আদেশ দিয়েছিল। তার দরবারে কিছু গনক ছিল। তারা নমরূদকে সতর্ক করে বলেছিল, এ বছর আপনার দেশে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে যে এদেশের মানুষের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেবে এবং আপনার প্রাণ ও ক্ষমতা সবই তার হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে যে, এসব কথা তারা সাবেক আম্বিয়ায়ে কেরামের কিতাবে পেয়েছিল।

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেন, নমরূদ নিজে স্বপ্নে একটি নক্ষত্র দেখেছিল যার জ্যোতির কারণে চন্দ্র সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। নমরূদ এ স্বপ্ন দেখে রীতিমত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। তখন সে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে গনক এবং যাদুকরদের কাছে। তারা বলল, আপনার দেশে একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে যে আপনার পরিবারবর্গ ও আপনার রাজত্বের ধ্বংসের কারণ হবে।

নমরূদ একথা শ্রবণ করে আদেশ দেয়, এ বছর যত পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে সকলকে হত্যা করা হোক। এজন্যে নমরূদ অনেক প্রহরী নিযুক্ত করেছিলো যেন কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্মের পূর্বক্ষণে তাঁর মাতা শহর ছেড়ে জঙ্গলে গমন করেন যেন কেউ নবজাত শিশুর জন্মের খবর না পায়। অবশেষে জঙ্গলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতাকে সংবাদ দিলে সে একটি গর্ত করে এবং তাতে নবজাত শিশুকে গোপন করে। গর্তের মুখে একটি পাথর রেখে দেয় যাতে করে হিংস্র জন্তু তাঁকে কষ্ট দিতে না পারে। তাঁর মাতা সব সময় আসা যাওয়া করতেন এবং দুগ্ধ পান করাতেন।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্মের পূর্বক্ষণে তাঁর মাতা নিকটতম একটি গর্তে গমন করেন, সেখানে ইব্রাহীম (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন এবং গর্তের মুখ বন্ধ করে বাড়ী চলে আসেন। যখন তাঁকে দেখতে যান তখন দেখেন তিনি আঙ্গুল চুষে খাচ্ছেন। একটি আঙ্গুলে পানি, দ্বিতীয় আঙ্গুলে মধু, তৃতীয় আঙ্গুলে দুধ, চতুর্থ আঙ্গুলে খেজুরের টুকরা এবং পঞ্চম আঙ্গুলে ঘি ছিল।

বর্ণিত আছে, ইব্রাহীম (আঃ) একদিনে এক মাসের ন্যায়, আর এক মাসে এক বছরের ন্যায় বড় হতেন যখন তাঁর বয়স ১৫ মাস হলো তখন তিনি তাঁর মাতাকে বললেন, এখান থেকে আমাকে বের কর। ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাতা তাঁকে এশার নামাযের সময় বের করে আনলেন। তখন তিনি আসমান জমিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত আমার কোন প্রতিপালক নেই। তখন তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং একটি নক্ষত্র দেখে বললেনঃ এটিই আমার প্রতিপালক। এরপর যখন ঐ নক্ষত্রটি বিদায় নিল তখন তিনি বললেনঃ বিদায় গ্রহণকারী আমার প্রতিপালকে হতে পারে না।

এরপর যখন জ্যোতির্ময় চন্দ্রকে দেখলেন তখন বললেন, এটিই আমার প্রতিপালক। যখন চন্দ্র অস্তমিত হলো তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যা অস্তমিত হয় তা প্রতিপালক হতে পারে না।

এরপর যখন সূর্য উদিত হলো তার সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা করলেন। কিন্তু যখন সূর্য অস্তমিত হলো তখন তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! যারা নিজেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনা তারা মানুষের প্রতিপালক হতে পারে না। তোমরা যেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে শেরক করছো আমি সেগুলোর চেয়ে অনেক দূরে। শেরকের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস করি যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, আমি মুশরেক নই।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন গর্তের মধ্যে থেকে ইব্রাহীম (আঃ) প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছেন তখন তিনি তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার পালনকর্তা কে?

মাতা বললেনঃ আমি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার পালনকর্তা কে?

তিনি বললেনঃ তোমার পিতা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমার পিতার পালনকর্তা কে? তার মাতা বললেনঃ নমরূদ।

তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, নমরূদের পালনকর্তা কে? তখন মাতা বললেনঃ তুমি নীরব হও।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নীরব হয়ে গেলেন।

এরপর তাঁর মাতা স্বামীর নিকট এসে বললোঃ যার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে সে এদেশের মানুষের ধর্ম পরিবর্তন করবে সে তো আপনারই পুত্র। তখন সঙ্গে সঙ্গে পিতা পুত্রের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর পিতাকে একই প্রশ্ন করলেনঃ আমার পালনকর্তা কে?

তাঁর পিতা বললেনঃ তোমার মাতা।

তিনি বললেনঃ আমার মাতার পালনকর্তা কে? সে বললোঃ আমি।

আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার পালনকর্তা কে? সে বললোঃ নমরূদ।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ নমরূদের পালনকর্তা কে? তখন সে রাগান্বিত হয়ে তাঁকে একটি চাপড় মারলো এবং ধমক দিয়ে বললোঃ চুপ কর।

এরপর রাতের অন্ধকার নেমে আসলো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ সুড়ঙ্গের দ্বার-দেশে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি নক্ষত্র দেখলেন।

তিনি বললেনঃ এ-তো আমার প্রতিপালক, এভাবে অবশিষ্ট ঘটনা ঘটে।[১]

(দুই) কাফেররা মূর্তি এবং নক্ষত্রের পূজা করতো এবং এ বিশ্বাস রাখতো যে, সব কাজ তাদের হাতেই রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাফেরদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এভাবে কথা বললেন–

قَالَ هٰذَا رَبِّىْ

অর্থাৎ তোমাদের ধারণায় এ নক্ষত্র হলো আমার প্রতিপালক।

এমনিভাবে চন্দ্র এবং সূর্য সম্পর্কেও তিনি এমনি মন্তব্য করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ উক্ত আসলে অস্বীকৃতি জনিত জিজ্ঞাসা। অথবা কাফের মুশরেকদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে এটি তাঁর বিশেষ বর্ণনা ভঙ্গী।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যকে উদীয়মান অবস্থায় দেখে তিনি বলতেনঃ তোমাদের ধারণার এগুলো হলো আমার প্রতিপালক। অথচ এটি কত বড় অন্যায় কথা। তোমরা যেসব বস্তুকে প্রভূ বলে মনে কর তাদের দুর্গতি এবং দুর্দশা লক্ষ্য কর। এরপর তৌহীদের আহবায়ক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ

আমি অদৃশ্যগামীদের পছন্দ করিনা অর্থাৎ যা নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম নয় তাকে আমি কোন অবস্থাতেই আমার প্রতিপালকের আসনে বসাতে পারিনা।

বস্তুতঃ মানুষের দৃষ্টি শক্তি যখন কমে যায় তখন এ সত্য উপলব্ধি করা অতি সহজ হয় যে, এ দৃষ্টি শক্তি আমারও নয় আপনারও নয়; বরং আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের দান। ঠিক এমনিভাবে নক্ষত্র বা সূর্য যখন তাদের আলো হারিয়ে ফেলে তখন এ সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না যে, নক্ষত্রপুঞ্জ বা চন্দ্র সূর্যের আলো তার নিজস্ব নয়; বরং তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। আর সে দান নিদৃষ্ট সময়ের জন্যে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৭১-৭৪

সেই নিদৃষ্ট সময় যখন শেষ হয় তখন আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এ আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়। এসব কিছুর জন্যে আল্লাহ পাক নিদৃষ্ট পরিমাণ আলো দিয়েছেন। তাদের পরিভ্রমণের জন্যে কক্ষপথ নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন। এ সমস্ত আইন কানুনের আওতায় থেকে তারা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং যার বিদায় অবশ্যম্ভাবী এমন বস্তু প্রতিপালকের মর্যাদা পেতে পারেনা।

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে أفلين (আফেলীন) শব্দটি বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মাত্র একটি নক্ষত্রই দেখেছিলেন। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই একটি নক্ষত্রই অস্তগামী নয়; বরং এমন অগণিত নক্ষত্র রয়েছে যারা অবশেষে অস্তগামী হবে। এটি বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী নক্ষত্র নয়।[১]

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا

এরপর যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জ্যোতির্ময় চন্দ্রকে উদীয়মান দেখলেন তখন বললেনঃ তোমাদের ধারণায় কি এ চন্দ্র আমার এবং সমগ্র জাতির প্রতিপালক? তোমরা একটু অপেক্ষা কর। ক্ষণিকের মধ্যেই চন্দ্রের রহস্য তোমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে।

যখন চন্দ্র অস্তমিত হলো তখন তিনি বলেন, যদিও চন্দ্র তার অধিকতর জ্যোতির কারণে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কিন্তু সেও অস্তগামী এবং বিদায় গ্রহণকারী। অতএব, কোন অবস্থাতেই চন্দ্রও মানুষের প্রতিপালক হতে পারেনা।

قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّاۤلِّيْنَ

(তিনি আরো বললেনঃ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি পথভ্রষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।)

একথার অর্থ হলো কোন বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার অপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব দেখে তাকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করার আশংকা থাকবে, আল্লাহর শোকর যে, আমি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমার সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করছি এবং তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যদি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া, হেদায়েত এবং তৌফিক না হতো তবে আমিও এ পথভ্রষ্ট লোকদের ন্যায় নক্ষত্রপুঞ্জকে উপাস্য মনে করতাম।

এতদ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একথাও বলে দিয়েছেন যে, প্রকৃত সত্য হলো এ হেদায়েত আল্লাহ পাকের মহান দান। আল্লাহ পাক হেদায়েত না করলে তথা এর

১। তফসীরুল বাহরিল মুহীত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৮৬

তৌফিক না দিলে কেউ হেদায়েত পেতে পারে না; শুধু তাই নয়; বরং হেদায়েতের তৌফিক পাওয়া যেমন আল্লাহর নেয়ামত ঠিক তেমনি হেদায়েতের উপর কায়েম থাকাও আল্লাহ পাকের নেয়ামত।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সূর্য উদিত হওয়ার অপেক্ষা করলেন, যেন এর ব্যাপারে মানুষ যে ভুল ধারণা করে আছে তা-ও প্রকাশ করে দেন। যখন সূর্য উদিত হলো তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমাদের ধারণায় এ সূর্য আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক? কেননা সব গুলোর মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অথচ তোমাদের এ বিশ্বাসও ভিত্তিহীন কেননা, সূর্য যত বড়ই হোক না কেন কিছুক্ষণ পর তাকেও বিদায় গ্রহণ করতে হবে। সে এক মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব কী নক্ষত্র, কী চন্দ্র, কী সূর্য এর কোনটিই মানুষের প্রতিপালক হওয়ার যোগ্য নয়।

হে আমার সম্প্রদায়! এগুলোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনিই আসমান জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক, আমি তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করি। সব কিছুর সম্পর্ক ত্যাগ করে এক আল্লাহ পাকের সাথেই আমি সম্পর্ক করি।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে তিন প্রকার লোক ছিল। এক প্রকার হলো যারা যোহরা নামক নক্ষত্রের পূজারী ছিল। দ্বিতীয় প্রকার লোক চন্দ্রের পূজারী ছিল, আর তৃতীয় প্রকার লোক সূর্যের পূজারী ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একে একে প্রত্যেকটি পথ হারা দলের পথভ্রষ্ঠতার কথা ঘোষণা করেছেন। কেননা এসবই বিদায় গ্রহণকারী, অস্তগামী। আর চন্দ্র সূর্য যখন উপাস্য হতে পারেনা তবে কোন্ যুক্তিতে পাথরের তৈরী মূর্তি উপাস্য হবে?

হযরত মওলানা রুমী (রঃ) "মালে'কায়ে সাবার" ঘটনা বর্ণনা করে চন্দ্র সূর্যের পূজারীদের বাতিল আকিদার কথা এভাবে বলেছেনঃ

افتاباں امرحق طباخ است :: ابلہی باشد کہ گرم اوخدا است

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে সূর্য আমাদের বাবুর্চীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কেননা, ফল ও ফসল সূর্যের তাপেই পরিপক্ক হয়।

তাই সূর্যকে উপাস্য মনে করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ঃ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ যখন হয় তখন তার আলো নিস্প্রভ হয়ে যায় এবং তার অসহায়ত্ব পরিলক্ষিত হয়। আর যা অসহায় তা কি করে মানব জাতির উপাস্য বা প্রতিপালক হতে পারে? মাওলানা রুমী (রঃ) আরো লিখেছেন, অধিকাংশ সময় দেখা যায় মানুষের বিপদাপদ রাতের অন্ধকারেই হয়। তখন সূর্য অনুপস্থিত থাকে। যারা সূর্যকে তাদের প্রতিপালক মনে করে তখন বিপদ মুহূর্তে ঐ নির্বোধ লোকেরা কাকে ডাকবে?

---

১ তফসীরে মাআরেফুল কুরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৮৭-৮৮

এতদ্ব্যতীত, সূর্য যখন উদিত হয় তখন তার জ্যোতির্ময় রূপ দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু যখন সে অস্তমিত হয় তথা যখন তার মৃত্যু ঘটে তখন তার যে করুণ অবস্থা হয় তা সকলেই দেখে। এমনি অবস্থায় কোন্ যুক্তিতে সূর্যকে উপাস্য মনে করা যাবে?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে এ সমস্ত যুক্তির মাধ্যমে তাদের পথভ্রষ্ঠতা বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তৌহিদে বিশ্বাস করার আহবান জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আমি শেরকের ন্যায় অন্যায় কাজে তোমাদের সঙ্গে নেই। শেরক সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যায়, আমি তোমাদের এ অন্যায় আচরণের উপর অসন্তুষ্ট। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

"হে আমার জাতি! তোমরা যাদেরকে শরীক করছো তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই"।

কেননা যে সব বস্তু তার অস্তিত্বের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং যা অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন তা কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রতিপালক হতে পারেনা। তাই

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ

আমি মনোনিবেশ করছি সেই আল্লাহ পাকের দিকে যিনি সর্বশক্তিমান। যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি একাগ্র চিত্তে তাঁরই দুয়ারে পড়ে রইলাম, তাঁরই সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম, তিনিই বিশ্ব সৃষ্টির স্রষ্টা, পালনকর্তা, অধিকর্তা।

ইসলাম প্রচারকদের জন্যে বিশেষ পথ নির্দেশ

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌহীদের দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে যে হেকমতপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছেন, বর্তমান যুগে যারা ইসলামের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালন করেন বা ভবিষ্যতে করবেন তাদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ পথ নির্দেশনা।

(১) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌহীদের আহবানের কাজ সর্ব প্রথম শুরু করেছেন তাঁর বাড়ী থেকে। তিনি তাঁর পিতাকেই তাদের বাতিল আকীদা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। তাঁর পিতা তাঁর আহবানে সাড়া দেননি এবং তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার করেছে। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এতদসত্ত্বেও তাঁর পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনম্র ভাষায় কথা বলেছেন। এতে পবিত্র কোরআনের দু'টি শিক্ষার বাস্তবায়ন হয়েছেঃ

(ক) পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে আখেরাত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করুন"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে সর্ব প্রথম আখেরাত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছেন।

(খ) হযরত মূসা (আঃ)-কে যখন আল্লাহ পাক ফেরাউনের নিকট তার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

(হে মূসা ও হারুন!) তোমরা তার সঙ্গে বিনম্র ভাষায় কথা বল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও যখন তৌহীদের দাওয়াত দিলেন তখন অত্যন্ত বিনম্র ভাষায় কথা বলেছেন।

(২) তবলীগ এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা শুধু যে একই রকম পন্থা কার্যকর হবে তাই নয়; বরং সময়, পরিবেশ এবং প্রেক্ষিতের পরিবর্তনে তবলীগ ও দাওয়াতের পন্থাতেও পরিবর্তন আনতে হয়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, তোমরা নিজেদের হাতে বানানো মূর্তি পূজা কর যা তোমাদের উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। অতএব, এটি নিঃসন্দেহে মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, এরপর তিনি নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যের ব্যাপারে তার সম্প্রদায় যে বাতিল আকীদা পোষণ করতো তার বাতুলতা প্রমাণ করেছেন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এবং একথা সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কী নক্ষত্র, কী চন্দ্র, কী সূর্য এর সবই অস্তগামী, সবই বিদায় গ্রহণকারী অতএব তারা কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রতিপালক হতে পারে না। এরপর তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, আমি তোমাদের এ শেরকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিনা। তিনি কথাটিকে যে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সর্বকালের মোবাল্লেগ বা ইসলাম প্রচারকদের জন্যে অনুসরণীয়।

وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ
قَالَ أَتُحَآجُّوٓنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ
أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْـًٔا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٨٠
وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ٨١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ
ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ٨٢

তরজমা

(৮০) তাঁর জাতি তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল, তিনি বলেনঃ তোমরা কি আল্লাহ পাকের অদ্বিতীয়তা সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? অথচ তিনি আমাকে হেদায়েত করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর আমি তাদের ভয় করি না। তবে যদি আমার প্রতিপালক নিজেই কোন কষ্ট দিতে চান দিতে পারেন। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা কি ভেবে দেখ না?

(৮১) তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করবো? অথচ তোমরা এমন কিছুকে আল্লাহর শরীক করতে ভয় কর না যার কোন দলিল প্রমাণই তিনি তোমাদের নিকেট নাযিল করেন নাই। অতএব, যদি তোমরা জান তবে বল দু' দুলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?

(৮২) যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই নিরাপত্তা শুধু তাদেরই জন্যে, আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর সম্প্রদায়কে দলিল প্রমাণ দিয়ে তৌহিদের দিকে আহবান করলেন, তারা সে আহবানে সাড়া দিলনা শুধু তাই নয়; বরং তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগলো। যুক্তি প্রমাণে যখন তারা ব্যর্থ হলো তখন বিতর্কের পথ অবলম্বন করলো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের বিতর্ক এবং ঝগড়ার জবাবে বললেন, তোমরা আমার সম্পর্কে কি ধারণা করেছ?

আল্লাহ পাক যাঁর সম্মুখে আসমান জমিনের সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, যাকে নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডলের বিস্ময়কর রহস্য সমূহ দেখিয়েছেন তাঁর নিকট তোমাদের

এসব অসার তর্কের আদৌ কোন গুরুত্ব আছে কি? আর তোমাদের এ হুমকি ধমকীতে সে কি ভীত হবে? কখনও নয়।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে হেদায়েত করেছেন। সরল-সত্য দ্বীন গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন, আমার সকল জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ঈমান একীনের পথ পরিহার করে আমি তোমাদের ন্যায় পথভ্রষ্ট হতে পারি না। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের বিতর্কের জবাবে বললেনঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং অদ্বিতীয়বাদ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনিই আমাকে হেদায়েত করেছেন। তোমাদের বিতর্ক এবং কলহ-দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে। কেননা, আল্লাহ পাক আমাকে সঠিক পথের হেদায়েত করেছেন। আমি আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান ও একীনের তৌফিক পেয়েছি। যদিও আমি অল্প বয়স্ক কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, তোমরা যাদেরকে শরীক করছো আমি তাদেরকে আদৌ ভয় করি না। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ

তোমরা যে সব বস্তুকে আল্লাহ পাকের শরীক করছো, যেমন চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জ অথবা আগুন, পানি, মাটি অথবা নমরূদ বা তোমাদের হাতে বানানো মূর্তি-এর কোন কিছুকেই আমি ভয় করি না। এগুলো আমার ন্যায়ই অসহায়, আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত এরা কারো কোন ক্ষতি করার শক্তি রাখে না। এদের মধ্যে অনেক গুলো আমার চেয়েও অসহায়, যেমন তোমাদের হাতে বানানো মূর্তি।

বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে এসেছেন তখন মুশরেকদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না এবং তাদের নিকট তাঁর কোন আশাও ছিল না। আজর তখন তার হাতে বানানো কিছু মূর্তি তাঁকে দেয়, যেন তিনি এগুলোকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন। তিনি মূর্তিগুলো নিয়ে বাজারে গমন করলেন এবং উচ্চস্বরে বললেনঃ আমার নিকট থেকে কে এমন জিনিস ক্রয় করবে যা অত্যন্ত ক্ষতিকর, যা কোন উপকারই করবেনা। পরিণামে কোন মূর্তিই বিক্রি হলোনা। এরপর তিনি নদীতে নিয়ে পানিতে মূর্তিটির মাথা রেখে বললেনঃ এবার পানি পান কর। আর তা করলেন কাফেরদেরকে বিদ্রুপ করার জন্যে।[১]

اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ط

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭

অর্থাৎ তোমরা যে সব বস্তুকে উপাস্য মনে করে আল্লাহর শরীক কর তারা আমার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। হ্যাঁ যদি স্বয়ং আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তবে আমার ক্ষতি হতে পারে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ বলেছেন–

১. যদি আমার দ্বারা কোন পাপ কার্য হয় আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন আখেরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে আমাকে কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত করেন, তবে তিনি তা করতে পারেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়ার কোন কষ্টকর কাজে নিয়োজিত করবেন এবং তাঁর কোন নেয়ামত আমার নিকট থেকে সরিয়ে নেবেন।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে একটি দাবী ছিল যে,

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ

(আমি ভয় করি না) এতে অহংকারের আশংকা ছিল। তাই আলোচ্য বাক্যে তা নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যে সব জিনিসকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক কর সেগুলোকে আমি ভয় করি না। হ্যাঁ আল্লাহ পাকই যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তবে তা যে কোন সময়ই হতে পারে।[২]

وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًاؕ

অর্থাৎ আমার প্রতিপালকের এলম সর্বব্যাপী, সব কিছুর পরিবেষ্টনকারী। হতে পারে আল্লাহ পাকের এলমে একথা রয়েছে যে, তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জি ও দানের কারণে তাঁর কোন সৃষ্টির তরফ থেকে আমার কোন কষ্ট হতে পারে। তাই আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তিনি তাঁর ইচ্ছা কার্যকর করতে পারেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এখানে আল্লাহ পাকের দুটি গুণের কথা প্রকাশ করেছেনঃ

১. আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

২. তিনি সর্বজ্ঞানী।

তাঁর সম্প্রদায়কে তিনি এর দ্বারা একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা যাদেরকে শরীক কর তারা সম্পূর্ণ অসহায়, নিরুপায়, তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্যেই তারা অন্যের মুখাপেক্ষী। আর আমি এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাচ্ছি, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৫৯
২। বয়ানুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৬

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

তোমরা তবু কি সত্য উপলব্ধি করবে না? সর্বশক্তিমান এবং সম্পূর্ণ অসহায়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা-ও অনুধাবন করবে না?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে একথা বলে ভয় প্রদর্শন করতো যে, তুমি আমাদের উপাস্যদের অপমান করছো এর পরিণাম ভাল হবে না। তুমি তাদের কোপানলে পড়ে বিপদগ্রস্ত হবে। তার জবাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছেনঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক কর আমি তাদেরকে আদৌ ভয় করি না। এ অক্ষম জড় পদার্থদের আমি কিভাবে ভয় করতে পারি? যাদের কিছু মাত্র শক্তি নেই, যারা তাদের অস্তিত্বের জন্যেই অন্যের মুখাপেক্ষী আমি তাদের ভয় করি না। তারা কারো ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। অথচ তোমাদের ভয় করা উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনকে, যিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তোমরা এমন অসহায়, অক্ষম, অথর্ব, অপদার্থ বস্তু সমূহকে তাঁর সাথে শরীক কর যার কোন দলিল প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই। আমি কেন তাদেরকে ভয় করবো? আমি তো এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করি। আর তৌহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস কোন অপরাধ নয়। এখন তোমরাই ভেবে দেখ যে,

فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ج

দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের বিপদ থেকে কে নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, নাকি সেই পৌত্তলিকদের দল যাদের পৌত্তলিকতার কোন দলিল প্রমাণ তাদের নিকট নেই, আর যাদের প্রতি এ পৌত্তলিকরা বিশ্বাস করে সে দেবতাগুলো চরম অসহায় এবং নিরুপায়। অতএব, তোমরাই চিন্তা কর যে, কার ভয় করা উচিত? আমার না তোমাদের?

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

যদি তোমরা বুঝতে পার তবে তোমরা অবশ্যই এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, সর্বশক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাককে তোমাদের অবশ্যই ভয় করা উচিত। যদি তোমরা বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী এবং বাস্তববাদী হও তবে এ সত্য অবশ্যই উপলব্ধি করবে যে, যিনি আসমান জমিনের মালিক, যিনি অদ্বিতীয়, লা-শরীক, তাঁর সাথে শেরক করলে তাঁর আযাব থেকে কেউ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই তথা যাদের ঈমান হবে নিখুঁত-নির্ভেজাল একমাত্র তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা, আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত, তারাই লাভ করবে জান্নাত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম বড় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! মোমেন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের প্রতি জুলুম করেনা? এমন অবস্থায় দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভের পন্থা কি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আলোচ্য আয়াতে জুলুম অর্থ শেরক। তোমরা কি লোকমানের কথা লক্ষ্য করোনি? তিনি তাঁর পুত্রকে নসিহত করে বলেছিলেন ঃ

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শেরক করোনা, নিশ্চয় শেরক সবচেয়ে বড় জুলুম"। (বোখারী, মুসলিম)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং অটুট বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ শেরক পরিহার না করে তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। শেরক মিশ্রিত ঈমান দ্বারা দোযখের আযাব থেকে নাজাত লাভ করা যায় না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুশরেকদেরকে এ প্রশ্ন করেছিলেন যে, দোযখের আযাব থেকে নাজাত লাভের যোগ্য কে? যখন কাফেররা কোন জবাব দিল না তখন তিনি নিজেই জবাব দিলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে শেরকের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা।

এবনে আবি হাতেম বকর সওয়াদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঈসলামের এক দুশমন মুসলমানদের প্রতি হামলা করে একজন মুসলমানকে হত্যা করে। দ্বিতীয় বার হামলা করে অন্য একজন মুসলমানকে হত্যা করে। তৃতীয়বার হামলা করে আরো একজন মুসলমানকে হত্যা করে। এরপর সে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং আরজ করে, এ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আমার উপকার হতে পারে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ হ্যাঁ।

সে ব্যক্তি তখন ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর নিজের সাথীদের উপর হামলা করে একে একে তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে। কোন কোন তফসীরকারের মতে, এ আয়াত উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।[১]

ঈমান ও তার শুভ পরিণতি

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। জরীর এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলছিলাম। আমরা যখন মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে আসি তখন দেখলাম এক ব্যক্তি উষ্ট্রের ওপর আরোহী অবস্থায় আমাদের দিকে আসছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এ ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এসেছে, আমাদের নিকট পৌঁছে সে আমাদেরকে সালাম দিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোথা থেকে এসেছ? সে বলল, আমি আমার পরিবারবর্গ এবং গোত্রীয় লোকদের নিকট থেকে এসেছি।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোথায় যাবে? সে বললো, আল্লাহর রসূলের সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ বল আমিই আল্লাহর রসূল। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে ঈমানের তা'লিম দিন। তিনি এরশাদ করলেনঃ বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল এবং নামায আদায় কর, যাকাত দাও, রমজানের রোজা রাখ, হজ্ব কর।

সে বলল, এসব বিষয় আমি মেনে নিলাম। এরপর সে রওয়ানা হলো। একটি জংলী ইদুরের গর্তের মধ্যে তার উষ্ট্রের পা পড়লে সে উষ্ট্রের পৃষ্ঠ থেকে নীচে পড়ে গেল। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এ ব্যক্তির খবর নেয়া আমার কর্তব্য। তখন সঙ্গে সঙ্গে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) এবং হযরত হোজায়ফা (রাঃ) দৌড়ে গিয়ে তাঁকে উঠালেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর তিনি অন্যদিকে ফিরে এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি জান আমি অন্যদিকে কেন ফিরলাম? আমি দু'জন ফেরেশতাকে দেখেছি তারা জান্নাতের ফল তার মুখে দিচ্ছে। তা দ্বারা আমি উপলব্ধি করলাম সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এ ব্যক্তি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ তারা ঈমানের সঙ্গে শেরককে মিশ্রিত করে নাই। এরপর তিনি এরশাদ করেন ঃ

১। তফসীরে মাজাহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৯

তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ব্যবস্থা কর। তাই আমরা তাকে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে সুগন্ধি মেখে দিলাম। যখন তাকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং কবরের পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে এরশাদ করলেনঃ বগলী কবর বানাও, উন্মুক্ত রেখোনা। আমাদের কবর বগলী, অন্যদের কবর উন্মুক্ত থাকে। এ ব্যক্তি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা সামান্য আমল করে অধিক সওয়াব লাভ করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ঘটনাটিকে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলছিলাম। তখন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি সম্মুখে আসলো এবং বললো, হে আল্লাহর রসূল! শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি আমার দেশ, পরিবারবর্গ এবং অর্থ-সম্পদ এজন্যে ছেড়ে এসেছি যেন আপনার দ্বারা হেদায়েত লাভ করতে পারি। আর আমি এভাবে আপনার নিকট পৌঁছেছি যে, পথে আমাকে ঘাস পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

এখন আমাকে দ্বীন শিখিয়ে দিন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন। সে তা কবুল করলো। আমরা তার চারি পার্শ্বে একত্রিত হয়েছিলাম। সে বিদায় নিয়ে যেতে লাগলো, তার উষ্ট্রের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে ফেঁসে গিয়েছিল। তাই সে পড়ে যায় এবং ঘাড় ভেঙ্গে গেল।

তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর শপথ! সে তার দেশ এবং সন্তান-সন্ততিকে ছেড়ে শুধু আমার নিকট থেকে হেদায়েত এবং দ্বীন অর্জন করার জন্যে এসেছিল, সে দ্বীনি তা'লিম হাসিল করেছিল। আমি একথাও জানতে পেরেছি যে, সে ভ্রমণ কালে ঘাস পাতা খেয়েই কাল যাপন করেছে। সে আমল করেছে সামান্য, কিন্তু বিনিময় পেয়েছে অনেক। তোমরা কি তাদের সম্পর্কে শ্রবণ করোনি যারা নিজের ঈমানের সঙ্গে শেরককে মিশ্রিত করেনি? তারাই শান্তি নিরাপত্তা লাভের প্রকৃত হকদার। আর এরাই হেদায়েত প্রাপ্ত এবং এ ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আবদুল্লাহ এবনে সানজারা থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যাকে দান করা হয়েছে, আর সে শোকর আদায় করেছে, আর যাকে দান করা হয় নাই সে সবর করেছে, আর যে জুলুম করেছে এরপর ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে, আর যার প্রতি জুলুম হয়েছে সে ক্ষমা করেছে। এ কথার পর তিনি নীরব হয়ে গেলেন, তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে কি পাবে?

তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি আল্লাহর আযাব হবে না, আর তারা হেদায়েত প্রাপ্ত।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ
نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ
سُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾
ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا
بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ
اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

তরজমা

(৮৩) আর এ হলো আমার যুক্তি প্রমাণ যা আমি ইব্রাহীমের জাতির বিরুদ্ধে তাকে দিয়েছিলাম, যাকে ইচ্ছা মান মর্যাদায় আমি তাকে উন্নতি দান করি। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সুবিবেচক, মহাজ্ঞানী।

(৮৪) আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং ইয়াকুব, তাঁদের প্রত্যেককে আমি হেদায়েত দান করি, আর সকলের আগে আমি নূহকে হেদায়েত দান করি এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে দাউদ ও সোলায়মান, আইয়ুব এবং ইউসুফকে, মূসা এবং হারুনকে আমি হেদায়েত দান করেছি, আর এভাবেই আমি নেককারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(৮৫) এবং জাকারিয়া, ইয়াহয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে হেদায়েত দান করি, তারা সকলেই নেকাকারদের অন্তর্ভুক্ত।

(৮৬) আর হেদায়েত করেছি ইসমাঈল, আলয়াছা ও ইউনুস এবং লূতকে। আর প্রত্যেককেই বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

(৮৭) তাদের পিতা, পিতামহদের তাদের সন্তান-সন্ততিদের এবং তাদের ভাইদের মধ্যে থেকেও কোন কোন জনকে হেদায়েত দান করি। তাদেরকে পছন্দ করি এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করি।

(৮৮) এ হলো আল্লাহ পাকের হেদায়েত, তিনি নিজের বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। যদি তারা শেরক করতো তবে তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত।

(৮৯) এরাই সে সব লোক যাদেরকে আমি কিতাব এবং কর্তৃত্ব আর নবুওয়্যত দান করেছিলাম। তবুও যদি মক্কাবাসীরা তা অমান্য করে তবে এজন্যে আমি এমন লোক নিদৃষ্ট করে দিয়েছি যারা তা অস্বীকার করেনা। (৯০) তারাই তো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছিলেন। অতএব, (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না। এ-তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ মাত্র।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তৌহীদের ব্যাপারে যে অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে আমিই ইব্রাহীমকে সমস্ত দলিল প্রমাণ দিয়েছি। যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সর্বগুণাকর, যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যিনি অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞানী, তিনিই তাঁর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এসব কথা বাতলে দিয়েছেন, যা তিনি তাঁর জাতিকে বলেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পৌত্তলিকদের আল্লাহ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে যে সব অকাট্য দলিল প্রমাণ শুনিয়েছেন, তার এলম আল্লাহ পাকই তাঁকে দান করেছেন। আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়েই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর দুশমনদের সার্থক মোকাবেলা করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো বলেছেন ঃ এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান এবং কুফর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়, আর একথা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় পরবর্তী বাক্য দ্বারাও। এরশাদ হয়েছেঃ

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط

আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্তবা বুলন্দ করি। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মর্তবা বুলন্দ করেছেন এভাবে যে, তাঁকে কাফেরদের মোকাবেলায় অকাট্য দলিল প্রমাণ পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। আলোচ্য আয়াতে دَرَجٰتٍ শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এর অর্থ মর্তবা, আর

তার বহুবচন হলো দারাজাত। এর তাৎপর্য হলো আখেরাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নেক আমল সমূহের অনেক মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে। আর কেউ বলেছেন, 'দারাজাত' শব্দ দ্বারা সেই দলিল সমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা তিনি তাঁর জাতিকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে পেশ করেছেন কেননা, তাঁর এ সমস্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের জন্যে তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অনেক সওয়াব পাবেন।

আর কেউ কেউ এ আয়াতের এ অর্থ বলেছেন যে, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দুনিয়াতে তার মর্তবা বুলন্দ করেন নবুওয়্যত এবং হেকমত দানের মাধ্যমে এবং আখেরাতে জান্নাত এবং সওয়াব দানের মাধ্যমে। আর কেউ কেউ এ আয়াতের এ অর্থও বলেছেন যে, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার মর্তবা বুলন্দ করেন, তাকে এলম বা জ্ঞানের নেয়ামত দানের মাধ্যমে।[১]

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত বিজ্ঞানময়, কোন লোকের মর্তবা বুলন্দ করার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। আর তিনি মহাজ্ঞানী, যাকে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তার যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকেন। আর যাকে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করেন না, তার সম্পর্কেও তিনি থাকেন সম্পূর্ণ অবগত। সব কিছুই থাকে তাঁর নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ تِلْكَ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে পৌত্তলিকদের যে কথা বার্তা হয়েছে তার প্রতি, এর বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের শেরকের বিরুদ্ধে এবং তৌহীদের পক্ষে তিনি যে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তার সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, এগুলো আমিই তাকে বাতলে দিয়েছি। একথাটি তফসীরকারদের এ বক্তব্যের দলিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বদাই তৌহীদ পন্থী ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিশেষ মর্যাদার কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁকে দুশমনদের মোকাবেলায় সাহায্য করেছেন।

"দারাজাতুন" দ্বারা এলমী এবং আমলী উভয় প্রকার মর্তবার কথাই বলা হয়েছে।[৩]

১ : তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা ৬১-৬২
২ : তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৯
৩ : তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৯

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক তাঁর জাতির বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখতে এবং তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সাহায্য করেছেন এবং একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে অনেক উচ্চ মর্তবা দান করেছেন। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রদত্ত মর্তবা এবং মর্যাদা হতে হবে পরিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, আমি ইব্রাহীমকে এসহাকের ন্যায় পুত্র দান করেছি যাঁর দ্বিতীয় নাম ছিল ইসরাঈল, আর বনী ইসরাঈল জাতি তাঁরই বংশধর। এবং ইব্রাহীমকে দান করেছি তাঁর পৌত্র ইয়াকুব (আঃ)।

كُلًّا هَدَيْنَاۚ

আর তাদের প্রত্যেককে আমি হেদায়েত দান করেছি। আর শুধু যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণ নবুওয়্যত লাভ করেছেন তাই নয়; বরং তাঁর পূর্ব পুরুষদেরকেও আমি নবুওয়্যত এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছি, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমি নূহকে হেদায়েত দান করেছি। হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষ। এজন্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়াকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে নেয়ামত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পিতার বুজর্গী এবং মর্তবা দ্বারা তার সন্তান এবং সন্তানের বুজর্গী ও মর্তবা দ্বারা পিতা বা পূর্ব পুরুষ গৌরবান্বিত হয়।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط

আর নূহ বা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে আমি হেদায়েত দান করেছি দাউদ (আঃ) এবনে আলিশাকে, সোলায়মান (আঃ) এবনে দাউদকে, আইউব এবনে আমুস এবনে রাজেখ এবনে রওম এবনে আইস এবনে এসহাক এবনে ইব্রাহীমকে এবং ইউসুফ এবনে ইয়াকুব এবনে এসহাককে, এবং মূসা এবনে এমরান এবনে ইয়াসমের এবনে কাহাত এবনে লাবী এবনে ইয়াকুবকে, আর মূসা (আঃ)-এর ভাই হারুনকে, যিনি মূসা (আঃ) থেকে এক বছর বড় ছিলেন। তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নেক কাজ করেছেন, আল্লাহ পাক তাদের নেক কাজের বিনিময় দান করেছেন।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ যেভাবে আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর সৎ কাজের বিনিময় দান করেছি, তাঁর মর্তবা বুলন্দ করেছি এবং তাঁর বংশধরদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেককে নবী মনোনীত করেছি ঠিক তেমনি আমি নেককারদেরকে বিনিময় দিয়ে থাকি।

এহসানে তাৎপর্য

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ এহসান কি? এর জবাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এহসান হলো তুমি আল্লাহর এবাদত এভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি এ অবস্থা হয় যে তুমি তাকে দেখতে সক্ষম না হও তবে নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রেখ যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। বস্তুতঃ যারা এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত করে আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

এদিকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষ, হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাক যে নেয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে, অন্যদিকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁরা নবী হয়েছেন এবং যাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের খাছ নেয়ামত রয়েছে এবং যাঁদেরকে আল্লাহ পাক বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন এখানে তাঁদের নামও উল্লেখ রয়েছে। যেমন হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক নবুওয়্যত এবং বাদশাহাত দান করেছেন এবং বিপদাপদে সবর করার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন হযরত আইউব (আঃ), তিনি কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত হয়ে সবরের কঠিন পরীক্ষা দিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁকে মিশরের ক্ষমতা দান করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ) পরস্পর ভাই ভাই ছিলেন।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ط

আর জাকারিয়া এবনে উজনকে এবং ইয়াহয়া এবনে জাকারিয়াকে এবং ঈসা এবনে মরয়ম বিনতে এমরানকে এবং ইলিয়াস এবনে মিতা এবনে ফোখাজ এবনে ইরাজ এবনে হারুনকে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ ইদ্রিস এবং ইলিয়াস একই ব্যক্তির নাম ছিল। যেমন, ইয়াকুব এবং ইসরাইল একই ব্যক্তির দু'টি নাম ছিল।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই তথা যাদের ঈমান হবে নিখুঁত-নির্ভেজাল একমাত্র তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা, আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত, তারাই লাভ করবে জান্নাত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম বড় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! মোমেন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের প্রতি জুলুম করেনা? এমন অবস্থায় দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভের পন্থা কি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আলোচ্য আয়াতে জুলুম অর্থ শেরক। তোমরা কি লোকমানের কথা লক্ষ্য করোনি? তিনি তাঁর পুত্রকে নসিহত করে বলেছিলেন ঃ

يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শেরক করোনা, নিশ্চয় শেরক সবচেয়ে বড় জুলুম"। (বোখারী, মুসলিম)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং অটুট বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ শেরক পরিহার না করে তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। শেরক মিশ্রিত ঈমান দ্বারা দোযখের আযাব থেকে নাজাত লাভ করা যায় না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুশরেকদেরকে এ প্রশ্ন করেছিলেন যে, দোযখের আযাব থেকে নাজাত লাভের যোগ্য কে? যখন কাফেররা কোন জবাব দিল না তখন তিনি নিজেই জবাব দিলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে শেরকের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা।

এবনে আবি হাতেম বকর সওয়াদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঈসলামের এক দুশমন মুসলমানদের প্রতি হামলা করে একজন মুসলমানকে হত্যা করে। দ্বিতীয় বার হামলা করে অন্য একজন মুসলমানকে হত্যা করে। তৃতীয়বার হামলা করে আরো একজন মুসলমানকে হত্যা করে। এরপর সে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং আরজ করে, এ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আমার উপকার হতে পারে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ হ্যাঁ।

সে ব্যক্তি তখন ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর নিজের সাথীদের উপর হামলা করে একে একে তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে। কোন কোন তফসীরকারের মতে, এ আয়াত উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।[১]

ঈমান ও তার শুভ পরিণতি

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। জরীর এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলছিলাম। আমরা যখন মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে আসি তখন দেখলাম এক ব্যক্তি উষ্ট্রের ওপর আরোহী অবস্থায় আমাদের দিকে আসছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এ ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এসেছে, আমাদের নিকট পৌঁছে সে আমাদেরকে সালাম দিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোথা থেকে এসেছ? সে বলল, আমি আমার পরিবারবর্গ এবং গোত্রীয় লোকদের নিকট থেকে এসেছি।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোথায় যাবে? সে বললো, আল্লাহর রসূলের সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ বল আমিই আল্লাহর রসূল। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে ঈমানের তা'লিম দিন। তিনি এরশাদ করলেনঃ বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল এবং নামায আদায় কর, যাকাত দাও, রমজানের রোজা রাখ, হজ্ব কর।

সে বলল, এসব বিষয় আমি মেনে নিলাম। এরপর সে রওয়ানা হলো। একটি জংলী ইদুরের গর্তের মধ্যে তার উষ্ট্রের পা পড়লে সে উষ্ট্রের পৃষ্ঠ থেকে নীচে পড়ে গেল। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এ ব্যক্তির খবর নেয়া আমার কর্তব্য। তখন সঙ্গে সঙ্গে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) এবং হযরত হোজায়ফা (রাঃ) দৌড়ে গিয়ে তাঁকে উঠালেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর তিনি অন্যদিকে ফিরে এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি জান আমি অন্যদিকে কেন ফিরলাম? আমি দু'জন ফেরেশতাকে দেখেছি তারা জান্নাতের ফল তার মুখে দিচ্ছে। তা দ্বারা আমি উপলব্ধি করলাম সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এ ব্যক্তি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ তারা ঈমানের সঙ্গে শেরককে মিশ্রিত করে নাই। এরপর তিনি এরশাদ করেন ঃ

১। তফসীরে মাজাহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৯

তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ব্যবস্থা কর। তাই আমরা তাকে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে সুগন্ধি মেখে দিলাম। যখন তাকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং কবরের পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে এরশাদ করলেনঃ বগলী কবর বানাও, উম্মুক্ত রেখোনা। আমাদের কবর বগলী, অন্যদের কবর উম্মুক্ত থাকে। এ ব্যক্তি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা সামান্য আমল করে অধিক সওয়াব লাভ করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ঘটনাটিকে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলছিলাম। তখন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি সম্মুখে আসলো এবং বললো, হে আল্লাহর রসূল! শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি আমার দেশ, পরিবারবর্গ এবং অর্থ-সম্পদ এজন্যে ছেড়ে এসেছি যেন আপনার দ্বারা হেদায়েত লাভ করতে পারি। আর আমি এভাবে আপনার নিকট পৌঁছেছি যে, পথে আমাকে ঘাস পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

এখন আমাকে দ্বীন শিখিয়ে দিন। তখন হযবত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন। সে তা কবুল করলো। আমরা তার চারি পার্শ্বে একত্রিত হয়েছিলাম। সে বিদায় নিয়ে যেতে লাগলো, তার উষ্ট্রের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে ফেঁসে গিয়েছিল। তাই সে পড়ে যায় এবং ঘাড় ভেঙ্গে গেল।

তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর শপথ! সে তার দেশ এবং সন্তান-সন্ততিকে ছেড়ে শুধু আমার নিকট থেকে হেদায়েত এবং দ্বীন অর্জন করার জন্যে এসেছিল, সে দ্বীনি তা'লিম হাসিল করেছিল। আমি একথাও জানতে পেরেছি যে, সে ভ্রমণ কালে ঘাস পাতা খেয়েই কাল যাপন করেছে। সে আমল করেছে সামান্য, কিন্তু বিনিময় পেয়েছে অনেক। তোমরা কি তাদের সম্পর্কে শ্রবণ করোনি যারা নিজের ঈমানের সঙ্গে শেরককে মিশ্রিত করেনি? তারাই শান্তি নিরাপত্তা লাভের প্রকৃত হকদার। আর এরাই হেদায়েত প্রাপ্ত এবং এ ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আবদুল্লাহ এবনে সানজারা থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যাকে দান করা হয়েছে, আর সে শোকর আদায় করেছে, আর যাকে দান করা হয় নাই সে সবর করেছে, আর যে জুলুম করেছে এরপর ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে, আর যার প্রতি জুলুম হয়েছে সে ক্ষমা করেছে। এ কথার পর তিনি নীরব হয়ে গেলেন, তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে কি পাবে?

তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি আল্লাহর আযাব হবে না, আর তারা হেদায়েত প্রাপ্ত।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ
نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ
وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَ
سُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَٰعِيلَ
وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ
وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾
ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ
عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ
وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا
بِكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ
أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٠﴾

তরজমা

(৮৩) আর এ হলো আমার যুক্তি প্রমাণ যা আমি ইব্রাহীমের জাতির বিরুদ্ধে তাকে দিয়েছিলাম, যাকে ইচ্ছা মান মর্যাদায় আমি তাকে উন্নতি দান করি। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সুবিবেচক, মহাজ্ঞানী।

(৮৪) আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং ইয়াকুব, তাঁদের প্রত্যেককে আমি হেদায়েত দান করি, আর সকলের আগে আমি নূহকে হেদায়েত দান করি এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে দাউদ ও সোলায়মান, আইয়ুব এবং ইউসুফকে, মূসা এবং হারুনকে আমি হেদায়েত দান করেছি, আর এভাবেই আমি নেককারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(৮৫) এবং জাকারিয়া, ইয়াহয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে হেদায়েত দান করি, তারা সকলেই নেকাকারদের অন্তর্ভুক্ত।

(৮৬) আর হেদায়েত করেছি ইসমাঈল, আলয়াছা ও ইউনুস এবং লূতকে। আর প্রত্যেককেই বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

(৮৭) তাদের পিতা, পিতামহদের তাদের সন্তান-সন্ততিদের এবং তাদের ভাইদের মধ্যে থেকেও কোন কোন জনকে হেদায়েত দান করি। তাদেরকে পছন্দ করি এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করি।

(৮৮) এ হলো আল্লাহ পাকের হেদায়েত, তিনি নিজের বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। যদি তারা শেরক করতো তবে তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত।

(৮৯) এরাই সে সব লোক যাদেরকে আমি কিতাব এবং কর্তৃত্ব আর নবুওয়্যত দান করেছিলাম। তবুও যদি মক্কাবাসীরা তা অমান্য করে তবে এজন্যে আমি এমন লোক নিদৃষ্ট করে দিয়েছি যারা তা অস্বীকার করেনা। (৯০) তারাই তো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছিলেন। অতএব, (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না। এ-তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ মাত্র।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তৌহীদের ব্যাপারে যে অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে আমিই ইব্রাহীমকে সমস্ত দলিল প্রমাণ দিয়েছি। যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সর্বগুণাকর, যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যিনি অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞানী, তিনিই তাঁর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এসব কথা বাতলে দিয়েছেন, যা তিনি তাঁর জাতিকে বলেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পৌত্তলিকদের আল্লাহ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে যে সব অকাট্য দলিল প্রমাণ শুনিয়েছেন, তার এলম আল্লাহ পাকই তাঁকে দান করেছেন। আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়েই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর দুশমনদের সার্থক মোকাবেলা করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো বলেছেন ঃ এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান এবং কুফর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়, আর একথা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় পরবর্তী বাক্য দ্বারাও। এরশাদ হয়েছেঃ

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۭ

আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্তবা বুলন্দ করি। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মর্তবা বুলন্দ করেছেন এভাবে যে, তাঁকে কাফেরদের মোকাবেলায় অকাট্য দলিল প্রমাণ পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। আলোচ্য আয়াতে دَرَجٰت শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এর অর্থ মর্তবা, আর

তার বহুবচন হলো দারাজাত। এর তাৎপর্য হলো আখেরাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নেক আমল সমূহের অনেক মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে। আর কেউ বলেছেন, 'দারাজাত' শব্দ দ্বারা সেই দলিল সমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা তিনি তাঁর জাতিকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে পেশ করেছেন কেননা, তাঁর এ সমস্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের জন্যে তিনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অনেক সওয়াব পাবেন।

আর কেউ কেউ এ আয়াতের এ অর্থ বলেছেন যে, আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দুনিয়াতে তার মর্তবা বুলন্দ করেন নবুওয়্যত এবং হেকমত দানের মাধ্যমে এবং আখেরাতে জান্নাত এবং সওয়াব দানের মাধ্যমে। আর কেউ কেউ এ আয়াতের এ অর্থও বলেছেন যে, আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তার মর্তবা বুলন্দ করেন, তাকে এলম বা জ্ঞানের নেয়ামত দানের মাধ্যমে।[১]

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত বিজ্ঞানময়, কোন লোকের মর্তবা বুলন্দ করার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। আর তিনি মহাজ্ঞানী, যাকে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তার যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকেন। আর যাকে তিনি উচ্চ মর্যাদা দান করেন না, তার সম্পর্কেও তিনি থাকেন সম্পূর্ণ অবগত। সব কিছুই থাকে তাঁর নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ تِلْكَ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে পৌত্তলিকদের যে কথা বার্তা হয়েছে তার প্রতি, এর বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের শেরকের বিরুদ্ধে এবং তৌহীদের পক্ষে তিনি যে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, এগুলো আমিই তাকে বাতলে দিয়েছি। একথাটি তফসীরকারদের এ বক্তব্যের দলিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বদাই তৌহীদ পন্থী ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিশেষ মর্যাদার কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাঁকে দুশমনদের মোকাবেলায় সাহায্য করেছেন।

"দারাজাতুন" দ্বারা এলমী এবং আমলী উভয় প্রকার মর্তবার কথাই বলা হয়েছে।[৩]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা ৬১-৬২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৯
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৯

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তাঁর জাতির বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখতে এবং তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সাহায্য করেছেন এবং একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে অনেক উচ্চ মর্তবা দান করেছেন। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রদত্ত মর্তবা এবং মর্যাদা হতে হবে পরিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, আমি ইব্রাহীমকে এসহাকের ন্যায় পুত্র দান করেছি যাঁর দ্বিতীয় নাম ছিল ইসরাঈল, আর বনী ইসরাঈল জাতি তাঁরই বংশধর। এবং ইব্রাহীমকে দান করেছি তাঁর পৌত্র ইয়াকুব (আঃ)।

كُلًّا هَدَيْنَا ج

আর তাদের প্রত্যেককে আমি হেদায়েত দান করেছি। আর শুধু যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণ নবুওয়্যত লাভ করেছেন তাই নয়; বরং তাঁর পূর্ব পুরুষদেরকেও আমি নবুওয়্যত এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছি, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমি নূহকে হেদায়েত দান করেছি। হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষ। এজন্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়াকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে নেয়ামত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পিতার বুজর্গী এবং মর্তবা দ্বারা তার সন্তান এবং সন্তানের বুজর্গী ও মর্তবা দ্বারা পিতা বা পূর্ব পুরুষ গৌরবান্বিত হয়।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط

আর নূহ বা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে আমি হেদায়েত দান করেছি দাউদ (আঃ) এবনে আলিশাকে, সোলায়মান (আঃ) এবনে দাউদকে, আইউব এবনে আমুস এবনে রাজেখ এবনে রওম এবনে আইস এবনে এসহাক এবনে ইব্রাহীমকে এবং ইউসুফ এবনে ইয়াকুব এবনে এসহাককে, এবং মূসা এবনে এমরান এবনে ইয়াসমের এবনে কাহাত এবনে লাবী এবনে ইয়াকুবকে, আর মূসা (আঃ)-এর ভাই হারুনকে, যিনি মূসা (আঃ) থেকে এক বছর বড় ছিলেন। তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নেক কাজ করেছেন, আল্লাহ পাক তাদের নেক কাজের বিনিময় দান করেছেন।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ যেভাবে আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর সৎ কাজের বিনিময় দান করেছি, তাঁর মর্তবা বুলন্দ করেছি এবং তাঁর বংশধরদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেককে নবী মনোনীত করেছি ঠিক তেমনি আমি নেককারদেরকে বিনিময় দিয়ে থাকি।

এহ্সানে তাৎপর্য

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ এহ্সান কি? এর জবাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এহ্সান হলো তুমি আল্লাহর এবাদত এভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি এ অবস্থা হয় যে তুমি তাকে দেখতে সক্ষম না হও তবে নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রেখ যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। বস্তুতঃ যারা এভাবে আল্লাহ্ পাকের এবাদত করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

এদিকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষ, হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাক যে নেয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে, অন্যদিকে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁরা নবী হয়েছেন এবং যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের খাছ নেয়ামত রয়েছে এবং যাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন এখানে তাঁদের নামও উল্লেখ রয়েছে। যেমন হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক নবুওয়্যত এবং বাদশাহাত দান করেছেন এবং বিপদাপদে সবর করার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন হযরত আইউব (আঃ), তিনি কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত হয়ে সবরের কঠিন পরীক্ষা দিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে মিশরের ক্ষমতা দান করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ) পরস্পর ভাই ভাই ছিলেন।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ط

আর জাকারিয়া এবনে উজনকে এবং ইয়াহয়া এবনে জাকারিয়াকে এবং ঈসা এবনে মরয়ম বিনতে এমরানকে এবং ইলিয়াস এবনে মিতা এবনে ফোখাজ এবনে ইরাজ এবনে হারুনকে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ ইদ্রিস এবং ইলিয়াস একই ব্যক্তির নাম ছিল। যেমন, ইয়াকুব এবং ইসরাইল একই ব্যক্তির দু'টি নাম ছিল।

কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আয়াতের বর্ণনা ধারা দ্বারা মনে হয় এ অভিমত সঠিক নয় কেননা, ইদ্রিস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন না; বরং নূহ (আঃ)-এর পিতার দাদা ছিলেন। নূহ (আঃ)-এর পিতা ছিলেন লামক। আর লামকের পিতা ছিলেন মোতাওয়াশরেক, তাঁর পিতা ছিলেন খানুক। আর খানুকের পিতা ছিলেন ইদ্রিস (আঃ), আদম সন্তানদের মধ্যে সর্ব প্রথম নবী ছিলেন আর মানব ইতিহাসে তিনিই সর্ব প্রথম কলম দ্বারা লেখার পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন।[১]

كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

যাঁদের উল্লেখ পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে তারা সকলেই নেককার ছিলেন, যাঁরা সগীরা কবীরা সকল গুনাহ থেকে পবিত্র ছিলেন। কেননা, যে আদেশ অমান্য করে অথবা নিষেধ লঙ্ঘন করে সে নেককার হতে পারেনা। তবে যে গুনাহর পর সঠিক তওবা করে ফেলে সে সালেহ হতে পারে। আর যে মাসুম বা বেগুনাহ হয় তাকে পরিপূর্ণ সালেহ বলা যায়।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط

আর ইসমাঈল এবনে ইব্রাহীমকে (যিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ব পুরুষ ছিলেন), আলয়াছা এবনে আখাতুব এবনে আজুবকে এবং ইউনুস এবনে মিতাকে এবং লূত এবনে হারানকে যিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতঃস্পুত্র ছিলেন।

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

"আর এদের প্রত্যেককে তাঁদের যমানার লোকদের উপর আমি ফজিলত ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছি"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁদের যমানার অধিবাসীদের উপর আল্লাহ পাক তাদেরকে ফজিলত দান করেছেন, আর তা তাদের যমানার অধিবাসী মানুষও হতে পারে, জ্বীনও হতে পারে, ফেরেশতাও হতে পারে।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেনঃ এ ফজিলতের কারণ হলো, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবুওয়্যত দানের মাধ্যমে তাঁদের যমানার সকলের উপর বিশেষ ফজিলত দান করেছেন। নবী ব্যতীত সকলের উপরই তাঁদের ফজিলত ছিল। হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮১
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮১

মাতা ছিলেন হাজেরা। হযরত আলয়াছা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তৌরাতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইউনুস (আঃ) ইরাকের মুসেল এলাকার নবী ছিলেন। নানুওয়া শহরে তাঁর মাজার রয়েছে। লূত এবনে হারান, এখন যেখানে البحر الميت রয়েছে (বর্তমান জর্ডান) তার তীরেই হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় বাস করতো। তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে আল্লাহ পাক আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম চারজন নবীর উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)। এরপর তাঁদের বংশধরদের মধ্যে আরো চৌদ্দজন নবীর উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন দাউদ (আঃ), সোলায়মান (আঃ), আইউব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), ইয়াহয়া (আঃ), ঈসা (আঃ), ইলিয়াস (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), আলইয়াসা (আঃ), ইউনুস (আঃ) এবং লূত (আঃ)। এভাবে মোট ১৮ জন আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

নবীগণকে যে ফজিলত প্রদান করা হয়েছে

আল্লাহ পাক তাঁদেরকে তাঁদের যমানায় বিশেষ মর্তবা ও অনেক ফজিলত দান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। যেমন ঃ

১. তাঁদের মধ্যে কোন কোন নবীকে নবুওয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহাতও দান করেছেন। আর তা লাভ করেছেন হযরত দাউদ (আঃ) এবং সোলায়মান (আঃ)।

২. মহা বিপদের পরীক্ষার পর উচ্চ মর্যাদা দান করা, যেমন– হযরত আইউব (আঃ)-কে এ মর্তবা দান করা হয়েছে।

৩. প্রথমে বিপদ, এরপর নেয়ামত। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে এ মর্তবা দেয়া হয়েছে।

৪. বিশেষ মোজেযা দানের মাধ্যমে তাঁদেরকে খাছ ফজিলত দান করা হয়েছে। যেমন– হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)।

৫. দুনিয়াত্যাগী হওয়ার মাধ্যমে উচ্চ মর্তবা দান করা হয়েছে। যেমন– হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ), আর এ কারণেই তাঁদেরকে সালেহ বা নেককার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬. আর যে সব আম্বিয়ায়ে কেরামের পৃথিবীতে কোন অনুসারী দল থাকেনি তারা হলেন ইসমাঈল (আঃ), আলয়াসা (আঃ), ইউনুস (আঃ) এবং লূত (আঃ)।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০০

হেদায়েত শব্দের তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ উপরোল্লেখিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো এখানে হেদায়েত শব্দের তাৎপর্য কি?

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দের তাৎপর্য হলো অনন্ত অসীম সওয়াব তথা জান্নাতের পথ প্রদর্শন। কেননা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন হেদায়েত শব্দটি উল্লেখের পর এরশাদ করেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

(আর এভাবে আমি নেককারদের বদলা দিয়ে থাকি।) আর তা এজন্যে যে, নেককারদের বদলা সওয়াব ব্যতীত আর কিছুই নয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে হেদায়েতের মর্মকথা হলো জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন। কারো কারো মতে, এ হেদায়েতের অর্থ হলো দ্বীনের দিকে হেদায়েত এবং মহান আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা। কেননা, তাঁরা সত্য সন্ধানে সাধনা করেছেন। তাই আল্লাহ পাক ঐ সাধনার বিনিময়ে তাঁদেরকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ যারা আমার পথে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি।

আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) আরো একটি কথা বলেছেন তা হলো নবুওয়্যত ও রেসালতের উচ্চ মর্তবা প্রদান। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে যখন এ শব্দটির সম্পর্ক হয় তখন তার এ অর্থই হয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াত সম্পর্কে আরো একটি কথা বলেছেনঃ যেহেতু এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ এই আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাঁদের যুগের সকল সৃষ্টির উপর ফজিলত দিয়েছি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাদের উপরও তাঁদের ফজিলত রয়েছে। কেননা, ফেরেশতারাও আল্লাহর সৃষ্টি।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম হাসান (আঃ) এবং হোসাইন (আঃ) আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের বংশধর। কেননা, হযরত ঈসা (আঃ) যদিও ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর নন, কিন্তু তাঁর মাতা মরয়ম (আঃ)-এর দিক থেকে তাঁকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ইমাম হাসান (আঃ) ও হোসায়েন (আঃ)-এর মাতা হযরত ফাতেমার (রাঃ) দিক থেকে তাঁরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশধর।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেনঃ হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ একবার ইয়াহয়া এবনে ইয়াসারকে বলেছেনঃ আমি শ্রবণ করেছি তুমি ইমাম হাসান (আঃ), হোসায়েনকে (আঃ) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত কর। অথচ তাঁরা হলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর সন্তান এবং আবু তালেবের বংশধর। এতদ্ব্যতীত, তুমি নাকি এ দাবীও কর যে, এর প্রমাণ পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। অথচ আমি পবিত্র কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি কিন্তু এর দলিল কোথাও দেখতে পাইনি। তখন ইয়াহয়া এবনে ইয়াসার বলেনঃ তুমি সূরা আনআ'ম পাঠ করনি? তাতে রয়েছে–

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ

লক্ষ্য কর এ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর বলে ঘোষণা করা হয়েছে অথচ তাঁর কোন পিতা ছিলনা, তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে জন্মলাভ করেছেন তবে হ্যাঁ তাঁর মাতা হযরত মরয়ম (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর। আর তাঁর মাতৃ সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাঁকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর বলা হয়েছে। তাহলে হযরত ফাতেফা (রাঃ)-এর সম্পর্কের ভিত্তিতে ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হোসায়েন (রাঃ) কেন আল্লাহর নবীর বংশধর হবেন না? তখন হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ বলল, তুমি ঠিক বলেছো।[২]

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج

"আর আমি তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে এবং তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এবং তাদের ভাইদের মধ্য থেকেও কোন কোন জনকে হেদায়েত দান করি। তাঁদের পছন্দ করি এবং সরল পথে পরিচালিত করি"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন আম্বিয়ায়ে কেরামের পূর্ব পুরুষ, তাঁদের বংশধর এবং তাঁদের ভ্রাতৃবৃন্দ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেছেন তাঁদেরকে নেয়ামত দান করেছেন, তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং তাঁদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে হেদায়েত করেছেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৮২

এরপর এরশাদ করেছেন ঃ

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

আর এটি হলো আল্লাহ্ পাকের হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। আর এ হেদায়েতের অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদের প্রতি ঈমান। কেননা এর পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"যদি তারা শেরক করতো তবে তাদের যাবতীয় আমল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক শেরককে কোন অবস্থাতেই মাফ করবেন না। শেরক হলো অমার্জনীয় অপরাধ। অন্য লোকতো দূরের কথা এমনকি, কোন নবীও যদি শেরক করেন তবে তাঁর সমস্ত নেক আমল ব্যর্থ হবে, আর তা হবে শেরকের কারণে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নিরঙ্কুশ তৌহীদ এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমেই মানুষ হেদায়েত লাভ করে, আর এ হেদায়েতেই নাজাতের পূর্বশর্ত। আর শেরক এত মারাত্মক এবং গুরুতর অপরাধ যে, এ অপরাধের কারণে মানুষের সারা জীবনের সকল সত্য-সাধনা পন্ড হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাকের এ অমোঘ বিধান সকলের জন্যেই প্রযোজ্য। যদি কোন নবী রসূল দ্বারাও ঘটনাচক্রে শেরক হয়ে যায় তবে তার ভয়াবহ পরিণাম তাঁকেও ভোগ করতে হবে। এর চেয়ে বড় সতর্কবাণী আর কি হতে পারে!

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

"(যাঁদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) তাঁরাই সে সব লোক যাঁদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, হেকমত দান করেছি এবং নবুওয়্যত দান করেছি"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হুকুম শব্দের ব্যাখ্যা হেকমতও হতে পারে, হুকুমতও হতে পারে। হুকুমত অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব উভয়ই হতে পারে। অথবা এর অর্থ সঠিকভাবে মোকদ্দমা সমূহের ফয়সালা হতে পারে।

فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ যদি মক্কার পৌত্তলিকরা কিতাব, শরীয়ত এবং নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে তবে আল্লাহর দ্বীনের ক্ষতি হওয়ার কোন কারণ নেই; বরং যারা ঈমান আনবে না তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, আমি দ্বীন ইসলামের জন্যে এমন লোক নিদৃষ্ট করে দিয়েছি যারা তা অস্বীকার করেনা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে মদীনাবাসী

আনসারগণকে, যাঁরা কাফেরদের মোকাবেলায় ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে অন্তরে স্থান দিয়েছেন এবং সারা আরব থেকে নির্যাতীত উৎপীড়িত অবস্থায় যাঁরা মদীনা তৈয়্যেবায় হাযির হয়েছেন তথা মোহজেরীনদের সঙ্গে মদীনাবাসী আনসারগণও পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে, এ আয়াতের মর্ম হলো সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম। আর সাহাবায়ে কেরামের পরে পারস্য বাসীসহ পৃথিবীর সকল দেশের যে সব লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

আবু রেজা আতারেদী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হলো যদি জমিনবাসী দ্বীন ইসলামের নীতি অস্বীকার করে তবে আমি আসমানের ফেরেশতাদেরকে প্রস্তুত করে রেখেছি, তারা দ্বীন ইসলামকে অস্বীকার করবে না।[১]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

অর্থাৎ এরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনের।

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

অতএব, (হে রসূল!) ইতিপূর্বে যে আম্বিয়ায়ে কেরামের কথা উল্লেখিত হলো আপনি তাঁদের পথে চলুন, তাঁদের পথ হলো তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। এর অর্থ হলো যেভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম সরল সঠিক পথে চলেছেন আপনিও সে ভাবে সরল সঠিক পথে চলুন।

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন, هُدَاهُمُ (অর্থাৎ তাঁদের হেদায়েত) এর অর্থ হলো তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস এবং দ্বীন ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহ। কেননা, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, আর দ্বীন ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহের ব্যাপারেও সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম একমতই ছিলেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এতে আদেশ রয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যেন তিনি অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম যেভাবে তৌহীদের প্রচার করেছেন তিনিও তা করেন। আর যেভাবে তাঁরা শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করেছেন তিনিও তা করেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮২

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমি যে তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিচ্ছি এবং আল্লাহ্ পাকের কালাম তোমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি তার জন্যে আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাইনা। যেভাবে আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের উম্মত থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করেননি ঠিক তেমনি আমিও তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ

এতো হলো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে একটি নসিহত। আম্বিয়ায়ে কেরামের এ তরীকা যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে যে, তাঁরা দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্যে কোন বিনিময় গ্রহণ করেননি। ঠিক তেমনি আমি তোমাদেরকে যে নসিহত করছি এবং আল্লাহ্ পাকের কালাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি তার জন্যে আমিও তোমাদের কাছ থেকে কোন বিনিময় চাই না।

وَمَا قَدَرُوا
اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ
اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ
قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَ
لَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ
مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى
صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

তরজমা

(৯১) তারা আল্লাহ পাকের যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, এজন্যেই তারা বলে যে, আল্লাহ পাক কোন মানুষের প্রতিই কোন কিছু অবতরণ করেননি। (হে রসূল!) বলুন, তাহলে মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন যাতে ছিল মানুষের জন্যে নূর এবং হেদায়েত, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর, আর অধিকাংশ

গোপন রাখ। তোমরা এবং তোমাদের পিতামহরা যা জানতো না তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। সেই কিতাব কে নাযিল করেছিল?

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকই নাযিল করেছিলেন। এরপর তাদেরকে ছেড়ে দিন, তাদের অবান্তর বিষয় নিয়ে তারা খেলায় মগ্ন থাকুক।

(৯১) আর এই কিতাব পবিত্র কোরআনকে আমি নাযিল করেছি তা অত্যন্ত বরকতময় এবং তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থক, যার দ্বারা (হে রসূল!) আপনি মক্কাবাসী এবং চারিপার্শ্বের লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করবেন। যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তারাই এতে ঈমান আনে এবং তারা নিজেদের নামায সম্পর্কে সতর্ক থাকে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়অতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যারা তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে অবিশ্বাসী ছিল তাদের প্রতিবাদ এবং প্রতি-উত্তর ছিল ঐ আয়াত সমূহে। আর যারা নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে তাদের জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

শানে নুযুল

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে যোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মালেক এবনে দাইফ নামক এক ইহুদী তার সঙ্গীদের নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে তাঁর দরবারে হাযির হয় এবং ঝগড়া শুরু করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি তৌরাতে একথা পেয়েছ যে, আল্লাহ পাক স্থুলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না। মালেক এবনে দাইফ ছিল বেশ স্থুল দেহী ব্যক্তি। একথা শ্রবণ করে সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলল, "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ পাক কোন মানুষের প্রতি কোন কিতাব নাযিল করেননি"। তখন তার সঙ্গীরা একথা শ্রবণ করে বলেলঃ আরে তুমি কি বলছ?

আল্লাহ পাক কি মূসা (আঃ)-এর প্রতি কিতাব নাযিল করেননি? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদের সম্পর্কে। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। ফোখাজ নামক ইহুদী অথবা মালেক এবনে দাইফ নামক ইহুদী

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৩

সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে এসব কথা লিপিবদ্ধ করার পর বলেছেন, এ আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর ইহুদীরা সাধারণত একথা মানতো যে, তৌরাত গ্রন্থ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এ আয়াত মক্কার পৌত্তলিকদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। কেননা তারা একথা মনে করতো যে, কোন মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাক কোন কিতাব নাযিল করেননি, যেমন কোরআনে করীমেই তাদের অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

"মানুষের জন্যে কি একথা বিস্ময়কর যে, আমি তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির নিকট ওহী নাযিল করেছি? যেন সে মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে"।[১]

আয়াতের মর্মবাণী

আল্লাহ্ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। এটি আল্লাহ্ পাকের নিতান্ত করুণা যে, তিনি মানুষের হেদায়েতের বাস্তব ব্যবস্থা করেছেন, এটি তাঁর শ্বাশত নীতি। আর শুধু নবী রসূলগণই প্রেরিত হননি এবং এর পাশাপাশি বিশিষ্ট রসূলগণের নিকট আল্লাহ পাক আসমানী গ্রন্থও নাযিল করেছেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট তৌরাত, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ইঞ্জিল, হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি যবুর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে এবং মানুষকে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের এবং সরল সঠিক পূণ্য পন্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে।

যারা মানবতার দুশমন, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বিদ্বেষী এবং হিংসুক, যারা তাঁর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করতো তারা বলেছিল আল্লাহ পাক কারো প্রতি কোন কিতাব নাযিল করেননি। অথচ এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর কিছুই হতে পারে না, মানুষের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহর রসূলের আগমন এবং আসমানী গ্রন্থের অবতরণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিরাট এবং বিশেষ নেয়ামত। এ নেয়ামতকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্ পাকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শুধু তাই নয়; বরং এর অর্থ আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করা, এর চেয়ে বড় নাফরমানী আর কি হতে পারে!

তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৮৩

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ

আর তারা আল্লাহ পাকের যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। তারা আল্লাহ পাককে সম্পূর্ণ ভাবে এবং সঠিক ভাবে চিনতে পারেনি। তাই তারা এমন অন্যায় কথা বলেছে যে, আল্লাহ পাক কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু নাযিল করেননি। এরপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেনঃ তোমরাই বল যে, মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত কে নাযিল করেছেন? যে তৌরাত ছিল নূরে পরিপূর্ণ উজ্জল, আলোকময় এবং মানুষের জন্যে হেদায়েতে পূর্ণ। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যা জানতে না তৌরাতের মাধ্যমে তা জানতে পেরেছ।

এটি তোমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তোমরা তৌরাতের ন্যায় মহাগ্রন্থ পেয়েও তার কদর করোনি, বরং তোমাদের স্বার্থের কথা যেখানে আছে সে পাতাগুলো ছিড়ে ছিড়ে তোমরা মানুষকে দেখাও আর তৌরাতের অধিকাংশই তোমরা মানুষ থেকে গোপন রাখ।

কাফেররা ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

এরপর আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি নিজেই ঘোষণা করুন যে, আল্লাহ পাকই তৌরাত নাযিল করেছেন, আর আল্লাহ পাকই পবিত্র কোরআন সহ সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। (হে রসূল!) এ কাফেররা আপনার নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে, পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করছে, তারা ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে তারা ধ্বংস হোক। কিন্তু আপনার প্রতি দ্বীন ইসলামের প্রচারের যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আপনি পালন করতে থাকুন, তাদের অবান্তর, অনর্থক বাজে কথায় তাদেরকে লিপ্ত থাকতে দিন, তারা মরণ খেলায় মেতে উঠেছে, তাদের সে অবস্থায় থাকতে দিন।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা দাবীর বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের মিথ্যা দাবী ছিল "আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিতাব প্রেরণ করেননি"। এর জবাবে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেনঃ "তৌরাত কে নাযিল করেছিল"?

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি বলুন, আল্লাহ পাকই নাযিল করেছেন। এরপর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যা তোমাদের সম্মুখে স্বমহিমায় বর্তমান রয়েছে, যার মোকাবেলা

করা সমগ্র বিশ্ব শক্তি একত্রিত হয়েও সম্ভব নয় তথা সমগ্র বিশ্ববাসী তাদের সকল শক্তিকে একত্রিত করে চেষ্টা করলেও পবিত্র কোরআনের তিনখানি আয়াতের সমতুল্য কোন বাণী তারা পেশ করতে সক্ষম হয়নি, সেই বাণী আল্লাহ্ পাকই নাযিল করেছেন, "যা মোবারক তথা বরকতময়"। তফসীরকারগণ এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো যার উপকারীতা অনেক, যার বরকত স্থায়ী এবং অশেষ, যা সওয়াব এবং মাগফেরাতের সুসংবাদ দেয়, যা পাপাচারে লিপ্ত লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে।

মানুষের জ্ঞান সাধনার সঠিক উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা। আর এ উদ্দেশ্য পবিত্র কোরআন দ্বারা যতটা অর্জিত হয় পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থ দ্বারা তা হয়না। একথার পর ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে–

يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقليمة والعقلية، فلم يحصل لى بسبب شىء من العلوم من أنواع السعادات فى الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم

এ গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ এবনে ওমর রাজী (রঃ) বলেছেন, আমি জীবনে অনেক প্রকার এলম হাসিল করেছি। কিন্তু কোন এলম দ্বারা আমি দ্বীন দুনিয়ার এত কল্যাণ লাভ করিনি যা পবিত্র কোরআনের এলমের খেদমতের মাধ্যমে লাভ করেছি।[১]

مُّصَدِّقُ الَّذِى بَيۡنَ يَدَيۡهِ

আর এই কিতাব পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে একথাই যথেষ্ট যে, এই কিতাব পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়ন করে। আর এই কিতাবের মাধ্যমে (হে রসূল!) আপনি ভয় প্রদর্শন করবেন মক্কাবাসী এবং তার চারিপার্শ্বের লোকদেরকে।

মক্কা-পল্লী জগতের জননী

মক্কা শহরকে "উম্মুল কোরা" বলার কারণ এই যে, এ শহর থেকেই পৃথিবীর বিস্তৃতি শুরু হয়েছে। অথবা এর কারণ এই মক্কা শরীফেই রয়েছে বিশ্ববাসীর কেবলা। "উম্ম" শব্দটির অর্থ হলো জননী। অতএব, উম্মূল কোরা অর্থ সমগ্র পল্লী জগতের জননী।

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির সময় সর্ব প্রথম মক্কার জমিনই সৃষ্টি হয়।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৮০

ভৌগলিক দিক থেকে মক্কা শহর হলো পৃথিবীর মধ্যস্থল। এজন্যে তাকে পৃথিবীর নাভী বলা হয়। তাই মক্কা শহরকে "উম্মুল কোরা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন সর্ব প্রথম সেখানেই নাযিল হয়েছে। আর এ শহরেই জন্মগ্রহণ করেছেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

مَنْ حَوْلَهَا ط

অর্থাৎ "যারা এ শহরের চারিপার্শ্বে রয়েছে" তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো মক্কার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম তথা সারা বিশ্বে যত মানুষ বাস করে সকলকে পবিত্র কোরআন দ্বারা ভয় প্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি। তিনি বিশ্বনবী, আর তাঁর প্রতিই নাযিল হয়েছে বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআন।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি সমগ্র মানব জাতির নিকট আল্লাহর রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।) আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

(বরকতময় সেই আল্লাহ পাক, যিনি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন তাঁর বন্দার প্রতি, যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে ভয় প্রদর্শক।)

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ

(আর (হে রসূল!) আহলে কিতাব এবং উম্মীদেরকে আপনি বলুন, তোমরা কি ঈমান এনেছ? যদি তারা ঈমান আনে তবে তারা হেদায়েত লাভ করেছে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়াই আপনার কর্তব্য।)[১]

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৮৪

অর্থাৎ যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যাদের অন্তরে থাকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চিন্তা, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি। তারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে তৎপর থাকে।

وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

আর তারা নামাযের হেফাজত করে তথা অত্যন্ত যত্ন সহকারে নমায আদায় করে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধের মধ্যে বিশেষ ভাবে নামাযের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে নামায হলো দ্বীন ইসলামের খুঁটি। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছেঃ

الصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ - الحديث

নামায হলো দ্বীন ইসলামের খুঁটি। যে নামাযকে পরিত্যাগ করেছে সে যেন দ্বীন ইসলামের খুঁটিকে ভেঙ্গে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পরোক্ষ ভাবে একথা এরশাদ হয়েছে যে, ইহুদীরা পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, মূলতঃ তারা আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাস করেনা, এমনকি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ তৌরাতের প্রতিও তারা বিশ্বাস করেনা।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ
مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظّٰلِمُونَ فِي غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ ۚ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ ۗ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ
وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ
فِيكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৬

তরজমা

(৯৩) সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যে মহান আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, অথবা বলে আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। যদিও তার নিকট কিছুই অবতীর্ণ হয় না, অথবা যে বলে আল্লাহ পাক যা অবতরণ করেছেন আমিও তদ্রুপ অবতরণ করব। (হে রসূল!) যদি আপনি দেখতেন সে দৃশ্য, যখন পাপীষ্ঠরা মৃত্যু যন্ত্রণায় জর্জরিত থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হস্ত প্রসারণ করে বলবে, "তোমাদের প্রাণ বের কর"। তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতে এবং তাঁর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, এজন্যে আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে।

(৯৪) তোমাদেরকে প্রথমবারে যেমন সৃষ্টি করেছিলাম ঠিক তেমনি তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যা তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ। তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে শরীক মনে করতে সেই সুপারিশকারীদেরকে তোমাদের সঙ্গে দেখছি না। তোমাদের সকল সম্পর্ক আজ ছিন্ন। আর তোমরা যা ধারণা করেছিলে তা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যারা নবুওয়্যতকে অস্বীকার করত তাদের প্রতিবাদ ছিল। আর এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবী করেছিল। যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছিল। এ দূরাত্মারা কয়েক প্রকারে বিভক্ত ছিল। এক প্রকার লোক ছিল যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করত কিন্তু নিজেদের জন্যে নবুওয়্যতের দাবী করত না।

দ্বিতীয় প্রকার লোক ছিল তারা, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করত অথচ নিজেদের নবুওয়্যতের দাবী করত এবং একথাও দাবী করত যে তাদের নিকট ওহী আসে। যেমন মুসায়লামাতুল কাজ্জাব এবং আসআদ আনাসী। এরা উভয়ে নিজেদের নবুওয়্যতের দাবী করত। আর মুশরেকদের মধ্যে নজর এবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে বলত, আমরা ইচ্ছা করলে এমন বাণী তৈরী করতে পারি এবং পবিত্র কোরআনের ন্যায় কিতাব রচনা করতে পারি। এরা সে সব লোক যারা পবিত্র কোরআনকে আসমানী কিতাব মনে করতে না; বরং তারা মনে করত হয়তো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন নিজেই রচনা করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। নজর এবনে হারেস একথাও বলত যে, যদি আমার উপর কোন বিপদ আসে তবে লাত

এবং ওজ্জাহ নামক মূর্তি আমার সুপারিশ করবে। ইসলামের এ চরম শত্রুদের জবাবে আলোচ্য আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে।[১]

শানে নুযুল সম্পর্কে আরো কথা

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন ঃ ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব সম্পর্কে। এ লোকটি গণক ছিল। আর গণকদের ন্যায় ছন্দময় কথাবার্তা বলত। সে নবুওয়্যতের দাবী করেছিল। সে বলত, আমার নিকট ওহী আসে।

এবনে জরীর একরামার (রঃ) সূত্রে একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মুসায়লামা দু'জন দূত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে প্রেরণ করেছিল। তিনি তার দূতদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি মুসায়লামাকে নবী হিসেবে মান? তখন তারা বলল, জ্বী-হ্যাঁ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যদি দূত হত্যা না করার বিধান না হতো তবে তোমাদের উভয়কে হত্যা করা হতো।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি নিদ্রিত ছিলাম। ঐ অবস্থায় আমাকে পৃথিবীর ভান্ডার সমূহের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে এবং দু'টি স্বর্ণ নির্মিত বাজুবন্দ আমার হাতে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমি তা লক্ষ্য করে অত্যন্ত অপছন্দ করলাম। আমার বেশ কষ্ট হলো। তখন আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হলো। এ দু'টির উপর ফুঁক দাও। আমি ফুঁক দিলাম। তখন বাজুবন্দ দু'টি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের এ তা'বীর করলাম যে, স্বর্ণের বাজুবন্দ দু'টি হলো দু'জন মিথ্যবাদী। একজন হলো সানআর অধিবাসী আর দ্বিতীয়জন হলো ইয়ামামার অধিবাসী। সানআর অধিবাসী হলো আসাআদ আনাসী এবং ইয়ামামার অধিবাসী ছিল মুসায়লামাতুল কাজ্জাব। উভয় মিথ্যুকই মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবী করেছিল।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেনঃ মুসায়লামাতুল কাজ্জাব বলতো, (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কোরায়শের রসূল আর আমি বনী হানীফা গোত্রের রসূল (নাঊজুবিল্লাহ) এভাবে সে শুধু যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের অস্বীকার করতো তাই নয়; বরং নিজের রেসালতের মিথ্যা দাবীও করতো। এমনিভাবে, আসআদ আনাসীও নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবী করে। এদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৫৫১২

وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে যে বলে, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, আমিও তদ্রুপ নাযিল করব"।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নজর এবনে হারেস এবং আবদুল্লাহ এবনে সা'দ আবী সারাহ সম্পর্কে। ইমাম কুরতবী (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ এবনে সা'দ আবী সারাহ সম্পর্কে। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক ওহী লিপিবদ্ধ করতো। পরে মুরতাদ হয় এবং পৌত্তলিকদের সঙ্গে মিলিত হয়। আর একরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নজর এবনে হারেস সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এই আবদুল্লাহ এবনে আবি সারাহ ছিল হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দুগ্ধ ভ্রাতা। অনেক দিন মুরতাদ থাকার পর মক্কা বিজয়ের দিন যখন শ্রবণ করল যে তাকে হত্যা করা হবে তখন সে আত্মগোপন করে, এরপর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সুপারিশ নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। তখন থেকে খাঁটি মুসলমান হন। এরপর ইসলামের খেদমতে অনেক অবদান রাখেন। মিশর বিজয়ে এবং আবিসিনিয়া বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দোয়া অনুযায়ী ফজরের নামাযের সালাম ফেরানোর সময় মৃত্যুবরণ করেন।[১] মতান্তরে সেজদারত অবস্থায় এন্তেকাল করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) তার মুরতাদ হওয়ার ঘটনা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ এবনে আবি সারাহ মুসলমান হওয়ার পর ওহী লেখক হিসেবে মনোনীত হন।

কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাকে লিখতে আদেশ দিতেন سَمِيْعًا بَصِيْرًا সে লিখত عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম عَلِيْمًا حَكِيْمًا লিখতে আদেশ দিতেন সে তখন লিখতো غَفُوْرًا رَّحِيْمًا যখন এ আয়াত

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

নাযিল হয় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত লিপিবদ্ধ করান, এতে মানব সৃষ্টির বর্ণনা অতি পছন্দনীয় এবং মনোমুগ্ধকর হয়। তখন সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াত তার মুখে উচ্চারিত হয়ঃ

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০২

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাল্লাম এরশাদ করেন, এ আয়াত এভাবেই নাযিল হয়েছে তুমি তা লিপিবদ্ধ কর। এ সময় আবদুল্লাহর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হন তবে যেভাবে তাঁর নিকট ওহী আসে ঠিক সেভাবে আমার নিকটও এসেছে (আমিও নবী হয়ে গিয়েছি, নাঊযুবিল্লাহ)। আর যদি তিনি সত্যবাদী না হন (নাঊজুবিল্লাহ) তবে যেভাবে তিনি বলেন আমিও সেভাবে বলেছি। তার নিজের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামর সম্পর্কে এ সন্দেহের কারণে সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং দূরাত্মা পৌত্তলিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এবনে জরীর একরামা এবং সুদ্দীর সূত্রে এ আয়াত সম্পর্কে আলোচ্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বগভী লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "মাররুজ জাহরান" নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন তখন আবদুল্লাহ দ্বিতীয়বার ইসলাম কবুল করেন।[১]

اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এর অর্থ হলো যারা একথা দাবী করে যে, তাদের নিকট ওহী এসেছে প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের নিকট কোন ওহী আসেনি। তারা এবং নবুওয়্যতের সকল মিথ্যাবাবীদার এ আয়াতের আওতায় এসে গেছে। তাদের সকলের জন্যেই এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) তাঁর তফসীরে বয়ানুল কোরআনে এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে অথবা তার নিকট এলহাম হয়েছে একথার মিথ্যা দাবী করে কিংবা তার নিজের ধারণাকে গায়বী ফয়েজ বলে প্রকাশ করে তবে সে-ও এ আয়াতের আওতায় পড়বে।[২] এমনকি, তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি শরীয়তের কোন মাসআলা সম্পর্কে ছলফে ছালেহীনের মতের তোয়াক্কা না করে একথা বলে যে অমুক মাসআলায় আমার রায় হলো এই, আর যে মাসআলা কিতাবে বর্ণিত আছে তা সাধারণ মানুষের জন্যে, আমার ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে নয়। এমন ব্যক্তিও আলোচ্য আয়াতে উচ্চারিত সতর্কবাণীর আওতায় পড়বে।[৩]

আয়াতের মর্মকথা

যারা আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবী পূর্ণ মন্তব্য করে তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় যেমন তারা বলে আল্লাহর শরীক আছে, তিনি কোন পয়গম্বর প্রেরণ করেননি,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৭
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯০
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯০

'তিনি কোন ওহী প্রেরণ করেননি' তারা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় জালেম। এভাবে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে এবং যারা নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবী করে এবং বলে, আল্লাহর ওহী তাদের নিকট আসে অথবা যারা একথা বলে, আমরা ইচ্ছা করলে পবিত্র কোরআনের ন্যায় বাণী পেশ করতে পারি। এরা সকলেই সবচেয়ে বড় জালেম এবং অপরাধী। তাদের অপরাধ অমার্জনীয় এবং তাদের কঠিন শাস্তি অবধারিত।

وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ

(হে রসূল!) তাদের এ অন্যায় আচরণ এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়েকটি দিনই। এরপর যখন মৃত্যুর অলজ্ঘনীয় বিধান তাদের উপর কার্যকর হবে, যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় তারা জর্জরিত হতে থাকবে, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ সংহার করবে এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের দিকে হাত বাড়াবে তখন তারা বলবে, এতদিন নানা কৌশলে তোমরা আত্মরক্ষা করেছিলে কিন্তু আজ আর রক্ষা নেই, তোমাদের ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে। অতএব, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। অর্থাৎ তাদের দুর্গতি, অপমান ও চরম কষ্ট অনিবার্য। আর তা তাদের অহংকার এবং আল্লাহ পাকের প্রতি অপবাদ দেয়ার শাস্তি স্বরূপই হবে।

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ

অর্থাৎ সেদিন ফেরেশতাগণ বলবেন, আজকে মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অপমান জনক কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে অর্থাৎ এমন শাস্তি প্রদান করা হবে যাতে থাকবে লাঞ্ছনা এবং অপমান, আর থাকবে তাতে কঠোরতা।

بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ

কেননা, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতে, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করতে, তাঁর স্ত্রী পুত্র আছে বলতে, তোমরা নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবী করতে এবং তোমাদের নিকট কোন দিন ওহী আসেনি অথচ তোমরা এ সম্পর্কে মিথ্যা দাবী করতে।

وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ

তোমরা পবিত্র কোরআনের আয়াত সম্পর্কে অথবা তৌহীদের দলিল সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। এর দলিল সমূহ অমান্য করতে এমনকি তার সম্পর্কে চিন্তা করতেও প্রস্তুত হতে না। তোমাদের এ সমস্ত অন্যায় অনাচারের কারণেই রয়েছে তোমাদের জন্যে কঠোর শাস্তি।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ

নজর এবনে হারেস বলেছিলে যে, আল্লাহ পাকের নিকট লাত এবং ওজ্জাহ নামক মূর্তি আমার সুপারিশ করবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের মর্মকথা এই, মৃত্যুর পর এবং কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমার নিকট এসেছ, তোমাদের অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ তোমাদের সঙ্গে আসেনি। কেউ তোমাদের সাহায্যকারী নেই। অথবা এর অর্থ হলো যে মূর্তি গুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল যে তারা তোমাদের সুপারিশকারী হবে তারাও তোমাদের সঙ্গে আসেনি।

যেভাবে আমি তোমাদের সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম একা আর যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম নগ্ন ঠিক সেভাবেই তোমরা আমার নিকট হাযির হয়েছ। তোমাদের ধন-সম্পদ, খাদেম-খেদমতগার, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন সবই তোমরা পেছনে রেখে এসেছ, কিছুই তোমাদের সঙ্গে আসেনি, অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো, যেভাবে তোমরা জন্ম গ্রহণ করেছিলে, তোমরা ছিলে খালি হাত, ঠিক তেমনি খালি হাতেই তোমরা ফিরে এসেছ, তোমাদের আসল পুঁজি ছিল বয়স তা তোমরা ধ্বংস করে এসেছ আর আমার প্রদত্ত ধন-সম্পদ কিছুই আখেরাতের জন্যে প্রেরণ করোনি। এ সমস্ত কথাবার্তা কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে যে, পৃথিবীতে তোমরা যেসব বিষয়ের কারণে অহংকার করতে যেমন তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের দলবল, তোমাদের সৈন্যবাহিনী, তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, উর্দি আজ সেসব কেথায়? কিছুই যে তোমাদের সঙ্গে নেই যা কিছু আমি দান করেছিলাম সবই যে তোমরা রেখে এসেছ পেছনে।

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰؤُا ط

আর আমরা তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তারা আল্লাহ পাকের শরীক অর্থাৎ সেই দেব-দেবী বা মূর্তিগুলো তোমাদের সঙ্গে আসেনি, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ পাকের শরীক মনে করেছিলে। যাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তারা আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের জন্যে সুপারিশকারী হবে। কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তোমরা তাদের সম্পর্কে যে ধারণা করেছিলে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারেনি, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল, আর সে ভুলেরই মাশুল আদায় করতে হবে তোমাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তির মাধ্যমে।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

তরজমা

(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ পাকই শষ্য বীজ ও আটি অংকুরিত করেন। তিনিই মৃত থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকেও মৃতকে বের করেন। এই তো আল্লাহ পাক, অতএব, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় ফিরে যাবে?

(৯৬) তিনিই যে ভোরের আলোক বিদারণ করেন, আর তিনিই বিশ্রামের জন্যে রাত্রিকে এবং গণনার জন্যে সূর্য ও চন্দ্রকে তৈরী করেছেন। এসবই মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণাধীন।

(৯৭) আর তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। নিশ্চয় আমি নিদর্শন সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে।

(৯৮) আর তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। আর তোমাদের জন্যে রয়েছে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে আমি নিদর্শন সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নবুওয়্যতের বয়ান ছিল। বর্তমান আয়াতে পুনরায় তৌহীদ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। সূরার শুরু থেকে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিবরণই ছিল। আর সকল জ্ঞান সাধনার মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা। এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের

বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের উল্লেখ করেছেন, যাতে করে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখে পথহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়।

যারা পৌত্তলিক, তারা নিজেদের হস্তে প্রস্তুত মূর্তিগুলোর উপাসনা করে। অথচ তাদের কোন শক্তি নেই, তাদের পূজারীরাই তাদেরকে নির্মাণ করে। এর চেয়ে বড় হাস্যাস্পদ কাজ আর কি হতে পারে? আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক তাঁর পরিচয় লাভের জন্যে কয়েকটি দলিল পেশ করেছেন যা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই মনে দাগ কাটে এবং এ দলিল সমূহের স্বচ্ছ দর্পণে তারা সত্যকে স্বচক্ষে দেখতে পারে।[১]

আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ

এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط

হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! দেখ আল্লাহ পাকের কুদরত কত বিস্ময়কর, তাঁর সৃষ্টি–নৈপূণ্য কত নিখুঁত, কত সুন্দর! তোমরা মাটিতে বীজ এবং দানা পুঁতে রাখ, এরপর তোমরা দেখ যে, জমিনকে বিদীর্ণ করে একটি মসৃণ চারা গজিয়ে উঠেছে। তোমরা কি আদৌ চিন্তা করেছ এ নরম, মসৃণ চারাটি কিভাবে জমিনের বক্ষ বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসল? কে করেছেন এ কাজটি?

একমাত্র আল্লাহ পাক। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরই কর্তৃত্বাধীন, তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আসমান জমিনে যত কিছু আছে সবই তাঁর অনুগত"।

আরো লক্ষ্য কর, একটি বীজ থেকে যে চারা বের হলো সে চারা একদিন মহীরুহে পরিণত হয়। প্রশ্ন হলো, কে করেন?

একই জবাব, এক আল্লাহ পাক। আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, এ চারা যে বৃক্ষে পরিণত হলো তাতে যে ফল আসলো সে ফলের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। এ পার্থক্য কে করেন? জবাব একই তথা সবই আল্লাহ পাক করেন। তাঁর সৃষ্টি বিস্ময়কর। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তিনি সর্ব গুনাকর, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান।

হে মানব জাতি! আরো লক্ষ্য কর, তিনি জীবিত থেকে মৃতকে এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন। মানুষ থেকে বীর্য, আর বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করা এক আল্লাহ পাকেরই অনন্য কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫০৫
তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৮৯

এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাও? তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের বন্দেগীর যোগ্য নয়।

অতএব, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, তিনিই মহা পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর সম্মুখেই মাথা নত কর।

লক্ষ্য কর একটি ডিম থেকে মুরগীর বাচ্চা, আর মুরগী থেকে ডিম বের করা আল্লাহ পাকেরই কাজ।

তফসীরকারগণ এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, মোমেন জীবিত এবং কাফের মৃত। অথচ আল্লাহ পাক কাফের থেকে মোমেনকে এবং মোমেন থেকে কাফেরকে বের করে আনেন, এটি তাঁরই অনন্য মহিমা, আর কারো নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা আজর ছিল কাফের আর অন্য দিকে হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র ছিল কাফের। কাফের পিতার পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নবী এবং বন্ধু হলেন আর আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র হলো কাফের। এসব বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ঈমানের তৌফিকের জন্যে শোকর গুজার হতে হয় এবং ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হয়।[১]

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

যিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা, যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক তিনিই যে আল্লাহ, তোমরা তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাও?

অথবা এর অর্থ হলো তোমরা অহরহ দেখ যে, আল্লাহ পাক জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন। তোমরা দেখ প্রাণহীন বীর্য থেকে তিনি জীবন্ত মানুষকে বের করে আনেন, তাহলে মৃত মাটি থেকে জীবন্ত মানুষকে বের করে আনা এবং হাশরের ময়দানে একত্রিত করাকে তোমরা কেন কঠিন মনে কর? অথচ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের জন্যে কোন কিছুই কঠিন নয়। যারা কেয়ামতের ময়দানের উপস্থিতিকে অস্বীকার করে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যেই এ বাক্যের অবতারণা।[২]

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا

আল্লাহ পাকের একত্ববাদের আরো একটি জীবন্ত নিদর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতাংশে। রাতের ঘন অন্ধকারকে কে দূরীভূত করেন? কে সুবহে সাদেকের আলো দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেন?

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫০৫
তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৯৪

জবাব একটিই, আর তা হলো এক আল্লাহ পাকই সব কিছু করেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে যে দলিল পেশ করা হয়েছে তা ছিল ভূমন্ডল সম্পর্কিত। আর আলোচ্য আয়াতে যে দলিল পেশ করা হয়েছে তা হলো নভোমন্ডল সম্পর্কীয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ লক্ষ্য কর আল্লাহ পাকের এ নেয়ামতের প্রতি যে, তিনি তোমাদের জন্যে রাতের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে সমগ্র বিশ্বকে আলোকময় করে দিচ্ছেন, যাতে করে তোমরা স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে সক্ষম হও, এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ দান। তিনিই তো তোমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে তিনিই সব কিছু দিয়েছেন। যেখানে গোমরাহীর অন্ধকার ছিল সেখানে তিনি হেদায়েতের আলো বিতরণ করেছেন।

ঠিক এমনিভাবে তিনি রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে আলো দিয়েছেন। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ তিনি তোমাদের জন্যে রাতকে শান্তিদায়ক করেছেন। যেভাবে দিনের আলো তোমাদের জন্যে নেয়ামত, ঠিক তেমনি রাতের অন্ধকারও তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের এক বিশেষ নেয়ামত। কেননা, সারা দিনে কর্মক্লান্ত হওয়ার পর মানব দেহ বিশ্রাম চায়, এটি মানুষের স্বভাবগত চাহিদা। আল্লাহ পাক রাতের অন্ধকারকে মানুষের বিশ্রামের জন্যে নিদৃষ্ট করে মানুষের প্রতি বিরাট এহসান করেছেন। যদি প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত তার বিশ্রামের সময় নিদৃষ্ট করতো তবে কারোই বিশ্রাম হতো না কেননা, প্রত্যেকেই নিজের বিশ্রাম সেরে অন্যের বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো। যদি পৃথিবীর সকল সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্রামের জন্যে সময় নিদৃষ্ট করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতো তবুও বিশ্রাম হতো না। কেননা, আক্ষরিকভাবে কেউ চুক্তি মেনে চলতো না।

দ্বিতীয়ত, যদি মানুষ চুক্তি মানতও কিন্তু জীব-জন্তুকে এ চুক্তি কে মানাতো? অথচ আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিশ্রামের জন্যে সময় নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন যাতে করে কর্মক্লান্ত মানুষ রাতের অন্ধকারে বিশ্রাম করে পরদিন ভোরে নব উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)। এর এ অর্থ হতে পারে, আল্লাহ ওয়ালাগণ সারা দিন বন্দাদের সাথে মশগুল থাকেন আর রাত্রিবেলা আল্লাহ পাকের জিকরের মাধ্যমেই বন্দা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে। রাত্রি বেলা যখন সারা বিশ্বের মানুষ নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর জিকরে মশগুল হন এবং আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯০

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক চন্দ্র সূর্যকে সময়ের হিসাবের মাধ্যম করেছেন। মানুষ এর দ্বারা মাস এবং বছরের হিসাব ঠিক করে। চন্দ্র-সূর্য তাদের নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে, তাদের মধ্যে যে সুশৃংখল ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম শক্তি এবং জ্ঞানের অপূর্ব মহিমার জলন্ত প্রমাণ।

চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্তের মাধ্যমে মানুষ দিন, সপ্তাহ, মাস এবং বছরের হিসাব সঠিকভাবে রাখতে পারে এমনকি, মিনিট এবং সেকেন্ডের হিসাব পর্যন্ত অতি সহজে রাখা যায়, চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্তের জন্যে কোন কারখানার প্রয়োজন নেই; বরং আল্লাহ পাক তাঁর এ সৃষ্টিদ্বয়ের জন্যে একটি বিশেষ নিয়ম শৃংখলা নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন এবং সেই নিয়ম শৃংখলায় এক সেকেন্ড পরিবর্তন হয় না। এ বিস্ময়কর সুদৃঢ়-সুশংখল, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা মহান আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের জ্বলন্ত নিদর্শন। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

অর্থাৎ এ হলো মহাজ্ঞানী, পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, "আল-আযীয" শব্দটি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে, আর "আল-আলীম" শব্দটি আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ জ্ঞানের ইঙ্গিতবহ। সমগ্র সৃষ্টিজগত যে সর্বক্ষণ তাঁর নখদর্পণে রয়েছে তার ঘোষণাই রয়েছে এ বাক্যটিতে। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, চন্দ্র ও সূর্যের উদয় এবং অস্ত গমনের ব্যাপারে কখনও সামান্যতম বিলম্ব হয় না। আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের এটিও একটি বিরাট বিদর্শন।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا

অর্থাৎ তিনিই সেই আল্লাহ্ পাক যিনি তোমাদের উপকারার্থে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা রাতের অন্ধকারে পৃথিবীর স্থল ও সামুদ্রিক ভাগে পথ দেখতে পাও। নিশ্চয় আমি আমার নিদর্শন সমূহ তাদের জন্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করছি, যাদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি আছে। যারা বুদ্ধিমান, তারা এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের সত্যতা উপলব্ধি করে।

এ আয়াত দ্বারা একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেভাবে চন্দ্র সূর্য আল্লাহ পাকের অপূর্ব বিস্ময়কর ক্ষমতার নিদর্শন এবং বিশ্ব-মানবের কল্যাণে নিয়োজিত ঠিক তেমনি নক্ষত্রপুঞ্জও আল্লাহ্ পাকের কুদরতের নিদর্শন এবং মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনে নিয়োজিত। এ নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টির মধ্যে বহু হেকমত রয়েছে তন্মধ্যে

একটি হেকমত হলো এই, মানুষ তার স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণকালে অন্ধকার রাতে পথ দেখতে পায় এ নক্ষত্রপুঞ্জের সাহায্যে, আর এর দ্বারা মানব জাতিকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, চন্দ্র সূর্য বা নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতি তোমাদের উপকারার্থেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যা তোমাদের প্রয়োজনের আয়োজনে কার্যকর রয়েছে তা তোমাদের উপাস্য হতে পারে না কোনদিনও। অতএব, আল্লাহর এসব সৃষ্টিকে উপাস্য মনে করা নিতান্ত মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

দ্বিতীয়তঃ এখানে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের উপকারীতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও যে কথা মেনে নিতে হবে তা হলো, এসব কিছু কারও সৃষ্টি। এ সৃষ্টিগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব দেখে এর দ্বারা উপকৃত হয়ে মানুষ মুগ্ধ হয়, কিন্তু যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করলেন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা মানুষের হীনমন্যতার পরিচায়ক। অতএব, এ সমস্ত সৃষ্টি এবং তার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে মহান স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো জ্ঞানী মানুষের একান্ত করণীয় কাজ।[২]

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্র-সূর্য বা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যে উপকারীতা বা কার্যকারিতা রয়েছে তা তাদের নিজস্ব নয়; বরং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত। অতএব, বন্দেগী করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের, আর কারো নয়, তাই নক্ষত্রপুঞ্জ কোন অবস্থাতেই উপাস্য হতে পারে না কেননা, এগুলোকে আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন।[৩]

وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে আর তোমাদের জন্যে রয়েছে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান। একই ব্যক্তি তথা আদম (আঃ) থেকে কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করা শুধু তাই নয়; বিভিন্ন বর্ণ বংশের এবং বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির মানুষ সৃষ্টি করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব, এটিও আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত, জ্বলন্ত নিদর্শন।

লক্ষনীয় বিষয় এই, মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাকে একটি নিদৃষ্টকাল পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকতে দেয়া হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

(আর তোমাদের জন্যে এ পৃথিবীতে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে।) যখন এ নিদৃষ্ট কাল শেষ হয়, তখন মানুষকে চিরতরে বিদায় নিতে

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৩
২। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা১৬৬২-৬৪
৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২. পৃষ্ঠা-৫০৬

হয় এ পৃথিবী থেকে, এতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

অর্থাৎ যখন তাদের মৃত্যুর নিদৃষ্ট সময় আসে তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না, এবং এক মুহূর্ত আগেও তা আসে না।

মৃত্যুর পর মানুষকে কবরে রাখা হয়, তাকে বলা হয় আলমে বরজখ। এখানে মানুষকে কেয়ামত পর্যন্ত থাকতে হয়। এরপর আল্লাহ পাক মানুষকে পুনঃ জীবন দান করবেন এবং কেয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের জন্যে হাযির করবেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

"(হে মানব জাতি!) এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর এই মাটিতেই তোমারেকে ফিরিয়ে আনব। (কিন্তু মাটির সঙ্গে মিশে তোমরা নিঃশেষ হয়ে যাবেনা, বরং) মাটি থেকে তোমাদেরকে পুনরায় বের করব"।

অতএব, একই ব্যক্তি থেকে এত মানুষ সৃষ্টি করা যেমন আল্লাহ পাকের মহান কুদরতের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যমেও আল্লাহ পাকের কুদরতেরই বহিঃ প্রকাশ হবে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষকে মনে রাখতে হবে তার এ জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং এ জগৎও ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান, তাঁর নেয়ামত। অতএব এ সমস্ত নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মানুষকে অবশ্যই শোকর গুজার থাকতে হবে, শুধু এভাবেই মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে।

আর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর সম্মুখে মাথা নত করা বা অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করা হবে মানবতার অবমাননা।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ

নিশ্চয় আমার কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি সে সম্প্রদায়ের জন্যে যাদের বোঝার ক্ষমতা আছে কেননা, তারা সত্য উপলব্ধি করবে, সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস করবে। পক্ষান্তরে, যারা বোঝেনা, নির্বোধ, মূর্খ তারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ দেখে উপকৃত হবে না।

একথাটিকে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ

"নিশ্চয় এই কোরআনে অবশ্যই নসিহত রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য যার বুদ্ধি আছে, আর যে নির্বোধ সে পবিত্র কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না"।

ঠিক এমনিভাবে সূরা আলে-এমরানেও এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

"নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃজণে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে"।

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

তরজমা

(৯৯) আর তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর আমি তা দ্বারা সর্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। অনন্তর তা থেকে পর্যায়ক্রমে সবুজ ফসল, উপর্যুপরি শস্য দানা উৎপাদন করি, খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত ফলগুচ্ছ বের করি, পরস্পর সদৃশ, অসদৃশ ডালিম, জয়তুন এবং আঙ্গুরের বাগান বের করে থাকি। তোমরা লক্ষ্য কর প্রত্যেকটি গাছের প্রতি, যখন তাতে ফল আসে এবং পাকে। নিঃসন্দেহে ঈমানদারদের জন্যে রয়েছে এতে অনেক নিদর্শন।

(১০০) আর তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহ পাকের শরীক করে অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি পুত্র কন্যা আরোপ করে (নাঊবুবিল্লাহ....) তিনি পবিত্র, মহান এবং তারা যা বলে তার অনেক ঊর্ধ্বে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলমীনের গুণাবলী এবং তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের বর্ণনা রয়েছে যা তাঁর অস্তিত্ব, একত্ববাদ এবং তাঁর অদ্বিতীয়তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর হিসেবে বিরাজমান।

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত সমূহে শুধু যে আল্লাহ্ পাকের নিরংকুশ তৌহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে তাই নয়; বরং এতে তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত যা মানুষ অহরহ ভোগ করে তারও উল্লেখ রয়েছে। অতএব, একদিকে এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরতের দলিল প্রমাণ রয়েছে অন্যদিকে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং অনুগ্রহের বিবরণও রয়েছে। যেমন আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের দৈহিক খাদ্যের প্রয়োজনে আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা জমিন থেকে রকমারী খাদ্য দ্রব্য, তরি তরকারী, ফলমুল উৎপাদন করেন। খেজুর, আঙ্গুর, জয়তুন, আনার প্রভৃতি ফলের বাগান তিনিই তো মানুষকে দান করেছেন। একটি ফল আরেকটির সদৃশ কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। আল্লাহ পাক মানুষের জীবন যাত্রার প্রয়োজনে এ সমস্ত কিছুর আয়োজন করেছেন।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ

হে লোক সকল! লক্ষ্য কর, জ্ঞান-চক্ষুর দৃষ্টিতে দেখ, প্রত্যেকটি ফল যখন উৎপাদিত হয় তখন আকারে ক্ষুদ্র দেখা যায় এবং তাতে স্বাদও থাকেনা কিন্তু কিছুদিন পরই তা আকারে বড় হয় এবং স্বাদে পরিপূর্ণ হয়। এসবই মহান আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের জীবন্ত দলিল প্রমাণ। যারা প্রকৃত মোমেন, তাদের জন্যে রয়েছে এতে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক চার প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন, "আন নখল" অর্থাৎ খেজুর, "আল এনাব" অর্থাৎ আঙ্গুর, 'জয়তুন', 'রুম্মান' অর্থাৎ আনার। এ বৃক্ষগুলোর উল্লেখের পূর্বে কৃষিজাত বস্তুর উল্লেখ করেছেন। কেননা, কৃষিজাত দ্রব্য হলো মানুষের মূল খাদ্য, আর ফল হলো মানুষের ভোগ-সম্পদ বা আনন্দ-সামগ্রী তাই ফল জাতীয় বস্তুর পূর্বে মূল খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্যান্য ফলের পূর্বে খেজুরের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে আরবরা অনেক সময় খেজুরকে মূল খাদ্য হিসেবেও গ্রহণ করে থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, খেজুরের মধ্যে আর সৃষ্ট জীবের মধ্যে একটি বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এ অর্থেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

أكرموا عمتكم النخلة، فانها خلقت من بقية طينة آدم

অর্থাৎ "তোমরা সম্মান কর তোমাদের চাচা খেজুরের"। কেননা, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর যে মাটিটুকু অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে খেজুর তৈরী করা হয়েছে। আর এজন্যেই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন, খেজুরে ৩০০ শত মি.লি গ্রাম ভিটামিন রয়েছে। আর খেজুরের পরই আঙ্গুরের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, ফলের মধ্যে আঙ্গুর সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।[১]

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, আল্লাহ্ পাক যখন মানুষের এ ক্ষণস্থায়ী জীবন যাত্রার প্রয়োজনে এত নেয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন তখন তিনি কি মানুষের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রয়োজনের ব্যাপারে উদাসীন থাকবেন? তা কখনো হতে পারে না। মূলতঃ এজন্যেই আল্লাহ্ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন। দিশেহারা মানুষকে পথ-নির্দেশ করার জন্যেই আগমন করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর এ উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআন।

বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে যেমন আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের সমাহার ঘটেছে ঠিক তেমনি বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁর অতুলনীয় কালাম নাযিল হয়েছে। অতএব, যে বা যারা এতদসত্ত্বেও হেদায়েতের এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেনা, আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের মহিমা দেখেও দেখেনা তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যাহত, জীবন্মৃত এবং চির বঞ্চিত।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ

(আর তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহ পাকের শরীক করে অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।)

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদ তথা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের পাঁচটি দলিল বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সে সব লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে তারা তিনটি দলে বিভক্ত।

১. তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১০৯

১. মূর্তি পূজক। তারা মূর্তির পূজা করে এবং তাদেরকে উপাস্য মনে করে তবে একথা স্বীকার করে যে, মূর্তিগুলোর কোন ক্ষমতা নেই।

২. মুশরেকদের এ দল মনে করে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় নক্ষত্রপুঞ্জের বিশেষ হাত রয়েছে।

৩. মুশরেকদের এ দল মনে করে আসমান জমীনের মধ্যে দু'জন উপাস্য রয়েছে। একজনের দ্বারা ভাল কাজ হয় আরেকজনের দ্বারা মন্দ কাজ হয়।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে সেই কাফেরদের সম্পর্কে যারা একথা মনে করে যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন মানুষকে, শয়তান সৃষ্টি করেছে হিংস্র জন্তু, সাপ বিচ্ছু এবং যাবতীয় মন্দ কাজকে।

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে অগ্নি পূজকদের সম্পর্কে। অগ্নি পূজকরা বলে যা কিছু ভাল হয় তা করে ইয়াজদান। আর যা কিছু মন্দ হয় তা করে আহরামান। আমরা যাকে ইবলিস বলি তারা তাকেই আহরামান বলে।[১]

শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক অগ্নি পূজকদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ অগ্নি পূজকরা বলত, শয়তান আল্লাহর সাথে শরীক রয়েছে, আল্লাহ পাক কল্যাণকর বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং ইবলিস মন্দ ও ক্ষতিকর বস্তু সৃষ্টি করে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করত। তাই তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে জ্বীন শব্দটি দ্বারা মালায়েকা বা ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পৌত্তলিকরা মনে করত ফেরেশতারা হলো আল্লাহর কন্যা (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।

অথবা আলোচ্য আয়াতে জ্বীন শব্দ দ্বারা শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, শয়তানের প্ররোচনায় পৌত্তলিকরা মূর্তির পূজা করে। আর এ অর্থেই বলা হয়েছে যে, তারা শয়তানকে শরীক করে তথা শয়তানের কথার অনুসরণ করে।[২]

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে জ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শেরক ও কুফরের প্ররোচনা দাতা শয়তানের উদ্দেশ্যে। কেননা, শয়তানই মানুষকে মন্দ কাজের জন্যে প্ররোচনা দেয়। আর এর প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে শেরক পরিহার করার নছিহত করে বলেছিলেনঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১১৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯২

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ

(হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করোনা।) পবিত্র কোরআনের সূরা ইয়াসীনে স্বয়ং আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

(হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে তোমরা শয়তানের পূজা করবে না।) জ্বীন শব্দের অর্থ শয়তান হোক অথবা জ্বীনই হোক সবই আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব, কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা এবং মূর্খতার পরিচায়ক।

وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ

আর মুশরেকরা মূর্খতাবশতঃ মহান আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তান-সন্ততির অপবাদ আরোপ করে যেমন ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলত এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলত এবং পৌত্তলিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। এসব উক্তি নিঃসন্দেহে উদ্ভট এবং মূর্খতা-প্রসূত, যুক্তি এবং বিচার বুদ্ধি-বিরুদ্ধ। কেননা, আল্লাহ পাকের মহিমা এবং শান এসব কিছু থেকে অনেক উর্ধ্বে। যারা এসব কথা বলেছে তারা আল্লাহ পাকের শানে বেআদবী করে নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে।

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَ
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلٰهَ
إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ ﴿١٠٢﴾
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيٰتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

তরজমা

(১০১) তিনি আসমান জমিনের প্রথম স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর যে কোন স্ত্রী নেই, তিনিই তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, সব বিষয় সম্পর্কে তিনিই সম্পূর্ণ অবগত।

(১০২) এই আল্লাহ পাকই তোমাদের রব, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, তিনি সব কিছুরই অধিকর্তা।

(১০৩) চক্ষু তাঁকে পায় না, অথচ তিনি তাকে পান, আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

(১০৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এসেছে তোমাদের নিকট অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ অতএব, যে তা দেখে নিয়েছে সে তারই কল্যাণ সাধন করেছে, আর যে অন্ধ হয়েছে সে নিজেরই ক্ষতি করেছে। আর আমি তোমাদের সংরক্ষক নই।

(১০৫) আর এভাবেই আমি নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করে থাকি যাতে তারা বলে আপনি কারো নিকট পড়া-শুনা করেছেন, আর আমি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা জ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের পাঁচটি দলিল বর্ণিত হয়েছে এবং পৌত্তলিকদের বাতিল, অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন কথা বার্তার প্রতিবাদ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে খৃষ্টানদের অযৌক্তিক, অসুন্দর আকীদার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

'বদিউন' শব্দটির অর্থ হলো কোন নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর আবিষ্কারক। আল্লাহ পাক কোন নমুনা এবং কারো সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই এর পালনকর্তা, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যত কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)-কে খৃষ্টানরা আল্লাহর পুত্র বলে যে উদ্ভট দাবী করেছে, এমনিভাবে ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলেছে, এসব কথা ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অসুন্দর এবং আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১০

এমনিভাবে পৌত্তলিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা বলে দাবী করেছে। এসবই উদ্ভট, অন্যায় এবং মূর্খতা প্রসূত কথা বার্তা, এ ধরনের বাজে কথা যারা বলে তথা সৃষ্টিকে যারা স্রষ্টার আসনে বসাতে চায়, তাদের স্থান দুনিয়াতে পাগলা গারদে এবং আখেরাতে দোযখে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন হয় তার, যার সময় হয় সীমিত। কিন্তু আল্লাহ পাক চিরস্থায়ী, তাঁর বিদায় নেই, বিনাশ নেই, তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি চিরকাল থাকবেন। অতএব, এমন পবিত্র সত্তার সন্তান-সন্ততির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাকই ছোট-বড় সকল দেহের স্রষ্টা, যিনি দেহের স্রষ্টা তিনি দেহের প্রয়োজন থেকেও মুক্ত এবং পবিত্র।[১]

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

আর আল্লাহ পাকই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। যিনি স্রষ্টা, যিনি পালনকর্তা, যিনি রিয্ক দাতা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন, 'হও' আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। অতএব, কোন্ যুক্তিতে কোন্ বিচারে আল্লাহ পাকের শানে এমন বেয়াদবি পূর্ণ কথা বলা যায়? সন্তান-সন্ততি হওয়া বা স্বামী স্ত্রী হওয়া এসব সম্পর্ক সৃষ্টির, স্রষ্টার নয়।

আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কৌশল একাধিক

আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-কৌশল একাধিক। হযরত আদম (আঃ)-কে তিনি স্বহস্তে তৈরী করেছেন, তাঁর দেহে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, আর এভাবে হযরত আদম (আঃ) পিতা-মাতা ব্যতীতই অস্তিত্ব লাভ করেছেন, আর হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়ার সব মানুষকে পিতা মাতার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেন। এসব হলো আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-কৌশলের বিভিন্ন পদ্ধতি। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে পিতা অনুপস্থিত, এজন্যে তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলা মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ

এই আল্লাহ পাকই তোমাদের পরওয়ারদেগার। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এক আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ এবং অদ্বিতীয়তার দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তিনি যে একমাত্র উপাস্য, তিনি যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, বিজ্ঞানময়, করুণাময় একথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ১৯৩-৯৪

এর পাশাপাশি যারা আল্লাহর সাথে শেরক করে এবং যারা আল্লাহ্ পাকের জন্যে সন্তান-সন্ততি আছে বলে উদ্ভট দাবী করে তাদের বাতুলতাও ঘোষণা করা হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন শরীক নেই, সন্তান-সন্ততি হওয়া থেকে তিনি পবিত্র, সকলেই তাঁর সৃষ্টি। তিনিই মহান স্রষ্টা। এরপর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তিনিই আল্লাহ্, তিনিই তোমাদের পরওয়ারদেগার, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য বা মা'বুদ নেই, তিনিই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা। তিনিই তোমাদের দোয়া ও তোমাদের মনের কাকুতি-মিনতি শ্রবণ করেন এবং তোমাদের প্রয়োজনের আয়োজন করেন।

এক আল্লাহ্ বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ কর

অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো, এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা। তিনি ব্যতীত আর কারো নিকট মাথা নত না করা, তাঁর প্রভূত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিই সকলের অভিভাবক, অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর এবং শুধু তাঁরই উপর ভরসা কর।[১]

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ

অর্থাৎ তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের অভিভাবক, ব্যবস্থাপক, তিনিই সব কিছু করেন, নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাপনায় কেউ তাঁর শরীক নেই, অতএব, তোমরা এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও, তিনিই তোমাদের নেক আমলের সওয়াব দান করবেন।[২] হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো ঃ

كفيل بارزاقهم

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের রিয্কের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।[৩] যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاط كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

"আর প্রাণী মাত্রেরই রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহ্ পাকের, তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবগত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই রয়েছে"।

১ তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৩০
২ ঃ তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৪
৩ ঃ তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১১৬

আল্লাহ পাকের দীদার

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

(চোখের এমন শক্তি নেই যে আল্লাহ্ পাককে দেখতে পারে।)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এবনে আবি হাতেমের সূত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ, জ্বীন, শয়তান, ফেরেশতা সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে এই সকলে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করতে চায় তবে পরিপূর্ণ ভাবে তা আয়ত্ব করতে পারবেনা। মুতাজিলা, মুরজিয়া, খারেজী নামক বাতিল ফেরকাগুলো এ আয়াতকে তাদের ভ্রান্ত মতের দলিল পেশ করে যে আল্লাহ্ পাকের দীদার সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের মত সঠিক নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ

لدتدركه الابصار اى فى الدنيا

অর্থা "দুনিয়াতে কেউ তাঁকে দেখতে পাবেনা"।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা

আর এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা যে, দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের দীদার কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, কিন্তু আখেরাতে মোমেনগণ আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। বেহেশতে আল্লাহ পাকের দীদারই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

শবে মে'রাজে আল্লাহ্ পাকের দীদার

শবে মে'রাজে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছিলেন। কিন্তু তা দুনিয়াতে নয়; বরং তাঁকে বোরাকে আরোহণ করিয়ে মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করে সাত আসমান পার হয়ে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত যেতে হয়েছে। এরপর বোরাক এবং তাঁর সাথী জীব্রাঈল (আঃ) বিদায় গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তিনি রফরফে আরোহণ করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হয়েছেন এবং দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে এটি একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

خص ابرهيم بالخلة وخص موسى بالتكلم وخصنى بالرؤية

"আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য। হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ পাক কথা বলেছেন, এটি তাঁর

বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দীদার নসীব করেছেন, এটি আমার বৈশিষ্ট্য"।

অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক তাঁর দীদার নসীব করেছেন আর তা হলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জির ব্যাপার, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি শক্তিকে যথাযোগ্য করে তুলেছেন এবং তাঁর দীদার নসীব করেছেন। সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে শবে মে'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার শেষ বাক্যটি এ পর্যায়ে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا

(অর্থাৎ আমি তাঁকে দেখাতে চাই, আমার নিদর্শন সমূহ) তবে এ দীদার দুনিয়াতে হয়নি, হয়েছে উর্দ্ধলোকে। বিশ্ব বিখ্যাত সূফী বুজর্গ শেখ মহিউদ্দিন এবনে আরাবী (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়া নাম হলো সে স্থানের যা আসমানের নীচে রয়েছে। আসমানের উপর যে স্থান রয়েছে তাকে দুনিয়া বলা যাবে না; বরং তা হলো আখেরাতের মকাম। দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব নয় বলেই হযরত মূসা (আঃ) যখন দীদারের জন্যে আরযী পেশ করেছিলেন ঃ

পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

رَبِّ اَرِنِیْٓ

(আপনার দীদার নসীব করুন) তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

لَنْ تَرٰنِیْ

অর্থাৎ তুমি কোন অবস্থাতেই আমাকে দেখতে পারবেনা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কোন সময়েই আল্লাহ পাকের দীদার নসীব হবে না; বরং আখেরাতে আল্লাহ পাকের দীদার নসীব হবে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা। এরশাদ হয়েছে ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন অনেক চেহারা হবে আনন্দে উৎফুল্ল। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে, আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

"যে তার পরওয়ারদেগারের মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষা করে তার উচিত হলো সৎ কাজ করা এবং তার প্রতিপালকের এবাদতে কোন কিছুকে শরীক না করা"।

হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করবেন, যে নেয়ামত তোমরা পেয়েছ তার চেয়ে বাড়তি কিছু চাই? তোমরা যদি বলো, তাহলে তা-ও দান করব।

তখন বেহেশতবাসীগণ আরজ করবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দিয়েছেন, জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন। এর চেয়ে বাড়তি আর কি চাইব? তখন পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে এবং সকল বেহেশতবাসী আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন এবং জান্নাতের সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে এটিই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

বোখারী শরীফে সংকলিত, হযরত সোহায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, একবার চাঁদনী রাতে সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ রাখছিলেন। তিনি চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, তোমরা যেভাবে এ চন্দ্রকে দেখছ, ঠিক এমনিভাবে (আখেরাতে) তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে।

তিরমিজী শরীফ এবং মসনদে আহমদে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাদেরকে দৈনিক সকাল বিকাল আল্লাহ পাকের দীদার নসীব হবে।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

প্রশ্ন হতে পারে, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করতে পারবেনা। তাহলে কেয়ামতের দিন তা কি করে সম্ভব হবে? এর জবাব এই যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই নয় যে, মানব চক্ষুর পক্ষে আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভবই নয়; বরং আয়াতের অর্থ হলো, মানব চক্ষু তাকে আয়ত্বে আনতে পারবেনা কেননা, আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা অনন্ত অসীম, আর মানুষের দৃষ্টি শক্তি সীমিত এমনকি, কেয়ামতেও যে দীদার নসীব হবে তা-ও এভাবেই হবে।

মানব চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি কোনদিনও তাঁকে আয়ত্বে আনতে পারবে না। মানুষের দৃষ্টিতে এত শক্তিই নেই যে, সে আল্লাহ পাকের দীদারকে বরদাশ্‌ত করতে পারে। আর এজন্যে দুনিয়াতে তাঁর দীদার সম্ভবই নয়। তবে আখেরাতে আল্লাহ পাক শুধু বেহেশতবাসীকে তাঁর দীদারের শক্তি দান করবেন, কিন্তু সেই দৃষ্টি শক্তি তাঁর "এদরাক" করতে পারবেনা অর্থাৎ তাঁকে আয়ত্বে আনতে পারবেনা। আর কাফেরদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা আখেরাতেও আল্লাহ পাকের দীদার থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

(অবশ্যই নয়, কাফেররা সেদিন আল্লাহ্ পাকের দীদার থেকে আচ্ছাদিত এবং বঞ্চিত থাকবে।)[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হাদীস শরীফের সংকলন গ্রন্থ সমূহে আল্লাহ পাকের দীদার সম্পর্কে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত হাফেজ এবনুল কাউয়্যুম (রহঃ) "হাবিউল আরওয়াহ" নামক গ্রন্থে আল্লাহ পাকের দীদার সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য তথ্য পেশ করেছেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে যে কথাটি প্রণিধানযোগ্য তা হলো, এ আয়াতে আল্লাহ পাক একথা ঘোষণা করেননি যে, "রুইয়াত" বা আল্লাহ পাকের দীদার সম্ভব হবে না; বরং এরশাদ হয়েছে মানুষের চক্ষু তাঁর এদরাক করতে পারবে না।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

এদরাক অর্থ হলো কোন কিছুকে আয়ত্বে আনা, তথা মানব চক্ষু আল্লাহ্ পাকের এদরাক করতে পারবেনা, তাঁকে আয়ত্বে আনতে পারবেনা। "এদরাক" এবং "রুইয়াত" এ শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা অনুধাবন করা এখানে একান্ত জরুরী। এ পার্থক্য অনুধাবনে আমরা কোরআনে করীম থেকেই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করবো। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে লোহিত সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে ফেরাউন তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে বণী ইসরাঈলকে পাকড়াও করার জন্যে ধাওয়া করছিল। ফেরাউন কাছে এসে পড়েছিলো, সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো যে, হয়তো ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে পাকড়াও করে ফেলবে। তখনকার অবস্থা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ

"যখন তারা উভয় দল একে অন্যকে দেখল, তখন মূসা (আঃ)-এর সাথীরা বলল, আমরা নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবো, তখন মূসা (আঃ) বললেন, অবশ্যই নয়, তথা তারা তোমাদেরকে আয়ত্বে আনতে পারবে না"।

এ আয়াতে একে অন্যকে দেখার প্রমাণ রয়েছে কিন্তু একে অন্যকে আয়ত্বে না আনার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, "এদরাক" তথা আয়ত্বে আনা এক ব্যাপার আর রুইয়াত বা দেখা আরেক ব্যাপার। আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন যে,

১। নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৬৯

মানব চক্ষু তাঁকে পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে পারেনা। আখেরাতেও মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন সত্য, কিন্তু মানুষের দৃষ্টি শক্তি কোন দিনও তাঁকে আয়ত্ব করতে পারবে না।

وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

আর আল্লাহ পাক দৃশ্য এবং দৃষ্টি সব কিছুতেই আয়ত্বে করে রেখেছেন, তাঁর এ শক্তি এবং মহিমা রয়েছে। পৃথিবীর একটি বালু কণাও তাঁর নিকট গোপন নেই, এটি একমাত্র আল্লাহ পাকেরই বৈশিষ্ট্য। কেননা, তিনিই বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা। এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

আরবী অভিধানের দিক থেকে "আল লতিফ" শব্দটি দু' অর্থে ব্যবহৃত হয় (১) দয়াময়, মেহেরবান, (২) এমন বস্তু যা ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা জানা যায় না। অর্থাৎ আল্লাহ পাক এমন পবিত্র সত্ত্বা যাঁর সম্পর্কে মানুষ তার ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা কিছুই জানতে পারেনা, যেমন একজন মরমী কবি আল্লাহ পাকের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"তুমি মনে আসো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনা, একথাই জানতে পারলাম যে, এটিই তোমার পরিচয়"।

বস্তুতঃ মানুষের সকল শক্তি সীমিত, তাই যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মানুষ তাঁকে বুঝতে পারেনা। আর "লতীফ" শব্দের অর্থ যদি "মেহেরবান" গ্রহণ করা হয় তবে এর তাৎপর্য হবে, যদিও আমাদের সকল কথা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত কিন্তু যেহেতু তিনি লতীফ, তিনি দয়াময় আর তাঁর দয়া মায়া অনন্ত অসীম, তাই তিনি আমাদের প্রত্যেক গুনাহর জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাকড়াও করেন না। এটি তাঁর মেহেরবানী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আর "খাবীর" শব্দটির অর্থ হলো তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

আল্লাহ পাকের দীদার সম্পর্কে তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-৯০ -৯১, তফসীরে কুরতবী, খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৫৪ এবং তফসীরে কবীর, খন্ড-১৩ পৃষ্ঠা-১২৬ থেকে ১৩২ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, দুনিয়াতে মানব চক্ষু তাঁকে দেখতে পারেনা, কিন্তু আখেরাতে এ চক্ষুকে শক্তিশালী করা হবে তাই আখেরাতে মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন।

শাহ আবদুল কাদের (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, চোখের এমন শক্তিই নেই যে, আল্লাহ পাককে দেখতে পারে, কিন্তু যদি স্বয়ং আল্লাহ

পাকই দয়া করে এমন শক্তি দান করেন, তবে সে আল্লাহ পাকের দীদারের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।[১]

আবু নাঈম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে দীদার নসীব করুন।

হযরত মূসা (আঃ) যখন এ আরযী পেশ করলেন তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে মূসা! যে আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখবে, সে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। আমাকে শুধু জান্নাতবাসীরা দেখবে। তাদের চক্ষুর মৃত্যু হবে না, তাদের দেহ বিনষ্ট হবে না।

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ

নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অনেক নিদর্শন এসেছে। যে তা দেখেছে সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করেছে। যদিও আমরা আল্লাহ পাকের দীদার লাভের শক্তি এবং যোগ্যতা রাখিনা, তাঁকে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু অহরহ তাঁর নিদর্শন লক্ষ্য করি। ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলের সৃজণে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের, তাঁর একত্ববাদের অনেক নিদর্শন চির সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তাঁর এসব নিদর্শনের প্রতি যারা অন্তরের দৃষ্টিতে দেখবে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। আর যারা নিজেকে অন্ধ করে রাখবে তথা আল্লাহ পাকের নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবে না এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ থাকবে তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

আলোচ্য আয়াতে 'বাছায়ের' শব্দটি বছিরাতের বহু বচন। এর অর্থ হলো আকল, বুদ্ধি এবং সে শক্তি যার মাধ্যমে মানুষ এমন কিছুর এলম হাসিল করতে পারে যা দেখা যায় না।

এ আয়াতে "বাছায়ের" শব্দের তাৎপর্য হলো সেই দলিল এবং নিদর্শন সমূহ যার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা যায়।

আয়াতের মর্মবাণী

এ আয়াতের মর্মবাণী এই, তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের অনেক নিদর্শন এসেছে যেমন পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর অনেক মোজেযা তোমরা লক্ষ্য

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২. পৃষ্ঠা ৫১২-১৩

করেছ, তোমরা আরজী পেশ করেছ বলে তাঁর অঙ্গুলীর ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে, তাঁর জন্যে বদরের যুদ্ধে আসমান থেকে ফেরেশতা নাযিল হয়েছে, অহরহ তাঁর নিকট ফেরেশতাদের দলপতি হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যাতায়াত করেছেন। এমন অনেক দলিল প্রমাণ বা নিদর্শন তোমরা দেখতে পেয়েছ। যদি এসব দেখে তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন তবে তোমাদেরই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। পক্ষান্তরে, যদি চোখ থাকতেও তোমরা অন্ধ হয়ে থাক তথা ঈমান না আন তবে তোমাদের পরিণাম হবে শোচনীয়।

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নেগেহবান বা সংরক্ষক নই, এটি আমার দায়িত্ব নয় যে, আমি জবরদস্তি করে তোমাদেরকে মন্দ পথ থেকে সৎ পথে নিয়ে আসবো।

রসূলের দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হক্ব ও বাতিল বুঝিয়ে দেয়া। তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানানো, এরপর যাদের ইচ্ছা হেদায়েত কবুল করবে, আর যাদের ইচ্ছা পথভ্রষ্ট থাকবে। এটি তাদের কাজ।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ

আর এভাবে আমি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পন্থায়, বিস্তারিত ভাবে আমার নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করি। আর তা এজন্যে করি যেন (হে রসূল!) আপনি এসব নিদর্শন মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। আল্লাহ পাকের এ বাণী পৌঁছে দেয়ার পর মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল বলে এত সুন্দর এত মধুর, এত আকর্ষণীয়, অসাধারণ কালাম একজন উম্মী ব্যক্তি কি করে পেশ করতে পারে? হয়তো লোক-চক্ষুর অন্তরালে কারো কাছ থেকে তিনি কিছু শিখে নেন। সে কারণেই তিনি এমন সারগর্ভ বাণী পৌঁছাতে পারছেন, আর দ্বিতীয় দল যারা বুদ্ধিমান পরিণামদর্শী তারা বলবে, এ সুন্দর অমীয় বাণী যখন একজন উম্মী ব্যক্তির মুখে আমরা শ্রবণ করছি তখন আমাদের কর্তব্য হলো তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

বস্তুতঃ হেদায়েত লাভের জন্যে দলিল প্রমাণ সকলের সম্মুখেই রাখা হয়েছে, যারা ভাগ্যবান তারা হেদায়েত লাভ করে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে কামিয়াব হয়েছে, আর যারা ভাগ্যাহত তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং নিজের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করেছে, নিজের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে এনেছে।

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا
جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

তরজমা

(১০৬) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে যে নির্দেশ আপনার নিকট আসে তা মেনে চলুন, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুশরেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

(১০৭) আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তারা শেরক করতো না, আর (হে রসূল!) আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি, আর আপনি তাদের অভিভাবকও নন।

(১০৮) আর তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাকে, তোমরা তাদেরকে মন্দ বলোনা, অন্যথায় তারাও অজ্ঞতাবশতঃ অভদ্রভাবে আল্লাহ পাককে মন্দ বলতে যাবে, এভাবেই আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সাজিয়ে দিয়েছি, অবশেষে তাদের সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে এবং তিনি তখন তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের এ অপবাদের উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হয়তো আহলে কিতাবদের থেকে সুন্দর সারগর্ভ কথা-বার্তা পূর্বেই শিখে নেন। এরপর অতি স্বাভাবিক ভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মন আহত হতে পারে, তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) কাফেরদের অপবাদের কারণে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না। এ দূরাত্মারা এত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যখন ঈমান আনলোনা তখন তাদের জন্যে দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের অন্যায় আচরণে বা কটু কথায় কোন গুরুত্ব দেবেন না। তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ

করবেন না, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে নির্দেশ আসে তা আপনি মেনে চলুন, কে মানলো, আর কে মানলো না এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। মুশরেকেরা যদি আপনার প্রতি ঈমান না আনে আপনি তার জন্যে ব্যথিত হবেন না। আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ের তা'লিম দিয়েছেন, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হলো ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এবাদত বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই। অতএব, আপনি মুশরেকদের হেদায়েতের চিন্তায় ব্যাকুল হবেন না; বরং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا

যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হতো যে, সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে তবে তারা শেরক করতে পারতে না। কিন্তু তাদের অন্যায় আচরণ ও ঔদ্ধত্বের কারণে আল্লাহ পাক তাদের শাস্তি বিধান মঞ্জুর করেছেন। তাই আপনি তাদেরকে কিভাবে হেদায়েত করবেন? কেননা, সমগ্র বিশ্ব মানবকে বলপূর্বক মুসলমান বানাবার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের নেই। যদি তা তিনি ইচ্ছা করতেন তবে সারা বিশ্বে একজনও মুশরেক থাকতে পারত না। মূলতঃ আল্লাহ পাকের মর্জি হলো, প্রত্যেকে যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হেদায়েত লাভে সচেষ্ট হয় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে মাগফেরাত লাভের সাধনায় অগ্রসর হয়, আখেরাতের জিন্দেগীর সাফল্যের পূর্ব শর্ত হলো ঈমান, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালাতের প্রতি, পবিত্র কোরআনের প্রতি, কেয়ামতের দিনের হিসাব নিকাশের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের সত্যতার প্রতি, জান্নাত ও দোযখের প্রতি ঈমান তথা পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আর এ ঈমান হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। এখানে বলপূর্বক কিছু হবে না। যেমন পবিত্র কোরআনেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় গোমরাহী থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে হেদায়েত"।

অর্থাৎ হেদায়েত এখন আর অস্পষ্ট নয়; বরং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ হেদায়েত গ্রহণ না করে তবে তার শোচনীয় পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

মানুষকে আল্লাহ পাক বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। চিন্তা শক্তি দিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের মহান বাণী

পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের দলপতি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِينٌ

(হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের নিকট এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে নূর এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ।) অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআন এসেছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নূরের আলোকে নিজেকে আলোকিত করাই হবে বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত কর্তব্য। এজন্যেই মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে ব্যয় করে হেদায়েত লাভের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং মানুষের স্বাধীনতা এবং বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

(যার ইচ্ছা ঈমান আন এবং যার ইচ্ছা অবাধ্য হও) কেননা, হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, যদি সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমান আনে তবে খোদার খোদায়ীতে কিছুই বাড়বেনা, আর যদি সারা দুনিয়ার সকল মানুষ অবাধ্য হয়, তবে খোদার খোদায়ীতে এবং তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্বে কিছুই কমবে না।

অতএব, বলপূর্বক কাউকে মুসলমান বানাবার কোইন প্রয়োজন নেই।

আর এ অর্থেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ اَشْرَكُوْاط

অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে কেউ শেরক করতে পারতো না"।

যেভাবে সমগ্র সৃষ্টি জগত আল্লাহ পাকের অনুগত রয়েছে ঠিক তেমনি এ পৌত্তলিকরাও আল্লাহ পাকের অনুগত হতে বাধ্য থাকত। কিন্তু আল্লাহ পাকের মর্জি হলো মানুষ বিবেক বুদ্ধি ব্যয় করে ঈমানদার হোক, নেক আমল করুক এবং পরকালীন জিন্দেগীতে সওয়াব লাভ করুক।

وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًاج

(হে রসূল!) আপনাকে আমি তাদের উপর প্রহরী বা রক্ষী নিযুক্ত করিনি যে, তাদের ঈমানের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে আপনি রক্ষা করবেন। এটি আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, তাদের নাফরমানী, পৌত্তলিকতা এবং অবাধ্যতার কারণে আপনি চিন্তিত হবেন না। কেননা, তাদের

অন্যায় আচরণের জন্যে আপনাকে জবাবদেহী করতে হবে না। তাদের অন্যায় আচরণের দায় দায়িত্ব তাদেরই, আপনার নয়। আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার এবং মানুষকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করা এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই আপনার দায়িত্ব।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

শানে নুযুল

এবনে আ'বদুর রাজ্জাক কাতাদার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মুসলমানগণ কাফেরদেরকে গালি দিতো আর তার জবাবে কাফেররাও মুসলমানদেরকে গালি দিতো। এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ আর কাফেররা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকে বা পূজা পাঠ করে তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না। কেননা, এমন অবস্থায় তারা অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্ পাককে মন্দ বলতে যাবে।

এ আয়াতে মুসলমানগণকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্ পাকের দ্বীন তথা ইসলামের প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছো তখন কাফেররা শেরক করুক বা যে অন্যায় করুক সেজন্যে তোমাদেরকে দায়ী হতে হবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে যে তোমাদের কোন আচরণ যেন তাদের নাফরমানী বৃদ্ধির কারণ না হয়, তাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলে উত্তেজিত হয়ে তাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলোনা। পরিণামে তারাও অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্ পাকের শানে বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি করবে এবং তাদের শেরক ও কুফরের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। আর এমন অবস্থায় তাদের কুফর ও নাফরমানী বৃদ্ধির কারণ হবে তোমাদেরই আচরণ। অতএব, এমন অন্যায় থেকে আত্মরক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য।

শানে নুযুল সম্পর্কে আরো কথা

আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন এ আয়াত

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

নাযিল হলো তখন পৌত্তলিকরা বলল, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হও। নতুবা আমরা তোমাদের প্রতিপালককে মন্দ বলবো। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং মুসলমানদেরকে কাফেরদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৮

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন ঃ আবু তালেবের মৃত্যুর সময় কোরায়শ গোত্রের লোকেরা আবু তালেবের নিকট হাযির হলো। এদের মধ্যে ছিল আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, নজর এবনে হারেস, উমাইয়া এবনে খালফ এবং আরো অনেকে। তারা আবু তালেবকে বলল, আপনি আমাদের নেতা, কিন্তু আপনার ভ্রাতঃষ্পুত্র আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলে। আপনি যদি পছন্দ করেন তবে তাকে এ কাজ থেকে বিরত করুন। সে যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলে তবে আমরাও তার উপাস্যকে মন্দ বলবো না। আবু তালেব তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললেন, তোমার সম্প্রদায় চায় যে তুমি তাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেনা আর তারাও তোমার উপাস্যকে কিছু বলবেনা। আর কথাটি সুবিচার সুলভ। অতএব, একথাটি তুমি মেনে নাও।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ আমি যদি তোমাদের একথাটি মেনে নেই, তবে তোমরাও আমাদের একটি কথা মানবে? যদি তা মেনে নাও তবে শুধু যে তোমরা আরবের মালিক হবে তাই নয়; বরং অনারব দেশ সমূহও তোমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। তখন আবু জেহেল বললঃ তোমার পিতার শপথ! একটি নয়, দশটি কথা মানতে রাজি আছি। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তাহলে তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই) একথাটি মেনে নাও। কোরায়শ তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। আবু তালেব বলল, হে আমার ভ্রাতষ্পুত্র! এছাড়া তুমি অন্য কোন কথা বল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এছাড়া আমি আর কোন কথা বলব না। যদি তারা আমার হাতে সূর্যও এনে দেয় তবুও নয়। তখন কোরায়শ বলল, আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলোনা নতুবা আমরা তোমাকে এবং যে তোমাকে আদেশ দেয় তাকে মন্দ বলব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, কোন কিছুকে মন্দ বলা এক বিষয় আর বাতিল উপাস্যদের অসহায়ত্ব এবং বাতুলতা বর্ণনা করা আকেটি বিষয়। পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কাফেরদের উপাস্যদেরকে তোমরা মন্দ বলোনা। মুসলমানদেরকে এর দ্বারা চরিত্র-মাধুর্যের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের তা'লিম দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বাতিলকে বাতিল বলা যাবেনা তাদের যে প্রকৃত অবস্থা তা বর্ণনা করা যাবে না। এজন্যেই কোরআনে করীমের কোন কোন স্থানে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পৌত্তলিকরা যেসব বিষয়ের সম্মখে মাথানত করে তারা এদের উপকারও করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা। এর দ্বারা বাস্তব অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

এটি দোষনীয় নয়; বরং প্রশংসনীয়। কেননা, এর দ্বারা মানুষকে কল্যাণকর পথের দিকে আহবান জানানো হয়েছে।[১]

কাফেরদের উপাস্যদের গালি দেয়া থেকে বিরত থাকার আদেশ এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, এর জবাবে তারা মূর্খতাবশতঃ আল্লাহ পাককে মন্দ বলবে। এভাবে তাদের নাফরমানী বৃদ্ধি পাবে, তাই এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ হয়েছে।

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

"আর এভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চোখে তাদের কার্যকলাপকে সাজিয়ে দিয়েছি"।

আলোচ্য আয়াতে 'উম্মত' অর্থ জনগোষ্ঠী তা মোমেন হোক বা কাফের। প্রত্যেকের কার্যকলাপ তাদের নিকট প্রিয় এবং পছন্দনীয় করে দেয়া হয়েছে। যদি আল্লাহ পাক ভাল কাজের তৌফিক দেন তবে যারা ভাল কাজ করে তা তাদের নিকট প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয়। পক্ষান্তরে, যারা মন্দ কাজে লিপ্ত, তাদের কাছে মন্দ কাজই প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয়।

কিন্তু মানব জীবন এ পৃথিবীতেই সীমিত নয়; বরং তাকে যেতে হবে পরপারে, হাযির হতে হবে মহান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"অবশেষে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে হাযির হতে হবে এবং তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন"।

বস্তুতঃ এ জীবন ও জগত ক্ষণস্থায়ী। এ পৃথিবী কর্মক্ষেত্রে। কর্মফল লাভ হবে পরকালে। এটি পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে সব কিছু লোভনীয়, মোহনীয়। এখানে সব কিছুই মনে হয় সুসজ্জিত, সকলের নিকটই তার কর্মকান্ড হয় প্রিয়, পছন্দনীয়। তাই সকলেই নিজেকে নিয়ে থাকে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা, আত্মহারা কিন্তু যিনি দান করেছেন এ জীবন, যিনি সৃষ্টি করেছেন এ সুন্দর জগত তাঁকে যদি কেউ ভুলে যায়, তাঁর বিধান যদি কেউ অমান্য করে তবে তাকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে হতে হবে সর্বহারা।

আল্লাহ পাক মানুষকে মন-মেজাজ, বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। এ বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণকর পথ গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দ ও অকল্যাণকর পথ বর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে যারা ভুল করবে তাদেরকে অবশ্যই মাশুল আদায় করতে হবে কেননা, ভাল কাজের শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত, আর মন্দ কাজের শাস্তি অবধারিত।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১৬

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারকে এবং কোরআনে করীমে এমন কোন বাক্য কোন সময় উচ্চারিত হয়নি যাকে গাল-মন্দ বলা যায়। আর ভবিষ্যতের এর কোন আশংকাও ছিল না। তবে মুসলমানদের ব্যাপারে এ সম্ভাবনা ছিলো হয়ত তাঁরা কখনো উত্তেজিত অবস্থায় এমন কোন কথা বলেন তাই এর উপর আলোচ্য আয়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এতদ্বারা শরীয়তে ইসলামের কয়েকটি মূলনীতি প্রমাণিত হয়।

গুনাহর কারণ হওয়াও গুনাহ

এ আয়াত দ্বারা এ মূলনীতি প্রমাণিত হলো যে, কোন কাজ যদি বৈধ হয় কিন্তু সে কাজের কারণে মানুষের পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে অর্থাৎ তা যদি গুনাহর কারণ হওয়ার আশংকা থাকে তবে তাও নিষিদ্ধ হয়। যেমন মূর্তি বা সকল বাতিল উপাস্যকে মন্দ বলা অবশ্যই বৈধ এবং ঈমানী চেতনা থেকে বললে তাতো প্রশংসনীয়, কিন্তু যেহেতু এর পরিণামে কাফেরদের আল্লাহ্ পাকের শানে বেয়াদবী করার আশংকা রয়েছে তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, "কেউ যেন তার পিতা–মাতাকে গালি না দেয়"। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তখন তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, মানুষ তার পিতা-মাতাকে গালি দেয় না। কিন্তু যখন সে অন্য কোন লোকের পিতা-মাতাকে গালি দেয় তবে তার পরিণামে সেই ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেবে। তাহলে এ সন্তান তার পিতা-মাতার গালির জন্যে দায়ী হলো, যেন সে নিজেই গালি দিল। ঠিক এমনিভাবে যদি মুসলমানগণ কাফেরদের উপাস্যদেরকে গালি দেয় তবে আশংকা থাকে যে কাফেররা আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবী করবে। এজন্যে কাফেরদের উপাস্যদের গাল-মন্দ দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ
لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا
جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

তরজমা

(১০৯) তারা আল্লাহ পাকের নামে কঠিন শপথ করে বলে, যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসত তবে তারা অবশ্যই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, নিদর্শন সমূহতো শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা যে ঈমান আনবেনা একথা কিভাবে তোমাদেরকে বোধগম্য করানো যাবে?

(১১০) তারা যেমন উল্লেখিত নিদর্শন গুলো দেখেও প্রথমবার ঈমান আনেনি, ঠিক তেমনি আমিও তাদের মন এবং চোখ ফিরিয়ে দেব এবং তাদের দৌরাত্মের মধ্যে বিভ্রান্ত অবস্থায়ই তাদেরকে ফেলে রাখব।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এবনে জরীর এবং বগভী মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযীর সূত্র থেকে এবং কালবীর সূত্রে লিখেছেনঃ মক্কার কোরায়শ গোত্রের লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলল যে হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো আমাদেরকে বলেছেন, মূসা (আঃ)-এর নিকট একটি লাঠি ছিল, সেই লাঠিটি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে তা থেকে বারটি নির্ঝরনী বের হয়েছিলো। ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন এবং সালেহ (আঃ) সামুদ জাতির জন্যে পাথর থেকে একটি উষ্ট্রী বের করে এনেছিলেন। তাহলে এমনি কোন বিস্ময়কর অলৌকিক কিছু আমাদেরকেও আপনি দেখিয়ে দিন। তথা কোন মোজেযা পেশ করুন তাহলে আমরাও আপনাকে সত্য রসূল হিসেবে মেনে নেব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা কি মোজেযা চাও? কোরায়শ বললঃ আমাদের জন্যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করুন। আর বগভীর বর্ণনায় একথাটি বাড়তি রয়েছে যে, আমাদের কোন কোন মৃতকে জীবিত করে হাযির করুন যাতে করে আমরা তাদের নিকট আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে আপনি যা কিছু বর্ণনা করেন তা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ। অথবা ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করুন যেন তারা এসে আপনার সত্যায়ন করেন।

এবনে জরীর এবং বগভী লিখেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পৌত্তলিকদের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে তাদেরকে বললেনঃ যদি তোমাদের আরযী মোতাবেক যা তোমরা চাও তা করা হয় তবে তোমরা কি আমার প্রতি ঈমান আনবে? তারা বললঃ অবশ্যই আল্লাহর শপথ! আমরা সকলেই আপনার অনুসারী হবো।

মুসলমানগণও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আবেদন করলেন্ যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন মোজেযা পেশ করুন যেন তারা সকলে ঈমান

আনে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হলেন। এমন সময় জীব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবার থেকে এ বাণী নিয়ে আসলেন যে, (হে রসূল!) যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে সাফা নামক পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হবে কিন্তু এরপরও যদি তারা ঈমান না আনে তবে আমি তাদের প্রতি আযাব নাযিল করব। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, কাফেররা এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই থাকুক। তাদের মধ্যে যার ইচ্ছা তওবা করবে এবং ঈমান আনবে তবে তা-ও হতে পারে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। তাই তিনি এরশাদ করলেনঃ তবে তারা এ অবস্থায়ই থাকুক। যাতে করে তাদের প্রতি আযাব না আসে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ

মক্কার পৌত্তলিকদের ধৃষ্টতার কোন সীমা ছিলনা। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললঃ সাফা নামক পাহাড়কে যদি আপনি স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন তবে আমরা সকলেই আপনার প্রতি ঈমান আনব। তারা শুধু একথাই বলল না; বরং আল্লাহ পাকের নামে জোরালো শপথ করে বলল, যদি এমন কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে তবে আমরা অবশ্যই আপনার প্রতি ঈমান আনব। তখন আল্লাহ পাক তার জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, মোজেযা বা অলৌকিক ব্যাপার আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে, তিনি যখন ইচ্ছা তা প্রকাশ করেন, আমার হাতে মোজেযা নেই।

وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

আর তোমরা কি জান? (বরং আমি জানি) যদি তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা আসে তবু তারা ঈমান আনবেনা; বরং এতে তাদের ধৃষ্টতা এবং নাফরমানী বৃদ্ধি পাবে। নিদর্শন আসার পর তারা ঈমান যখন আনবে না, তখন আল্লাহ পাকের নিয়মিত বিধান মোতাবেক তাদের প্রতি নেমে আসবে আযাব এবং তারা ধ্বংস-

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৯
তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৪৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৯৫
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৬৭৯-৮০

স্তূপে পরিণত হবে (তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার জন্যে দোয়া করলেন না)। তাদেরকে তাদের অবস্থায়ই ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ

মানুষ যখন গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়

মূলতঃ মানুষ যখন গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, কুফর ও শেরক যখন তাদের মনে স্থায়ীভাবে স্থান করে নেয়, সত্যকে গ্রহণের কোন সম্ভাবনা তাদের মধ্যে না থাকে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের চক্ষু এবং কর্ণকে অকেজো করে দেন কেননা, তারা সত্যকে গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ

তারা যেহেতু ইতিপূর্বে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার বিস্ময়কর ঘটনা সহ অনেক মোজেযা দেখেছে কিন্তু তবু ঈমান আনেনি তাই তাদের মন এবং চোখ আমি ফিরিয়ে দেব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ঠতায় এবং বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখব। হেদায়েত তাদের নসীব হবে না। তাদের জেদ এবং হঠকারিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই হবে তাদের এ অবস্থা।

আলহামদুলিল্লাহ! ০৭/০৩/১৯৯০ তারিখে
সপ্তম পারার
তফসীর সমাপ্ত হলো।